আলোয় ছায়ায়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

ধীরেসুস্থে তৈরি হচ্ছিলেন নিবেদিতা। বিকেল সাড়ে চারটেয় সুহাসিনী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাপ্তাহিক মিটিং আছে আজ। তাঁদের এই ফার্ন রোডের বাড়ি থেকে হাজরায় সমিতির অফিস গাড়িতে মিনিট পনেরোর পথ, তবু নিবেদিতা চারটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে চান। ছেলের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে পর পর দুটো মিটিং-এ তাঁর থাকা হয়নি, আজ নিবেদিতার একটু আগে আগেই যাওয়া উচিত।

হাল্কা প্রসাধন সেরে নিবেদিতা ওয়ার্ড্রোব খুললেন। সার সার হ্যাঙার। শাড়ি ঝুলছে। সুতি সিল্কে তসর শিফন...। গয়নাগাটির

ব্যাপারে নিবেদিতার তেমন একটা আকর্ষণ নেই, কিন্তু শাড়ি সংগ্রহে চিরকালই তাঁর প্রবল ঝোঁক। নানান রাজ্যের বাছাই বাছাই শাড়িতে তাঁর ওয়ার্ড্রোবটি ঠাসা। কাঞ্জিভরম পটোলা গাদোয়াল নারায়ণপেট বোম্‌কাই ইক্‌কৎ কট্‌কি মাদুরাই সম্বলপুরী, কী আছে আর কী নেই। বোলপুরের কাঁথাস্টিচ, ফুলিয়ার তাঁত, বিষ্ণুপুরের বালুচরী, আর খোদ বাংলাদেশের জামদানির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তবে চড়া রং কোনওকালেই ভালবাসেন না নিবেদিতা, এখন বয়স বাড়ার পর রঙের ব্যাপারে তো আরও খুঁতখুঁতে হয়ে গেছেন। সাদা জমি, নইলে ঘিয়ে অথবা ছাই ছাই, বড় জোর স্টিল গ্রে, ব্যস্।

ঠেলে ঠেলে একের পর এক হ্যাঙার সরাচ্ছেন নিবেদিতা। কোনটা পরবেন আজ? গুর্জারি স্টিচ? নাকি হাল্‌কা দেখে কোনও সিল্‌ক? হলুদপাড়ের জলডুরে টাঙাইলই বা মন্দ কি। অনিন্দ্যর শ্বশুরবাড়ি থেকে দেওয়া নমস্কারিটা এখনও হ্যাঙারে ওঠেনি, পড়ে আছে ওয়ার্ড্রোবের তাকে। শাড়িখানার দিকে তাকিয়ে নিবেদিতা নাক কুঁচ কোলেন একটু। সাদা বেনারসি, খোলে বুটি টুটিও নেই, কিন্তু পাড় টকটকে লাল। এত লাল পাড় নিবেদিতা জন্মে পরেননি, বিয়ের পর পরও না। এমন ষাঁড় খেপানো রঙ তাঁর ঘোরতর অপছন্দ। শরণ্যা বলছিল তার মা নাকি নিজে পছন্দ করে কিনেছেন এই শাড়ি। নিবেদিতারই দুর্ভাগ্য, শাড়িখানা এখানেই শুয়ে থাকবে অনন্তশয্যায়।

ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত চওড়া মেরুন পাড় সাউথ-কটনখানা হ্যাঙার থেকে নামালেন নিবেদিতা। সঙ্গে মেরুন-বর্ডার লম্বাহাতা ক্রিম-কালার ব্লাউজ। ঘরোয়া পোশাক দ্রুত পালটে নিজেকে বিন্যস্ত করলেন দক্ষিণী সুতির আভিজাত্যে। নিবেদিতার বয়স এখন আটান্ন, কিন্তু এখনও তাঁর ফিগারটি চমৎকার। গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের তুলনায় তিনি অনেকটাই দীর্ঘ, অতি সাধারণ শাড়িও একটা আলাদা মাত্রা পায় তাঁর অঙ্গে। মুখশ্রী তেমন আহামরি নয় বটে, তবে গায়ের রংটি রীতিমত ফর্সা। সিঁথিবিহীন কাঁচাপাকা ঘন কেশ টেনে বেঁধে চওড়া কপালে একটা বড় টিপ লাগালে তাঁকে প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী মনে হয়, এই ব্যক্তিত্বটাই নিবেদিতার আভরণ।

বেশভূষার পালা শেষ। টেবিল থেকে চশমা পেন আর একখানা ছোট্ট রাইটিং প্যাড তুলে নিয়ে সুদৃশ্য ঝোলাব্যাগটিতে পুরলেন নিবেদিতা। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেন একটু। ডিসেম্বরের শুরু, কলকাতায় এখনও শীত আসেনি, তবে পরশু থেকে অল্প অল্প উত্তুরে হাওয়া বইছে। শিরশিরে। শুকনো শুকনো। এই সময়টায় পুট করে ঠাণ্ডা লেগে যায়, সঙ্গে গায়ে দেওয়ার কিছু একটা নেবেন কি? দিন কুড়ি পর দপ্তরে যাচ্ছেন, ফিরতে দেরি হতেই পারে।

গুজরাটি চাদরখানা বার করে নিবেদিতা আলমারি লাগাচ্ছেন, দরজায় রিনরিনে স্বর, —মামণি, আসব?

শরণ্যা। এ বাড়িতে পা রাখার পর থেকে নিবেদিতাকে মামণি বলে ডাকছে মেয়েটা। সম্বোধনটা কানে লাগে নিবেদিতার। তাঁর দুই ছেলে তাঁকে মা বলেই ডাকে, পুত্রবধূ কেন যে হঠাৎ মামনি ডাকটা আমদানি করল? কেউ শিখিয়ে দিয়েছে? নাকি শাশুড়িকে মা বলে সম্বোধন করতে অস্বস্তি হয়?

নিবেদিতা গলা ঝাড়লেন— এসো, ভেতরে এসো।

পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকল শরণ্যা। পরনে পেঁয়াজবরণ আনকোরা তাঁত। ফুলে ফুলে রয়েছে শাড়িটা, খানিক এলোমেলোও। দেখেই বোঝা যায় শাড়ি পরার অভ্যেস নেই। রেশম রেশম একঢাল চুল পিঠে ছড়ানো, সিঁথি জুড়ে ডগডগে সিঁদুর, গলায় মফ্‌চেন, হাতে চুড়ি বালার সঙ্গে লাল লাল শাঁখা, সোনায় বাঁধানো লোহা। নতুনবউ-নতুনবউ গন্ধ এখনও লেগে আছে শরণ্যার সর্বাঙ্গে।

পুতুলসাজ পুত্রবধূকে ঝলক দেখলেন নিবেদিতা। এগারো দিন মাত্র বিয়ে হয়েছে, মেয়েটা স্বাভাবিক ভাবেই এখনও বেশ জড়সড়।

নিবেদিতা হাসলেন নরম করে, —কিছু বলবে?

শরণ্যার চোখ বড় বড়, —আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন মামণি?

—হ্যাঁ। সমিতির অফিসে যাচ্ছি। নিবেদিতা ঘাড় নাড়লেন, —তোমাদের ট্রেন যেন কটায়?

—সওয়া সাতটা। আপনার ছেলে বলছিল ছটা নাগাদ বাড়ি থেকে স্টার্ট করবে।... আপনি কি এসে যাবেন তার মধ্যে?

—না শরণ্যা। এগজিকিউটিভ বডির মিটিং আছে আজ। আমার দেরি হবে।

—ও।

মেয়েটার কি একটু খারাপ লাগল? মুখটা মিইয়ে গেল যেন? কী আশা করছিল শরণ্যা? ছেলে ছেলের বউ হানিমুনে যাচ্ছে বলে নিবেদিতা কাজকর্ম ফেলে ছুটে আসবেন? নিবেদিতা কর্মী মানুষ, এ ধরনের কোনও জোলো সেন্টিমেন্টকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর ধাতে নেই, তা সত্ত্বেও নতুন বউ যেন মনে কষ্ট না পায় তার জন্য গলা আরও কোমল করে বললেন, —আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করেই বেরতাম। ...যাও, দুজনে ভাল করে ঘুরে এসো। এ সময়ে ঠাণ্ডার জায়গায় যাচ্ছ। বেশি করে গরম জামাকাপড় নিয়েছ তো?

শরণ্যা ঢক করে ঘাড় নাড়ল।

—তোমাদের গোছগাছ সব কমপ্লিট?

—মোটামুটি।

—শাড়ি ফাড়ি বেশি নিও না, সালোয়ার কামিজে অনেক ফ্রি থাকবে। লজ্জা লজ্জা মুখে শরণ্যা বলল, —আপনার ছেলেও তাই বলছিল। মেয়েটা খালি 'আপনার ছেলে আপনার ছেলে' করে কেন? শাশুড়ির সামনে বরের নাম উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ? আজকালকার মেয়েদের মধ্যে তো এরকম সাবেকিপনা থাকা ঠিক নয়। এম-এ পাশ, শিক্ষিত মেয়ে, সে কেন এমন প্রিমিটিভ ভাষায় কথা বলবে!

যাক গে, মরুক গে, এ নিয়ে নিবেদিতার কিসের মাথাব্যথা। নিবেদিতা যেমনটি চাইবেন পুত্রবধূকেও অক্ষরে অক্ষরে তেমনটি হতে হবে, এমন ধারণায় নিবেদিতার বিশ্বাস নেই। পুত্রবধূর ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়াটাও তাঁর রুচিতে বাধে।

ঝোলাব্যাগের চেন আটকাতে আটকাতে নিবেদিতা প্রশ্ন করলেন, —তুমি যেন কী একটা বলতে এসেছিলে?

শরণ্যা বুঝি ভুলেই গিয়েছিল। অপ্রস্তুত মুখে বলল, —ও হ্যাঁ। ...আপনার ছেলে চা খেতে চাইছিল। আমি ভাবলাম আপনাকেও একবার জিজ্ঞেস করে যাই।

নিবেদিতা ঘড়ি দেখলেন, —তা খেলে মন্দ হয় না। এখনও হাতে মিনিট পনেরো সময় আছে।

—আমি দু মিনিটে করে আনছি।

—তুমি কেন? নীলাচল কোথায়?

—নীলাচলকে আপনার ছেলে কোথায় যেন পাঠাল।

—ও। সাবধানে গ্যাস জ্বেলো।

শরণ্যা হেসে ফেলল, —আমার অভ্যেস আছে মামণি।

ঝুমঝুম গয়নার আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার পর প্রশস্ত ড্রয়িংহলে এসে বসলেন নিবেদিতা। ভারী সোফাটায়। তিরিশ বছর আগে কেনা নামী দোকানের দামী সোফার আয়ু প্রায় শেষ, বসতেই ককিয়ে উঠেছে সোফার স্প্রিং। নিবেদিতার কপালে ভাঁজ পড়ল। এত আওয়াজ হচ্ছে কেন? অনিন্দ্যর বিয়ের হুজুগে সোফার ওপর যথেষ্ট অত্যাচার গেছে, এবার আর না সারালেই নয়। কিন্তু এসব জিনিসের খোলনলচে পুরো বদলাতে যাওয়াও তো অনেক টাকার ধাক্কা। অনিন্দ্যর বিয়েতে জলের মতো খরচা হয়ে গেল। ছেলের বিয়ে বলেই বোধহয় আর্যর হাত থেকে তাও কিছু টাকা গলেছিল, নিবেদিতার সোফাসেটের জন্য সে হাত কি উপুড় হবে? নিবেদিতার চাওয়ার দরকারটাই বা কী। শোভাবাজারের বাড়িটা বিক্রি হল বলে, নিজের ভাগটুকু হাতে এলে ঘরদোরের টুকিটাকি কাজগুলো নিজেই করে নিতে পারবেন নিবেদিতা। বিয়ে উপলক্ষে শুধু দোতলার ঘরেরই তো কলি ফেরানো হল, নীচে ভাড়াটের ঘরগুলো এখনও রং করা বাকি। সুরেন বলছিল গাড়িটাকেও এবার বসাতে হবে, ইঞ্জিনের হাল ভাল নয়।

ভাবনার মাঝেই সামনে অনিন্দ্য। হন্তদন্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ক্যাবিনেটের ড্রয়ারে কী যেন খুঁজছে। পেল না, মাথা ঝাঁকাচ্ছে অস্থির ভাবে। সশব্দে ড্রয়ার বন্ধ করে এপাশে এল। নীচু হয়ে সেন্টারটেবিলের তলার কাগজপত্র ঘাঁটছে। হঠাৎ সোজা হয়ে বলল, —সরো তো একটু।

—কী খুঁজছ?

—এখানে কোথায় যেন একটা খাম রেখেছিলাম।

—কী রকম খাম?

—ব্রাউন কালারের।

—খুব দরকারি?

—নইলে খুঁজছি কেন। অনিন্দ্যর মুখ গোমড়া, —ওর মধ্যে ট্রেনের টিকিট আছে।

—আশ্চর্য, ট্রেনের টিকিট যেখানে সেখানে ফেলে রেখেছ?

—নো লেকচার। পরনে শর্টস টিশার্ট, ফর্সা ফর্সা চেহারার অনিন্দ্যর গোলগাল কমনীয় মুখে রুক্ষ ভাব, —বলছি তো এখানেই ছিল। তোমার কি নড়ে বসতে অসুবিধে আছে?

—এভাবে কথা বলছ কেন? ভদ্রভাবে বল।

—কিছু খারাপ ভাবে বলা হয়নি। হঠো, সোফার খাঁজগুলো দেখে নাও। নিবেদিতা নড়লেন না। অপ্রসন্ন গলায় বললেন, —এখানে কোনও টিকিট নেই। তুমি নিজের ঘরে গিয়ে দ্যাখো।

—তোমার কি সরে বসতে মানে লাগছে?

—অদ্ভুত কথা! মানে লাগার কী আছে?

—বলা যায় না। অনিন্দ্য ঠোঁট বেঁকাল, —কদিন ধরে বংশগরিমা নিয়ে যা মটমট করছ। সবার কাছে গিয়ে আমি অমুক বাড়ির মেয়ে, আমার এই ছিল, আমার ওই আছে...

—আহ্ অনিন্দ্য, বিহেভ ইওরসেল্ফ। বাড়িতে একটা নতুন মেয়ে এসেছে।

—তো?

—নিজের রূপটা কি এখনই তাকে না দেখালে নয়?

জবাবে অনিন্দ্য ফের কী একটা বলতে যাচ্ছিল, টেলিফোন বেজে উঠেছে। বিরক্ত চোখে দূরভাষ যন্ত্রটার দিকে একবার তাকাল অনিন্দ্য, তারপর গটমট ঢুকে গেল ঘরে।

নিবেদিতার চোখেও অসন্তোষ। ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেকে দেখতে দেখতে রিসিভার কানে চাপলেন, —হ্যালো?

—নমস্কার দিদি। আমি নবেন্দু বলছিলাম। শরণ্যার বাবা।

—ও, নমস্কার নমস্কার। নিবেদিতার গলা পলকে মসৃণ, —বলুন কী খবর?

—বুবলিরা...আই মিন শরণ্যারা তো আজ চলল?

—হ্যাঁ, এই তো ছটা নাগাদ রওনা দেবে।

—ছটা? সর্বনাশ। ও প্রান্তে নবেন্দু যেন প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, —মিনিমাম দেড় দু ঘণ্টা হাতে নিয়ে বেরোন উচিত। পিক্ অফিস আওয়ারে যাবে, কোথায় জ্যামে ফেঁসে যায় তার ঠিক আছে!

—না না, পৌঁছে যাবে। ওদের তো অফিসপাড়া দিয়ে যেতে হচ্ছে না, ট্রেন তো ওদের শেয়ালদা থেকে।

—ওই রুটটা তো আরও খারাপ। বেকবাগান মল্লিকবাজার মৌলালি কোন ঘাটে যে আটকে যায়...আজ আবার কাগজে দেখছিলাম কাদের যেন একটা মিছিলও আছে।

নিবেদিতা উদ্বেগটাকে আমল দিলেন না। হাসতে হাসতে বললেন, —মেয়ে জামাই-এর হানিমুন-যাত্রা নিয়ে আপনি দেখি খুব টেনশানে আছেন?

—আমার আর কী টেনশান। নবেন্দু হেসে ফেললেন, —আসল টেনশান পাবলিক তো বুবলির মা। কাল থেকে দুশ্চিন্তা করে যাচ্ছে। দুজনেই ছেলেমানুষ...একা একা বেড়াতে যাচ্ছে...

—দুজনে একা একা কী করে হয় ভাই?

—তবু...বয়সটা কম তো।

একেই বলে মধ্যবিত্ত আহ্লাদিপনা। দুটো প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে, তারা যাচ্ছে মধুযামিনী যাপন করতে, বাপ-মা এখনও তাদের জন্য পা ছড়িয়ে বসে ভাববে কেন? বাঙালি অভিভাবকরা কেন যে তাদের ছেলেমেয়েদের বড় হতে দিতে চায় না? চব্বিশ বছরের মেয়েকে কচি খুকিটি ভেবে কী তৃপ্তি পায় তারা?

এমনিতে অবশ্য শরণ্যার বাবা-মাকে বেশ লেগেছে নিবেদিতার। দুজনেই যথেষ্ট শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিশীল। বিনয়ের অভাব নেই, আবার তাদের আচরণের অনাবশ্যক কুণ্ঠা বা জড়তাও নেই। নবেন্দু চাকরি করেন ব্যাঙ্কে, মহাশ্বেতা একটি সরকারি সংস্থার খুদে অফিসার। এমন একটি পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়তে তিনি নিজেই যথেষ্ট আগ্রহী হয়েছিলেন। শুধু এই অকারণ আদিখ্যেতাগুলো যদি না থাকত শরণ্যার বাবা-মার।

নিবেদিতা গলায় খানিকটা ব্যক্তিত্ব এনে বললেন, —মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করবেন না। ওরা ঠিক নিজেদেরটা নিজেরা সামলে নেবে।

—আপনার আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই পারবে দিদি।

—বুঝলাম। নিবেদিতা হাসলেন, —তা আপনাদের কি এখনও ছুটি চলছে?

—বুবলি অনিন্দ্যকে আজ ট্রেনে তুলে দিয়ে তবে ছুটি শেষ। সোমবার থেকে দুজনেই অফিস জয়েন করব।

—গুড। ...শরণ্যাকে ডেকে দেব?

—আছে সামনাসামনি?

চা করছে বলতে গিয়েও সামলে নিলেন নিবেদিতা। বললেন, —ধরুন। ডাকছি।

রান্নাঘর অবধি যেতে হল না, চায়ের ট্রে হাতে এসে পড়েছে শরণ্যা। ফোন ধরতে বলে তার হাত থেকে ট্রেখানা নিয়ে নিলেন নিবেদিতা। ঢুকেছেন ছেলের ঘরে।

খাটের ওপর পোশাক উপচে পড়া দুখানা স্যুটকেস হাঁ হয়ে পড়ে। একখানা স্যুটকেসের পকেটে কী সব যেন রাখছিল অনিন্দ্য। মার পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘোরাল।

নিবেদিতা বললেন, —তোমার চা।

—রেখে যাও।

—টিকিট পেলে?

উত্তর নেই।

—সাবধানে যেও।

—হুঁ।

—আমি সমিতির অফিসে গিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, তোমার শ্বশুর শাশুড়িও সম্ভবত যাচ্ছেন স্টেশনে। ওঁদের মানিকতলায় নামিয়ে দিয়ে সুরেনকে সোজা হাজরায় চলে আসতে বোলো।

—তুমিই তো সুরেনকে বলে দিতে পারো।

কথা না বাড়িয়ে নিজের চা হাতে নিবেদিতা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। শরণ্যা নিবিষ্ট মনে ফোনে কথা বলছে, একটু নিচু গলায়। কী কথা হচ্ছে না হচ্ছে শোনার কৌতূহল অনুভব করলেন না নিবেদিতা, এলেন ঘরের প্রান্তে, ডাইনিং টেবিলে। উষ্ণ পানীয়টুকু শেষ করে পায়ে পায়ে এগোচ্ছেন সিঁড়ির দিকে।

শরণ্যা ফোন রেখে দৌড়ে এল। টিপ করে প্রণাম করল একটা, —দার্জিলিং পৌঁছেই আমরা ফোন করে দেব মামণি।

—অসুবিধে না হলে কোরো। ভুলে গেলেও আমি কিছু মাইন্ড করব না। স্মিত মুখে নিবেদিতা আলগা হাত ছোঁয়ালেন শরণ্যার মাথায়, —আসি তাহলে?

—আচ্ছা।

সিঁড়ির ল্যান্ডিং পর্যন্ত নেমে নিবেদিতা দাঁড়ালেন একটু। চোখ ম্যাজেনাইন ফ্লোরের ঘরখানায়। পরিচিত দৃশ্য। বই বোঝাই নিচু সিলিং-এর ঘরখানার এক কোণে ইজিচেয়ারে বসে আছেন আর্য, মুখের সামনে যথারীতি একখানা ভারী কেতাব। পাশে কফির ফ্লাস্ক, পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে চুমুক দেবেন বলে বানিয়ে রেখে গেছে নীলাচল। কফি পানের মেয়াদ অবশ্য বিকেল পর্যন্ত, তারপর আর্যর অন্য পানীয় চাই। দিনের আলো নিবে যাওয়ার পর আর্য কোনও নরম পানীয় স্পর্শ করেন না।

আর্যকে ডাকলেন না নিবেদিতা। কোন দিনই বা ডাকেন! স্বেচ্ছাবন্দি ওই গুহামানবের দরজায় কবেই বা থামেন! আজ তাও খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মানুষটার দিকে। উঁহু, মানুষটাকে নয়, যেন একটা ছবি দেখছিলেন নিবেদিতা। পশ্চিমের বিষণ্ণ আলো জানলার গ্রিল ভেদ করে এসে জাফরি কেটেছে আর্যর গায়ে, বুঝি বা আলোছায়া-মাখা সেই নকশাগুলোই টানছিল নিবেদিতাকে। চতুর্দিকে ছড়ানো বই, বুকসেলফ, আরামকেদারা, টেবিল, স্ট্যান্ডফ্যান, কাগজ, কলম, ডেটক্যালেন্ডার, পেপারওয়েট আর ওই আলোর জাফরিমাখা আর্য— সব মিলেমিশে রচিত হয়েছে এক ইমপ্রেশানিস্ট পেন্টিং। ঘরের ভেতরটা আশ্চর্য রকমের নিশ্চল, বাইরেও বোধহয় বাতাস নেই, আলোটুকুও কাঁপছে না, ঠিক যেন স্টিল লাইফ। বই-এ ডুবে থাকা আর্যও যেন ওই স্থবির জীবনের অংশমাত্র, ওই ছবির বাইরে আর্যর যেন, পৃথক কোনও অস্তিত্বই নেই।

ছবিটাকে অবশ্য বেশিক্ষণ চোখের পাতায় ধরে রাখলেন না নিবেদিতা। নীচে এসে দেখলেন সুরেন গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে

ফেলেছে, অপেক্ষা করছে রাস্তায়। সিগারেট টানছিল সুরেন, নিবেদিতাকে দেখা মাত্র ফেলে দিল, চটপট গিয়ে বসল স্টিয়ারিং-এ। বলল, —গাড়িতে কিন্তু তেল নিতে হবে মাসিমা।

পিছনের সিটে বসে নিবেদিতা দরজা বন্ধ করছিলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, —সেকি? এই তো পরশু দিন না তার আগের দিন পাঁচ লিটার ভরলাম।

—ওইটুকু তেলে পুরোনো অ্যাম্বাসাডর কতটুকু যায় মাসিমা? এ গাড়ি তো এখন রাক্ষসের মতো তেল খাচ্ছে।

—কিন্তু গাড়ি তো তেমন বেরোয়নি!

—বা রে, বড়দা বউদি অষ্টমঙ্গলা করতে গেলেন না? মানিকতলা যাতায়াতেই তো...

—এক্ষুনি লাগবে?

—হাজরা গিয়ে নিলেও হবে। রিজার্ভে তো একটু আছে।

—চলো তাহলে।

পাড়াটা পুরনো। রাস্তাঘাট তেমন চওড়া নয়, বাঁকও আছে ঘন ঘন। সুরেনের একটু সাঁইসুঁই করে গাড়ি চালানোর প্রবণতা আছে, কিন্তু এখন সে একদমই গতি তুলছে না। নিবেদিতার কাছে সে কাজ করছে মোটে বছর খানেক, তবে এর মধ্যেই সে নিবেদিতার মেজাজমর্জি বেশ চিনে গেছে। তার শৃঙ্খলাপরায়ণ মালকিন গাড়িতে থাকলে সে কখনওই বেপরোয়া চালায় না।

নিবেদিতা টুকটাক কথা বলছিলেন সুরেনের সঙ্গে। বছর তিরিশ বত্রিশের সুরেন বউ বাচ্চা নিয়ে কাছেই থাকে, কসবায়। সম্প্রতি বাড়িঅলার সঙ্গে তার কিছু সমস্যা চলছে, নিবেদিতা শুনছিলেন সুরেনের সমস্যার কথা। মন দিয়ে। এটা তাঁর স্বভাব। গরিব অসহায় মানুষদের বিপন্নতার কাহিনী তাঁকে ব্যথিত করে।

সুরেনের দেড় বছরের ছেলেটার পেটের অসুখ সারছে না বলে নিবেদিতা রীতিমত উদ্বিগ্ন, —কী করছ কী? ভাল করে ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?

— দেখাচ্ছি তো মাসিমা।

—তোমার ওই হোমিওপ্যাথিতে আর হবে না, এবার অ্যালোপ্যাথি কর। অ্যান্টিবায়োটিকের একটা কোর্স করলে ঠিক হয়ে যাবে।

—কী অ্যান্টি ব্যাটি?

—সে ডাক্তার জানে। তোমাদের কসবায় ভাল ডাক্তার নেই?

—চ্যাটার্জি ডাক্তার আছে। হেব্বি ভিড় হয়। একশো টাকা ফিজ্।

নিবেদিতা বুঝে গেলেন আসল সমস্যা ওই ফিজে। সুরেনকে তিনি মাইনে দেন বাইশশো, তবে এছাড়াও সুরেনের কিছু উপরি রোজগার আছে। রবিবার তো বটেই, অন্য দিনও ফাঁক পেলেই ট্যাক্সি চালায় সুরেন। অবশ্য তা সত্ত্বেও একশো টাকাটা ওর পক্ষে একটু বেশিই।

দু-এক সেকেন্ড চিন্তা করে নিবেদিতা বললেন, —ঠিক আছে, সমিতির অফিসে গিয়ে তুমি আমায় একটু মনে করিয়ে দিও, আমি বাবুয়াকে একটা চিঠি লিখে দেব। বাবুয়াকে চেনো তো? ওই যে লম্বা মতন, ক্রিকেট খেলে, আমার কাছে আসে মাঝে মাঝে। বাবুয়া একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। তুমি গিয়েছিলে তো... সেই যে ভবানীপুরে... আমি নবমীর দিন গেলাম... ওখানে গেলে বিনা পয়সায় তোমার ছেলেকে...

—মাসিমা! সুরেন হঠাৎ নিবেদিতাকে থামিয়ে দিল, —ওই দেখুন, ছোড়দা!

নিবেদিতা থতমত খেয়ে সামনে তাকালেন। গড়িয়াহাট মোড় পার হয়ে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির সিগনালে আটকেছে গাড়ি, বাকি দু দিক দিয়ে মুহুর্মুহু ছুটছে যানবাহন, তারই মাঝে চোখে পড়ল সুনন্দকে। চলন্ত গাড়িঘোড়াকে উপেক্ষা করে অলস মেজাজে রাস্তা পার হচ্ছে। একটা মিনিবাস প্রায় ঘাড়ে উঠে পড়ছিল সুনন্দর, নিবেদিতার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, ট্রাফিক সারজেন্ট ধমকে উঠল বিশ্রী ভাবে, ভ্রূক্ষেপ না করে সুনন্দ চলে গেছে ওপারে। ভিড়ে মিশে গেল।

সুরেন বলল, —কাণ্ড দেখলেন মাসিমা?

—হুঁ।

—এক্ষুনি ফিনিস হয়ে যাচ্ছিল। সুরেন দু হাত কপালে ঠেকাল, —জোর বেঁচেছে।

হৃৎপিণ্ড এখনও ধকধক করছে নিবেদিতার। বড় করে একটা শ্বাস টেনে বললেন, —হুঁ।

—ছোড়দাটা সত্যি কেমন যেন আছে...আলাভোলা... কেমন কেমন... না মাসিমা?

—হুঁ।

—রাস্তায় চলতে চলতেও কী এত ভাবে? ব্যান্ডপার্টির কথা?

তাঁর দুই ছেলের কে যে কখন কোন জগতে থাকে তা যদি জানতেন নিবেদিতা! দুজন তো দু পদের। একজনের সারাক্ষণ চোয়াল শক্ত। হয় মুখে কুলুপ আঁটা, নয় তো যে কোনও কথাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে হুল ফুটিয়ে চলেছে। মা তোর কোন শত্রু যে মার সঙ্গে অমন ব্যবহারটা করিস? অদ্ভুত ছেলে, সারাটা জীবন হস্টেলে হস্টেলে থাকল, অথচ তেমন কোনও বন্ধু নেই! যতক্ষণ বাড়ি থাকে, দরজা বন্ধ। কী যে ছাই করে নিজের মনে! বিয়ের পরেও এমন হাবভাব, যেন বিয়ে করে নিবেদিতাকে ধন্য করে দিয়েছে! আর ছোটটি তো আর এক কিসিমের। তার বন্ধুর সংখ্যা তো বোধহয় লেখাজোখা নেই। বাড়ির লোককে তিনি তো মানুষ বলেই গণ্য করেন না। কখন আসে, কখন যায়, কোথায় থাকে, তার কোনও ঠিকঠিকানা আছে? জিজ্ঞেস করলে জবাব পর্যন্ত দেয় না, সিগারেট ধরিয়ে ফস ফস ধোঁয়া ছাড়ে মুখের ওপর। ইদানীং তো কোন একটা গানের দলে ভিড়েছে। নীলাচল বলছিল প্রায়ই নাকি দলবল জুটিয়ে চিলেকোঠার ঘরে মহড়া চলে তাদের। এক দু দিন নিবেদিতাও মালুম পেয়েছেন। উওন্ত বাজনা বাজিয়ে কী তারস্বরে যে চেঁচায়! সুরেন বোধহয় ওটাকেই ব্যান্ডপার্টি বলছে।

সিগনাল সবুজ হয়েছে বাঁয়ে ঘুরে হাজরা রোডে ঢুকে পড়েছে গাড়ি। নিবেদিতা অন্যমনস্ক মুখে ভাবছিলেন কেন তাঁর দুই ছেলের একজনও স্বাভাবিক হল না! দুজনেরই লেখাপড়ায় বেশ মাথা ছিল। অনিন্দ্য তো রীতিমত ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছিল হায়ার সেকেন্ডারিতে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এখন চাকরিও তো মন্দ করছে না। আশ্চর্য চরিত্র, চাকরি করছে, অথচ একটা ফুটো পয়সা ঠেকায় না সংসারে! নারীসঙ্গের অভাবেই কি মেজাজটা বিগড়েছিল অনিন্দ্যর? বিয়ের পর কি শান্ত হবে? হয়তো। সুনন্দই বা কী? বি-কমে তো মোটামুটি ভালই করেছিল, কিন্তু কেন যে আর পড়ল না? চাকরি-টাকরিরও তো চেষ্টা করে না। অথচ তার টাকা চাই। আজ একশো, কাল পাঁচশো, পরশু দুশো...। না পেলে ওই আলাভোলা ছেলে যে কী মূর্তি ধারণ করে, বাইরের লোক তো তা জানে না।

সুহাসিনী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এসে গেছে। সুরেন হর্ন বাজাতেই মেটে রঙের প্রকাণ্ড গেট খুলে দিল জগন্নাথ। সমিতির দ্বাররক্ষী। সামনে সামান্য সবুজ, মাঝখান দিয়ে খোয়া বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে গাড়িবারান্দায়।

নিবেদিতা গাড়ি থেকে নামলেন। গোটা চারেক সিঁড়ি টপকে প্রবেশ করলেন নিজের ঠাকুমার মা'র নামাঙ্কিত সেবা প্রতিষ্ঠানে।

প্যাসেজ দিয়ে ঢুকেই প্রথম ঘরটি সমিতির অফিস। কমিটির মেম্বাররা বেশ কয়েকজন এসে গেছেন। স্বাগতা মঞ্জুলিকা কাকলি জয়শ্রী। জোর গুলতানি চলছে অফিসঘরে।

নিবেদিতাকে দেখে মুহূর্তের জন্য কলতান থেমে গেল। নিবেদিতার বাবা সোমশঙ্কর এই সুহাসিনী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, সেই সূত্রে নিবেদিতা এখানকার আজীবন প্রেসিডেন্ট। সমিতিতে তাঁর একটা আলাদা মর্যাদা আছে, সদস্যরা তাঁকে বেশ সমীহই করে। অল্পস্বল্প ঠাট্টাইয়ার্কিও চলে বটে, তবে নিবেদিতার সম্ভ্রম বাঁচিয়ে।

স্বাগতা উঠে দাঁড়িয়ে লঘু স্বরে বললেন, —ওয়েলকাম নিউ মাদার-ইন-ল, ওয়েলকাম।

মঞ্জুলিকা বলে উঠলেন, —উফ্ নিবেদিতাদি, কতদিন পর আপনি এলেন বলুন তো! আপনাকে ছাড়া সব যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল।

সমিতির সেক্রেটারি অর্চনা মৈত্র কাজ করছেন টেবিলে বসে। বয়স বছর পঞ্চাশ, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, মুখমণ্ডলে বেশ একটা দৃপ্ত ভাব আছে।

অর্চনার ঠোঁটেও স্মিত আহ্বান। কলম বন্ধ করে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, —সংসার এখন কেমন লাগছে নিবেদিতাদি? হাউ ইজ লাইফ?

ক্ষণপূর্বের দীর্ঘশ্বাস মুছে ফেলেছেন নিবেদিতা। এই বাড়িটায় ঢুকলেই তাঁর মন অন্যরকম হয়ে যায়। ছেলে স্বামী সংসার সব যেন

তখন পলকে বহুদূর। আজ বলে নয়, চিরকালই।

নিবেদিতা দু গাল ছড়িয়ে হাসলেন, —খুব ভাল লাগছে। এক্সেলেন্ট। ...এই, আর সবাই গেল কোথায়? চলো চলো। কাজকর্ম শুরু করে দিই।

দুই

আজকেও দার্জিলিং-এর মনমেজাজ ভাল নেই। চাপ চাপ মেঘে ছেয়ে আছে চারদিক, পাঁশুটে ধোঁয়া ঢেকে রেখেছে শহরটাকে। বিষাদের প্রলেপ মেখে ঝিমোচ্ছে পাহাড়ের রানি।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়। কোথায় এই শেষ হেমন্তে, দার্জিলিং-এর আকাশ ঝরঝকে নীল থাকবে, পেতলরঙা রোদ্দুর নেচে বেড়াবে পাহাড়েপাহাড়ে, তা নয়, সারাক্ষণ শুধু ধূসর বাষ্পের মিছিল। শরণ্যার কপালটাই খারাপ, পৌঁছে ইস্তক এখনও একবারও কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে দেখা হল না। পরশু যখন দার্জিলিং-এ পা রাখল, তখনই বৃষ্টি চলছিল। বিনবিনে কান্নার মতো। একটানা। একঘেয়ে। কাল একটুক্ষণের জন্য সূর্যের মুখ দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফচূড়াগুলো ছিল মেঘের আড়ালে। আর আজ তো সকাল থেকেই এই হাল।

চমৎকার একটা হোটেলে উঠেছে শরণ্যারা। ম্যালের ঠিক ওপরে, উত্তরদিকটা পুরো খোলা। কিন্তু লাভ কী! হিমালয় তো দূরস্থান, বিশ পঞ্চাশ হাত দূরের গাছপালারাও কেমন ঝাপসা ঝাপসা। বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে মেঘ দেখে দেখে শরণ্যার চোখ ব্যথা হয়ে গেল। এতক্ষণ তাও একটু দিন দিন মতো ছিল। এখন পাহাড়ে আঁধার। সন্ধে নামছে।

শরণ্যা সরে এল জানলা থেকে। দুপুর থেকেই লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে অনিন্দ্য, এখনও তার ওঠার নামটি নেই। গোমড়া মুখে তাকে দেখল শরণ্যা। কী বিটকেল ছেলে রে বাবা! হানিমুনে এসে কোনও বর এমন পড়ে পড়ে নাক ডাকায় কেউ জন্মে শুনেছে! হঠাৎ হঠাৎ ইচ্ছে হল তো বউকে পাগলের মতো খানিক ঘেঁটে নিল, তারপরই ভোঁস ভোঁস ঘুম। এদিকে শরণ্যা যে একা একা বসে থাকতে থাকতে বোর হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়ালই নেই। ছেলেটা যেন কেমন কেমন! বিয়ের পর প্রথম বেরিয়েছে দুজনে, কোথায় বউ-এর গায়ে গা লাগিয়ে বসে বকবক করে যাবে, এলোমেলো খুনসুটি করবে, মেঘকে তুড়ি মেরে বউ-এর হাত ধরে বেরিয়ে পড়বে দুমদাম... উঁহু, ওসবে অনিন্দ্যর আগ্রহই নেই। বেশ বেরসিক। ফুলশয্যার রাতেও কী আজব ব্যবহারটাই না করল। ফুলে ফুলে সুরভিত হয়ে আছে শয্যা, গাঢ় নীল রাতবাতি জ্বলছে, ঘর জুড়ে স্বপ্ন স্বপ্ন পরিবেশ, সেখানে কিনা নতুন বর দরজা বন্ধ করেই বোম্বেটে সাইজের হাই তুলছে! হ্যাঁ, সারা সন্ধে বউভাতের ধকল গেছে খুব, ক্লান্ত হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। শরণ্যারও তো শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল, কিন্তু...! শরণ্যা কত কী আশা করেছিল সেদিন। হুট করে বিয়েটা হয়ে গেল, ভাল করে আলাপ পরিচয় পর্যন্ত হয়নি, ফুলশয্যার রাতে অনিন্দ্য তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলবে, ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে, চিনতে চাইবে তাকে, জানতে চাইবে, তারপর...। কিন্তু আদতে কী ঘটল? স্রেফ একটা আনাড়ি চুমু, এবং ঘুমিয়ে পড়ো বলে বিছানায় ধপাস, একেবারে কুম্ভকর্ণের নাতজামাই।

উপমাটা মাথায় আসতেই শরণ্যা ফিক করে হেসে ফেলল। সে কি তাহলে কুম্ভকর্ণের নাতনি? হি হি হি। আপন মনে হাসতে হাসতে ফের অনিন্দ্যকে নিরীক্ষণ করল শরণ্যা। ছেলেটার শোওয়াটাও ভারী অদ্ভুত! মুখটি দেখার জো নেই, আপাদমস্তক ঢাকা। এখানে নয় শীত, কিন্তু কলকাতায়? কদিন ধরেই তো দেখছে শরণ্যা, কক্ষনো ঘুমন্ত মুখখানাকে খোলা রাখে না অনিন্দ্য। হয় আড়াআড়ি হাতে আড়াল করে রাখে, নয়তো মুখ গুঁজে দেয় বালিশে। রাগ হলে বাচ্চারা যেভাবে মুখ লুকোয়, অনেকটা যেন সেরকম ভঙ্গি। দেখতে যেমন গাবলুগুবলু, হাবভাবও ঠিক তেমনি। ছেলেমানুষ, একেবারে ছেলেমানুষ।

শরণ্যা ঘড়ি দেখল। পাঁচটা পঁচিশ, ইশ্, কোনও মানে হয়? এই ঘুমকাতুরে ছেলেটার লেপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই কি আরও একটা সন্ধে কেটে যাবে? নাহ্, একে এবার জাগানো দরকার।

অনিন্দ্যর মুখ থেকে আস্তে করে লেপটাকে সরাল শরণ্যা। ঝুঁকে ডাকল, —এই যে, শুনছ?

কোনও সাড়া নেই।

শরণ্যা মজা করে বলল, —কী হল, ওঠো। ডিনারের সময় হয়ে গেছে। খেতে যেতে হবে।

অনিন্দ্য নিশ্চল।

এবার এক টানে অনিন্দ্যর গা থেকে লেপটাকে সরিয়ে দিল শরণ্যা। সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠেছে অনিন্দ্য। কুঁকড়ে মুকড়ে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজল বালিশে। জড়ানো গলায় বলল, —আহ্, কী করছ কী? লেপটা দাও। আমি জেগেই আছি।

—তার মানে এতক্ষণ মটকা মেরে পড়ে আছ? কী ছেলেরে বাবা! ওঠো, শিগ্‌গিরই ওঠো।

—কেন?

—একটু বেরোব না?

চোখ রগড়াতে রগড়াতে অনিন্দ্য উঠে বসল। —এই ওয়েদারে কোথায় যাবে?

—ঘুরব। হাঁটব, ম্যালে গিয়ে বসব। আকাশে মেঘ আছে বলে কেউ দার্জিলিং-এ এসে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে? শরণ্যা ঠোঁট ফোলাল, —কালও তো ওয়েদারের ছুতো দেখিয়ে নড়লে না, ঘরে বসে বসে ড্রিঙ্ক করলে।

অনিন্দ্যর চোখে সামান্য চাঞ্চল্য দেখা গেল যেন। হাতবাড়িয়ে লেপটাকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে বসেছে। ভাবল কী একটা। তারপর বলল, —অলরাইট, চলো। আজ তো একবার ম্যালে যেতেই হবে।

শরণ্যা সামান্য অবাক, —কেন?

হাত বাড়িতে শরণ্যার গালে আলতো টোকা দিল অনিন্দ্য, —আর একটা বোতল কিনতে হবে ডার্লিং।

—আবার কেন? একটা গোটা বোতল তো এখনও স্যুটকেসে রয়েছে!

—যেটা নীলাচল এনে দিয়েছিল? তোমায় বললাম যে, ওটা আমার চলবে না।

—না চলার কী আছে? ওটাও তো হুইস্কিই!

—ওটা রয়্যাল স্ট্যাগ। বাবার ব্র্যান্ড। আমি আর্য মুখার্জির ব্র্যান্ড ছুঁই না।

অনিন্দ্যর স্বরে প্রচ্ছন্ন বিরাগ। শরণ্যা আমল দিল না। চোখ টিপে বলল, —তুমি কী খাও আর্যপুত্র? মেয়ে হরিণ?

রসিকতাটা বুঝলই না অনিন্দ্য, আরও গোমড়া হয়ে গেছে। চোয়াল শক্ত করে বলল, —আর্যপুত্র বলে ডাকতে তোমাকে না বারণ করেছি?

—আহা, বারণ করলেই শুনতে হবে? শরণ্যা তর্ক জুড়ল,—আর্যপুত্র ডাকটা খারাপ কী? আগেকার দিনে বরকে তো আর্যপুত্র বলাই রেওয়াজ ছিল। পরশুরাম পড়নি? হিড়িম্বাও ভীমকে...

—ফাজলামি করো না। আমার ওই ডাকটা একদম পছন্দ নয়।

—তোমায় তাহলে কী বলে ডাকব? তোমার তো কোনও ডাকনামও নেই!

—নেই তো নেই। অনিন্দ্য বলে ডাকবে।

অনিন্দ্যর চটে যাওয়াটা উপভোগ করছিল শরণ্যা। তবু যা হোক কথা তো বলছে দুটো চারটে। সারাক্ষণ মুখ বুজে থাকলে কী করে অনিন্দ্যর মনের জানলা খুলবে শরণ্যা।

অনিন্দ্যকে আর একটু উসকে দেওয়ার জন্য শরণ্যা গলায় আদুরে ভাব ফোটাল, —যাই বলো, এটা কিন্তু খুব স্ট্রেঞ্জ। তোমার কোনও ডাকনাম নেই, তোমার ভাই-এর কোনও ডাকনাম নেই...!

—তো?

—কেন নেই?

—কেউ রাখেনি, তাই। ডাকনাম ধরে ডাকার মতো কারও ইচ্ছে ছিল না, তাই। কিংবা সময় ছিল না কারও।

অনিন্দ্যর স্বরে যেন ক্ষোভের আভাস। ক্ষোভ? না অভিমান? বাবা-মার ওপর অনিন্দ্যর একটা রাগ আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ছেলে তো মা বাবার কাছে ঘেঁষেই না। বিয়ের পর শরণ্যাকে নিয়ে ফার্ন রোডের বাড়িতে যখন প্রথম ঢুকল অনিন্দ্য, মা-বাবাকে প্রণাম পর্যন্ত

করল না। কে জানে হয়তো বা প্রণাম না করাটাই ও বাড়ির রীতি। খাবার-টেবিলে একসঙ্গে বসলেও মা-বাবার সঙ্গে কদাচিৎ বাক্যালাপ হয় ছেলের, নজরে পড়েছে শরণ্যার। দার্জিলিং-এ এসে নিবেদিতাকে পৌঁছোন সংবাদ দিতে চাইল শরণ্যা, তাতেও অনিন্দ্যর ঘোর আপত্তি। তোমার বাবা-মাকে ফোন করতে চাও কর, ফার্ন রোডে জানানোর প্রয়োজন নেই! আর্য মুখার্জির ছেলে আর্যপুত্র ডাক শুনেই বা চটে যায় কেন?

বিয়ের সময়ে কি কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে? পারিবারিক অন্তর্কলহ? কে জানে বাবা কী ব্যাপার, তবে শরণ্যার তো অনিন্দ্যর বাড়ির লোকজনকে বেশ লেগেছে। সবাই যে যার মতো থাকে, কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলায় না। শরণ্যারই ভাল, দিব্যি স্বাধীন ভাবে থাকতে পারবে শ্বশুরবাড়িতে। অনিন্দ্যর বাবা তো নিপাট ভালমানুষ। একেবারে নির্বিরোধী। পণ্ডিত ব্যক্তি, এক সময়ে কলেজে পড়াতেন, মিউজিয়ামেও চাকরি করেছেন দীর্ঘকাল, এখন পড়ে থাকেন শুধু বই-এর জগতে। শ্বশুরমশাইকে দিনে একটার বেশি দুটো কথা বলতে শোনেনি শরণ্যা। সন্ধেবেলা একটু চুকুচুকু করার অভ্যেস আছে, তবে মোটেই নেশাড়ু নন। নেশা নাকি তাঁর একটাই। খবরের কাগজ ম্যাগাজিনে দিস্তি দিস্তে চিঠি লেখা। আর শরণ্যার শাশুড়ি তো রীতিমত মহীয়সী মহিলা। সামান্যতম গোঁড়ামি নেই, মিছিমিছি শুয়ে বসে অলস জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত নন, কত রকম সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করে বেড়ান, এমন শাশুড়ি পাওয়া তো অনেক ভাগ্যের কথা। শ্বশুরবাড়ি আসার আগে মা পই পই করে বলে দিয়েছিল, অত বড় বনেদি বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে, গিয়েই যেন শাড়ি পরব না শাড়ি পরব না বায়না জুড়ো না... অথচ শরণ্যাকে মুখ ফুটে বলতেও হল না, শাশুড়িই যেচে সালোয়ার-স্যুট পরার পারমিশান দিয়ে দিলেন শরণ্যাকে। কত উদার! শুধু শরণ্যার দেওরটি যা একটু উড়ুউড়ু। তবে মোটেই অভদ্র নয়। তেমন আলাপী হয়তো নয়, কিন্তু শরণ্যা যেচে কথা বললে ভাল ভাবেই তো উত্তর দেয়, এবং কথাবার্তাও যথেষ্ট মার্জিত। এমন সভ্য ভদ্র পরিবারে তেমন বড়সড় বিবাদ কী থাকতে পারে?

থাকলে আছে, না থাকলে নেই। হানিমুনে এসে ওই কাল্পনিক দুশ্চিন্তায় কেন পীড়িত হবে শরণ্যা! তবে হ্যাঁ, অনিন্দ্যর মনে যদি কোনও কষ্ট থাকে, শরণ্যা তা মুছে দেবে।

পাশে বসে অনিন্দ্যর গলা জড়িয়ে ধরল শরণ্যা। ছেলে-ভুলোন গলায় বলল, —ডাকনাম নেই বলে খুব দুঃখ মনে হচ্ছে? বেশ, আমি তোমাকে একটা নাম দিচ্ছি।

অনিন্দ্য খুশি হল কি না বোঝা গেল না। চুপ করে আছে।

শরণ্যা একটু চুমু খেল অনিন্দ্যকে। ফিসফিস করে বলল, —আজ থেকে তুমি অনি। আমার অনি। খুশি?

হঠাৎ অনিন্দ্য যেন গলে গেল। লেপের ভেতর টেনে নিয়েছে শরণ্যাকে। মুখ গুঁজে দিল শরণ্যার বুকে। নাক ঘসছে শরণ্যার ঘাড়ে গলায়। দু বাহুতে পিষছে শরণ্যার তুলতলে শরীর।

আদরটাকে বেশ খানিকক্ষণ উপভোগ করল শরণ্যা। তীব্র কামে বিবশ হয়ে আসছে দেহ, কেমন কেমন যেন করছে ভেতরটা। অজান্তেই দু'হাত আঁকড়ে ধরল অনিন্দ্যকে, নখ বিঁধে যাচ্ছে অনিন্দ্যর পিঠে। মাত্র ক'দিন হল এই অচেনা সুখের স্বাদ পেয়েছে শরীর, স্নায়ুকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না শরণ্যা। রাখার ইচ্ছেও নেই।

হঠাৎই দরজায় টকটক। সচকিত শরণ্যা কোনক্রমে ছাড়াল নিজেকে। আলুথালু বেশ মোটামুটি ঠিকঠাক করে দরজা খুলল। বেয়ারা। এমন একটা প্রগাঢ় মুহূর্তে লোকটার হাজির হওয়ার কোনও অর্থ হয়!

—চা খাবেন না মেমসাব?

শরণ্যা নয়, অনিন্দ্যই অন্দর থেকে রুক্ষ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল,— কিছু লাগবে না। ভাগো ইহাঁসে।

মধ্যবয়স্ক নেপালি কর্মচারীটি থতমত খেয়ে পালাচ্ছে। যেতে যেতেও ঘুরে ঘুরে দেখছিল, শরণ্যা দরজা বন্ধ করে দিল। নিজেরও একটু একটু রাগ হয়েছিল বটে, কিন্তু অনিন্দ্যর হাঁড়িমুখখানা দেখে হেসে ফেলল। চোখ ঘুরিয়ে বলল,— ঠিক হয়েছে। একে কী বলে জানো? দেয়ার ইজ মেনি আ স্লিপ্ বিটুইন কাপ অ্যান্ড দা লিপ। কিম্বা বাড়া ভাতে ছাই।

অনিন্দ্য ছটফট করছিল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,— লেট কোরো না। এসো।

—উঁহু। গোটা রাত পড়ে আছে। এখন চটপট ড্রেস করে নাও। বেরোব।

অনিন্দ্যকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অ্যান্টিরুমে চলে এল শরণ্যা। এখানেই ড্রেসিংটেবিল, এখানেই ওয়ার্ড্রোব। স্যুটকেস থেকে খান চারেক সালোয়ার স্যুট বার করে সাজিয়ে রেখেছে ওয়ার্ড্রোবে, খান দুয়েক জিন্স টিশার্টও। আজ সালোয়ার কামিজ নয়, জিন্স পরবে। গাঢ় নীলটা নয়, ফ্যাকাশে নীল।

নাইটি হাউসকোট ছেড়ে ডেনিম ট্রাউজারখানা পরে নিল শরণ্যা, লাল টুকটুকে টিশার্টের ওপর চড়াল বহুরঙা পোলোনেক্ সোয়েটার। তারপর এসে বসল আয়নার সামনে। ভাল করে ক্রিম মাখছে। শরণ্যা কখনই চড়া মেকআপ করে না। তার গায়ের রঙটি শ্যামলা, কিন্তু নাক চোখ মুখ ভারী নিখুঁত, প্রায় দেবীপ্রতিমার আদলে গড়া, উগ্র প্রসাধনের তার প্রয়োজনই হয় না। সযত্নে আইলাইনার বোলালো চোখে, সূক্ষ্ম রেখার বেষ্টনীতে আরও গভীর হল শরণ্যার কালো চোখ। ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক ছোঁয়াল, আরও যেন প্রস্ফুটিত হল ওষ্ঠাধর। চিকন চিকন চুল মেলে দিল পিঠে। সিঁথির রক্তিম চিহ্নটুকু ছাড়া তাকে এখন আর নববধূ বলে চেনাই দায়।

অনিন্দ্য এমন সাজে এই প্রথম দেখছে শরণ্যাকে। চোখ সরাতে পারছে না।

শরণ্যা ভুরু নাচিয়ে বলল, —কী দেখছ ড্যাবডেবিয়ে? গিলে ফেলবে নাকি?

অনিন্দ্য অস্ফুটে বলল, —উঁহু, চিবিয়ে চিবিয়ে খাব।

—ইশ, আমি বুঝি খাবার?

—খাবারই তো। দা বেস্ট অ্যান্ড দা মোস্ট ডেলিশাস্ ফুড।

—বটে? শরণ্যা দুলছে মৃদু মৃদু, —কী রকম ফুড শুনি? চাইনিজ? না কন্টিনেন্টাল?

—মুঘলাই। খাস লখ্নৌ-এর বিরিয়ানি।

—দেখো, খেয়ে যেন অ্যাসিড না হয়। দেহে বিচিত্র হিল্লোল তুলে চেয়ার টেনে বসল শরণ্যা। গরম মোজা পায়ে গলাতে গলাতে বলল,— এই, একটা রিকোয়েস্ট করব? রাখবে? অনিন্দ্য লেপ ছেড়ে উঠে আড়মোড়া ভাঙছিল। বলল, —শুনি তো আগে।

—আজ ড্রিংক কোরো না প্লিজ।

—কেন?

—এমনি। না খেলে কী হয়?

—খেলেই বা কী হয়? তুমিও তো কাল সিপ দিয়েছিলে, খারাপ লেগেছিল?

—তুমি তো চুমুকে থামবে না, ঢকঢক চালাবে। কাল তো আউট হয়ে ঘুমিয়েই পড়লে। ছিঃ, কী বিচ্ছিরি।

—কোনটা বিচ্ছিরি? ড্রিংক করাটা? না ঘুমিয়ে পড়াটা?

—দুটোই।

অনিন্দ্য অ্যান্টিরুমে পোশাক বদলাতে যাচ্ছিল, ভুরু কুঁচকে ঘরে তাকাল,— তোমার কি ড্রিংক করা নিয়ে কোনও ট্যাবু আছে?

শরণ্যা চট করে জবাব দিতে পারল না। মদ্য পান নিয়ে তার তেমন ছুঁৎমার্গ নেই, তার বাবাও তো খায় মাঝেমধ্যে। তবে মাঝেমধ্যেই। অথবা কালেভদ্রে। শরণ্যার ছোটমামা হঠাৎ হঠাৎ দিদির বাড়িতে হানা দিয়ে হিড়িক তুলতে শুরু করে, —ও নবেন্দুদা, গা'টা ম্যাজম্যাজ করছে, আজ একটু হয়ে যাক। শুনেই হাঁ হাঁ চেঁচাতে থাকে মা, আর বাবা কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে পা টিপে টিপে চুপিসাড়ে বেরিয়ে যায়, ফেরে কাগজে মোড়া ছোট্ট একখানা বোতল নিয়ে, সঙ্গে গাদা গাদা চানাচুর আর আলুভাজা। গজগজ করতে করতে মা শসাটা পেঁয়াজটা কেটে দেয়, পকোড়াও ভেজে দেয় কখনও কখনও। তারপর দরজা জানলা বন্ধ করে, পাড়াপ্রতিবেশীর দৃষ্টি বাঁচিয়ে শুরু হয় শালা ভগ্নিপতির মদ্যপান। সে এক দৃশ্য! খাওয়ার পর বাবা গোটা ফ্ল্যাট হেঁটে হেঁটে দেখে পা টলছে কিনা! দু'-তিনিটি অন্তর অন্তর শরণ্যার মুখের কাছে মুখ এনে প্রশ্ন, অ্যাই বুবলি, গন্ধ পাচ্ছিস? ঠাম্মার ঘরে তো তখন কেটে ফেললেও ঢুকবে না বাবা। একদিন ওই সময়ে বেলগাছিয়া থেকে ছোটঠাম্মার ফোন এসেছিল, রিসিভার তুলে কথা বলতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে মুখে রুমাল

চাপা দিয়েছিল বাবা। দেখে শরণ্যা আর শরণ্যার মা হেসে কুটিপাটি। এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠা শরণ্যার মদ্যপান তো একটু বাধো বাধো ঠেকতেই পারে।

আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে শরণ্যা বলল,— নাহ্, ট্যাবু কিসের। চল, বেরিয়ে পড়ি।

হোটেলের বাইরে এসে অনিন্দ্য বলল,— উফ্, কী শীত!

মেঘের দাপট কমেছে খানিকটা, পথঘাট এখন কিছুটা স্বচ্ছ। আকাশ একটু পরিষ্কার হওয়ার দরুনই বুঝি ঠাণ্ডা ঝপ করে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। হাওয়া বইছে অল্প অল্প। কনকনে। বরফের ছুরির মতো।

শরণ্যা শীতলতাটা দিব্যি উপভোগ করছিল। হাসতে হাসতে বলল, —দার্জিলিং-এ ঠাণ্ডা থাকবে না তো কি লু বইবে?

ঠাট্টাটা যেন ছুঁল না অনিন্দ্যকে। বলল, —রুম থেকে মাংকিক্যাপটা নিয়ে এলে হত।

—অ্যাই, হানিমুনে এসে মাংকিক্যাপ পরতে নেই।

অনিন্দ্যর হাত ধরে টানল শরণ্যা। নামছে। হোটেল থেকে ম্যাল মিনিট পাঁচেকের পথ। গোটাটাই উতরাই। ভিজে পাহাড়ি রাস্তা পিছল হয়ে আছে, শরণ্যা সাবধানে পা ফেলছিল। বাইরের শৈত্য আর অনিন্দ্যর হাতের তালু থেকে সঞ্চারিত তাপ মিলে মিশে ভারি অদ্ভুত এক অনুভূতি চারিয়ে যাচ্ছে শিরা উপশিরায়। এ যেন শুধু সুখ নয়, আনন্দ নয়, তৃপ্তি নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। এক অজানা রোমাঞ্চ। অচেনা শিরশিরে ভাললাগা।

হাঁটতে হাঁটতে শরণ্যা বলল, —দেখেছ অনি, ওয়েদারটা কেমন ঝুপ করে ভাল হয়ে গেল! দ্যাখো দ্যাখো, একটা দুটো তারাও ফুটেছে আকাশে!

অনিন্দ্য আলগা ভাবে বলল, —হুঁ

—ভাবতে কী অবাক লাগে, তাই না? শরণ্যার চোখে স্বপ্ন স্বপ্ন ঘোর, — মাত্র ক'দিন আগেও তুমি আমায় চিনতে না, আমি তোমায় চিনতাম না... আর আজ কলকাতা থেকে কত দূরে একটা নির্জন পাহাড়ে দু'জনে হাত ধরাধরি করে হাঁটছি!

অনিন্দ্য ফের আলগা ভাবে বলল, — হুঁ।

—হঠাৎ করে তুমি কেমন আমার আপন হয়ে গেলে! সব থেকে কাছের লোক!

—হুঁ।

—কী তখন থেকে হুঁ হুঁ করছ? অনিন্দ্যর মেয়েলি ধাঁচের নরম নরম হাতের তালুতে চাপ দিল শরণ্যা, —কিছু বল।

—কী বলব?

—কিছু অন্তত বল। এখনই তো কথা বলার সময়। এর পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে তুমি তো সেই সকালে অফিসে বেরিয়ে যাবে, সন্ধেবেলা ফিরবে, আর আমি... অ্যাই অনি, আমিও কিন্তু রিসার্চে জয়েন করে যাব।

এবার আর হুঁ হ্যাঁ কিছু নেই।

শরণ্যা উৎসাহ ভরে বলল, —আমি কী নিয়ে কাজ করব, আন্দাজ করতে পারো? ...পারলে না তো? আমার স্যার, মানে পি. এস. বি, অ্যাডাল্ট এডুকেশানের ওপর কাজ করছেন। আমাকেও বলেছেন ওই লাইনেই একটা কোনও টপিক তৈরি করে দেবেন। ডাটা কালেকশানের জন্য তখন কিন্তু আমায় খুব ছোটাছুটি করতে হবে। এই লাইব্রেরি, ওই লাইব্রেরি...। বেশি ফিল্ডওয়ার্ক যদি করতে হয় তাহলে তো গেলাম। কোথায় কোন গ্রামেগঞ্জে ঘুরে স্যাম্পল কালেকশান করতে হয় তার ঠিক কী? সুন্দরবন বেল্টটা নিয়ে স্যারের খুব আগ্রহ, হয়তো ওদিকেও ছুটতে হতে পারে। তবে বেস্ট হয় যদি রেডিলি অ্যাভেলেবল্ ডাটা অ্যানালিসিস করে পেপার তৈরি করা যায়। ঝক্কি কত কম বল? বই টই নিয়ে এসে ঘরে বসেই কাজ করতে পারি। ভাল হবে না তাহলে, বল?

অনিন্দ্যর সংক্ষিপ্ত উত্তর, —হুঁ।

শরণ্যা টের পেল অনিন্দ্য তার কথা মোটেই মন দিয়ে শুনছে না। জেরার ঢঙে প্রশ্ন করল, —অ্যাই ছেলেটা, এতক্ষণ কী বললাম বল তো?

অনিন্দ্য যেন সচকিত হল, —অ্যাঁ?

—এত অন্যমনস্ক কেন? কী ভাবছ?

—না মানে... কানে বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে, অন্তত মাফলারটা যদি নিয়ে আসতাম।

ঘোর লাগা মুহূর্তটা পলকে ছিঁড়ে গেল শরণ্যার। কী একবগ্গা ছেলে রে বাবা! একবার মাথায় ঢুকেছে ঠাণ্ডা লাগছে তো ঠাণ্ডাই লাগছে, ঠাণ্ডার বাইরে আর কিছু ভাববেই না! যে সব ছেলেরা কম কথা বলে, তারা কি শুধু এভাবেই নিজের মধ্যে ডুবে থাকে? শরণ্যার বন্ধু চৈতালির বরটাও নাকি এমন উৎকট টাইপ ছিল, কড়া দাওয়াই দিয়ে চৈতালি তাকে সিধে করেছে। ঘড়ি মেপে টানা দু'ঘন্টা গল্প না করলে বরকে নাকি অঙ্গ স্পর্শ করতে দেয় না চৈতালি। শরণ্যাকেও ওরকম কোনও একটা ওষুধের কথা ভাবতে হবে।

ম্যাল এসে গেছে। ট্যুরিস্ট সিজন নয়, চত্বরটা এখন প্রায় ফাঁকা। এক-আধ জোড়া কপোত-কপোতী বসে আছে বেঞ্চে, ঘোরাফেরা করছে স্থানীয় লোকজন। আশপাশের দোকানপাট ঝলমল করছে আলোয়, ঠিকরে আসা দ্যুতিতে খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে আছে ম্যাল।

অনিন্দ্যকে টানতে টানতে শরণ্যা ম্যালের প্রান্তে এসে দাঁড়াল। রেলিং-এর ওপারে পাহাড় জঙ্গল চা-বাগান লোকবসতি সব ডুবে আছে কুয়াশা-মাখা অন্ধকারে, তাকিয়ে থাকলে তেমন গা ছমছম করে। হঠাৎ কোথ্থেকে যেন ধেয়ে আসে উড়ো মেঘ, জলীয় বাষ্প স্যাঁতসেঁতে করে দিয়ে যায় মুখচোখ।

একটা পাহাড়ি কিশোর এসে সামনে দাঁড়াল,— হর্স রাইডিং করবেন বিবিজি?

শরণ্যা অবাক মুখে বলল, —এই অন্ধকারে হর্স রাইডিং?

ছেলেটা ঘ্যানঘেনে সুরে বলল, —চলুন না বিবিজি। সারাদিন কামাই নেই... বেশি লাগবে না, ওনলি টোয়েন্টি রুপিজ।

হাড়জিরজিরে গোটা তিন-চার টাট্টুঘোড়া চরছে ম্যালে। তাদের ঝলক দেখে নিয়ে শরণ্যা বলল, —মাথা খারাপ! এই অন্ধকারে ওই ঘোড়ায় চড়ে মরি আর কি!

—কিছু হবে না বিবিজি। সাব আর আপনি দুটো ঘোড়া নিয়ে নিন, আমি আপনাদের সাথ সাথ থাকব।

শরণ্যা অনিন্দ্যকে জিজ্ঞেস করল, —কী, চড়বে?

জোরে জোরে মাথা নাড়ল অনিন্দ্য, —না না, ও আমার পোষায় না।

শরণ্যা চাপা গলায় বলল, —আহা, চলই না। বেচারা এত করে বলছে, ওর একটু রোজগারও হয়।

—ওর ইনকাম হবে বলে আমায় ঘোড়ায় চড়তে হবে? তোমার ইচ্ছে হলে তুমি যাও।

—একা যাব?

—সে তুমি বোঝো।

না'ই বলে দিতে যাচ্ছিল শরণ্যা, পাহাড়ি ছেলেটার দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল। ভারি কাতর মুখে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। শুকনো শুকনো চেহারা, গায়ে একটা জীর্ণপ্রায় মলিন ফুলসোয়েটার লগবগ করছে। শরণ্যা রাজি হয়ে গেলে কুড়িটা টাকা তো উপার্জন হয়।

সামান্য ইতস্তত করে শরণ্যা বলল, —চল। ঘোড়া কিন্তু জোরে চালিও না। বলেই অনিন্দ্যকে হাত নাড়ল হাসি হাসি মুখে,— একটা পাক মেরে আসি তাহলে? তুমি ততক্ষণ বসে বসে একটু ঝিমিয়ে নাও।

সন্তর্পণে বেঁটে ঘোড়ার পিঠে চাপল শরণ্যা। ঘোড়া চলেছে দুলকি চালে, লাগামখানা ধরে আছে পাহাড়ি কিশোর। পাকদণ্ডী বেয়ে প্রথমে খানিকটা নামতে হয়, তারপর চড়াই ধরে ফের ম্যালে উঠে আসা, সময় লাগে বড় জোর মিনিট পনেরো, জানে শরণ্যা। এর আগেও মা বাবার সঙ্গে দার্জিলিং-এ এসে চড়েছে ঘোড়ায়। তখন শরণ্যার বোধহয় ক্লাস সেভেন। সেবার ঘুরতে ফিরতে ঘোড়ায় চাপত শরণ্যা, আর বাবা সর্বক্ষণ ছায়ার মতো থাকত সঙ্গে সঙ্গে। সহিসের ওপর ভরসা নেই, যদি ঘোড়া জোরে জোরে ছোটায়, যদি বুবলি পড়ে যায়! ম্যালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মা'রও কী টেনশান। অ্যাই, ঘোড়া খাদের ধারে যায় নি তো? এবার যেন একটু বেশি সময় লাগল, ঘোড়া কি অন্য দিকে চলে গেছিল?

আজ আলোছায়া মাখা শুনশান পাকদণ্ডীতে শরণ্যা একা।

ভাসমান মেঘে মাঝে মাঝেই ঢেকে যাচ্ছিলি শরণ্যা। বুকটা ভার হয়ে গেছে। কী করছে এখন বাবা মা? শরণ্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে খুব মনখারাপ? নিশ্চয়ই এতক্ষণে অফিস থেকে ফিরে এসেছে দু'জনে, তারপর টিভি চালিয়ে বসে আছে চুপটি করে। এই মুহূর্তে তারাও হয়তো তাদের বুবলির কথাই ভাবছে। ট্রেন ছাড়ার আগে মা সেদিন

বলছিল ঠাম্মার নাকি জ্বর-জ্বর মতো হয়েছে। এখন কেমন আছে ঠাম্মা? পরশু ফোন করার সময় ঠাম্মার খবরটা নেওয়া হয়নি, খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আজ হোটেলে ফিরেই আগে টেলিফোন করতে হবে।

অন্যমনস্ক ভাবনার মাঝে অশ্বারোহণ শেষ। নেমে এদিক ওদিক তাকাল শরণ্যা, অনিন্দ্যকে দেখতে পেল না। আশপাশের বেঞ্চিতে নেই, ম্যালেও হাঁটছে না... আশ্চর্য, গেল কোথায়? বোতল কিনতে ঢুকেছে? কী ছেলে! শরণ্যা আসা পর্যন্ত তর সইল না?

পাহাড়ি ছেলেটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে হনহনিয়ে শরণ্যা ম্যালের লাগোয়া ওয়াইন স্টোরে এল। কই, এখানেও তো নেই! কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে? নাকি কিছু কেনাকাটা করতে গেল?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বেশ খানিকক্ষণ ম্যালের মধ্যিখানটায় দাঁড়িয়ে রইল শরণ্যা। পাশে পাহাড়ি কিশোর। জুলজুল চোখে সে দেখছে শরণ্যাকে। কী করবে শরণ্যা ভেবে পাচ্ছিল না। ইশ, কেন যে বুদ্ধি করে ভ্যানিটিব্যাগ সঙ্গে নেয়নি!

ছেলেটাই যেচে বলল, —কুছু ভাববেন না বিবিজি। হোটেলের নাম বাতলে দিন, আমি রুপিয়া নিয়ে আসব।

ঝাঁ ঝাঁ বিরক্তি নিয়ে হোটেল ফিরেই শরণ্যা হাঁ। রুমে চলে এসেছে অনিন্দ্য। টেবিলে গ্লাস বোতল সাজাচ্ছে।

শরণ্যা ফেটে পড়তে গিয়েও সামলে নিল। গুমগুমে গলায় বলল, —তুমি আমায় ফেলে চলে এলে?

অনিন্দ্যর বিকার নেই। গ্লাসে সোডা ঢালতে ঢালতে বলল, —কী করব, ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছিল যে।

—তা বলে... তুমি... আমায়! শরণ্যার কথা আটকে গেল।

—মাফলার নিতে এসেছিলাম, তারপর আর যেতে ইচ্ছে করল না। অনিন্দ্য হাসল, —রাগ করছ কেন ডার্লিং। তুমি তো ফিরেই এসেছ।

শরণ্যার চোখের পলক পড়ছিল না। এ কেমন ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হল? অনিন্দ্য কি হৃদয়হীন? নাকি উদাসীন?

তিন

সকালে ঘুম ভাঙতেই অনিন্দ্যর মনে পড়ে গেল শরণ্যা নেই। গতকাল বিকেলে বাপের বাড়ি চলে গেছে শরণ্যা। মানিকতলায় সে এখন থাকবে দিন দশেক।

অনিন্দ্যর মেজাজটা খাট্টা হয়ে গেল। বিয়ের পর এই দেড় মাসে শরণ্যা কিছু কিছু নতুন অভ্যেস গড়ে দিয়েছে, এখন ক'দিন প্রতিপদে সেই অভ্যেসগুলো হোঁচট খেতে থাকবে। সামান্য এক কাপ চায়ের জন্যও সেই আগের মতো ডাকাডাকি করতে হবে নীলাচলকে। কোনও মানে হয়?

উঠতে ইচ্ছে করছিল না অনিন্দ্যর। শুয়ে আছে প্রকাণ্ড বিছানার প্রান্তে, গায়ে বিদেশি কম্বল। এই তুলতুলে কম্বল, এই নরম গদি বসানো ইংলিশ খাট, বালিশ চাদর সবই শরণ্যার সঙ্গে এসেছে এ বাড়িতে। নিবেদিতা মুখ ফুটে কিছুই চাননি, বরং মানাই করেছেন, তবু প্রচুর দিয়েছেন শরণ্যার বাবা মা। চমৎকার একখানা ড্রেসিংটেবিল, মেয়ে জামাই-এর জন্য আলাদা আলাদা ওয়ার্ড্রোব, আলমারি, মেয়ে বই পড়তে ভালবাসে বলে বাহারি বুককেস...। নতুন আসবাবপত্রে পুরনো আমলের বিশাল ঘরখানার চেহারাই যেন বদলে গেছে। গন্ধও। বালিশে মুখ গুঁজেও অনিন্দ্য গন্ধটা টের পাচ্ছিল।

জানলার পরদা ভেদ করে আলো এসে পড়েছে ঘরে। হলদে আলোয় ভেসে যাচ্ছে পুবের ঘরখানা। শুয়ে থাকতে থাকতেই হাত বাড়িয়ে সাইডটেবিল থেকে রিস্টওয়াচখানা তুলল অনিন্দ্য। সাতটা পঁয়ত্রিশ। শরণ্যার ঘড়িটাও পড়ে আছে পাশে। সম্ভবত নিয়ে যেতে ভুলে গেছে শরণ্যা। জোড় মিলিয়ে বানানো একই ডিজাইনের ঘড়ি। শরণ্যার ছোটমামার উপহার। দ্বিতীয় ঘড়িখানা তুলেও অনিন্দ্য সময় দেখল একবার। দু মিনিট এগিয়ে আছে শরণ্যা। আশ্চর্য, এত তাড়াতাড়ি কেন তফাত এসে গেল? মিলিয়ে এক করে দেবে? শরণ্যাকে পিছোবে? না নিজেরটা এগোবে? কিন্তু কোন্টা ঠিক?

ধুস, যেমন আছে থাক। অফিসের দিন, বিছানায় শুয়ে আর দেয়ালা করা ঠিক হচ্ছে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গা থেকে কম্বলটাকে লাথি মেরে সরিয়ে অনিন্দ্য নামল বিছানা থেকে। ঢুকেছে লাগোয়া বাথরুমে। অনিন্দ্যর দাদামশাই সোমশংকর চ্যাটার্জি ছিলেন পাক্কা সাহেব, এ বাড়ি বানিয়েছিলেন সাহেবি কায়দায়, প্রতিটি শয়নকক্ষের সঙ্গেই বাথরুম আছে। স্নানাগারগুলোর চেহারাও তারিফ করার মতো। খাঁটি ইটালিয়ান মার্বেল বসানো। বাথটব শোভিত। এখন অবশ্য বাথটবটার ভগ্নপ্রায় দশা, দেখে অতিকায় গামলা মনে হয়। মেঝের মার্বেলও ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। অনিন্দ্য অবশ্য ওসবের দিকে তাকায় না। বাথরুমের কাজটুকু মিটলেই তার যথেষ্ট।

ছরছর করে কমোডে পেচ্ছাপ করল অনিন্দ্য। তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করল পেচ্ছাপের রঙটা। কাল একটু হলুদ হলুদ লেগেছিল, আজ মোটামুটি বর্ণহীন। নাহ্, শরীর ঠিকই আছে। নিশ্চিন্ত মনে কল খুলল বেসিনের। জানুয়ারির গোড়ায় এবার বেশ ভালই শীত পড়েছিল, ক'দিন হল ঠাণ্ডা কমেছে, তবে জলে এখনও বেশ কনকনে ভাব। হাত বাড়িয়ে গিজায় অন করতেই ফের তিরিক্ষি মেজাজটা ফিরে এল অনিন্দ্যর। কাল নীলাচলকে বলেছিল গিজার চলছে না, কিন্তু এখনও সারানো হয়নি। নীলাচল আর কী করবে, এ বাড়িতে তো কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম! আচ্ছা, গিজার ইস্যুতে নিবেদিতা দেবীর সঙ্গে একটা ছোট্ট ফাটাফাটি করলে কেমন হয়? বাপের সম্পত্তি শুধু ভোগই করে যাবে, দরকারে অদরকারে দু পয়সা ঢালবে না? ওই তো ছিরির একটা রঙ করা হল, বাড়ির ফাটাফুটোগুলো পর্যন্ত ভাল করে সারাল না! শরণ্যা তো নেই, এ সময়ে দেবে নাকি একটা ঝাড়?

ভাবনাটায় অদ্ভুত রকমের তৃপ্তি আছে। টগবগ ফুটতে থাকল অনিন্দ্য, আবার মনটাও যেন শান্ত হল অনেকটা। বাথরুম আগে বেশ অগোছাল থাকত, শরণ্যা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে জিনিসপত্র, দরকারি সাজসরঞ্জাম হাতের কাছে পেতে আজকাল আর অসুবিধে হয় না। ঝটপট মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে নিল অনিন্দ্য। গালে ঠাণ্ডা জল ছোঁয়ানোর সময় মনে পড়ে গেল গিজার খারাপ বলে শরণ্যা কাল রান্নাঘর থেকে জল গরম করে এনে রেখে দিয়েছিল বাথরুমে। নিজে থেকেই। অনিন্দ্যর ছোট ছোট আরামগুলোর কথাও কী নিখুঁত ভাবে স্মরণে রাখে শরণ্যা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে অনিন্দ্য নতুন কাশ্মীরি শালখানা জড়িয়ে নিল গায়ে। এটাও বিয়েতে পাওয়া। তত্ত্বে এসেছিল। ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার থেকে চিরুনি বার করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ নজরে পড়ল কমপিউটারের আলো জ্বলছে। কাল রাত্তিরে চ্যাট রুমে থাকতে থাকতে ঘুম এসে গিয়েছিল, তাই বোধহয় অফ করা হয়নি। এহ্, পি.সি.-টা কিনতে গাঁট থেকে কড়কড়ে আটত্রিশ হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে, এমন ভুলের কোনও ক্ষমা নেই!

কম্পিউটারের সুইচ অফ করছে অনিন্দ্য, দরজায় নীলাচল, —বড়দা, তুমি উঠে পড়েছ?

অনিন্দ্য ঘাড় বেঁকাল, —কেন?

নীলাচল এ বাড়িতে এসেছিল বারো বছর বয়সে। বাড়ি মেদিনীপুরের দাঁতনে। নীলাচলের বাবা ত্রিভুবন কাজ করত সুহাসিনী ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে, বছর দশেক আগে সে তার ছোটছেলেকে নিবেদিতার কাছে দিয়েছিল। বেশ চালাক চতুর ছেলে নীলাচল, এ বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে সে দারুণ সড়গড়ও হয়ে গেছে, রান্নাবান্না ছাড়া সমস্ত ধরনের কাজই করে সে। নীলাচলকেই মুখার্জি বাড়ির গিন্নি বলা যায়।

কুচকুচে কালো, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা নীলাচল ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসছে,

—বউদিমণি তোমায় আটটার মধ্যে ঘুম থেকে তুলে দিতে বলেছে।

—অ।

—এখানে চা দেব? না টেবিলে আসবে?

—অসুবিধে না হলে ঘরেই দিয়ে যা।

—আমার অসুবিধে কী? যে যা বলবে তাই হবে।

এ বাড়িতে বেড-টির চল নেই। থাকবে কী করে, কে কখন ঘুম থেকে ওঠে তার ঠিক আছে? আর্যর নিদ্রাভঙ্গ হয় ব্রাহ্ম মুহূর্তে, নিয়মিত মর্নিংওয়াকে বেরোন, পথেই কোথায় যেন চা খেয়ে নেন তিনি। নিবেদিতার ঘুম ভাঙার টাইম সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা, কোনও বিশেষ কাজ থাকলে ভোরে উঠেও বেরিয়ে যান, তাঁর বেড-টি খাওয়ার অভ্যেসটিই নেই। আর সুনন্দ কখন বিছানায় যায়, কখন বিছানা ছাড়ে

কখন সে চা খাবে, কখন নয়, সে খবর তো সুনন্দ ছাড়া কেউ জানে না। অনিন্দ্যও উঠত আটটার পরে, বেশির ভাগ দিনই অফিসের দেরি হয়ে যেত, চা খেত একেবারে বেরোনর আগে, ব্রেকফাস্ট করার সময়ে।

শরণ্যা আসার পর ছবিটা বদলেছে। অন্তত অনিন্দ্যর ক্ষেত্রে। চায়ের কাপ পৌঁছে যাচ্ছে অনিন্দ্যর বিছানায়। এবং সেটা সাড়ে সাতটা বাজার আগেই। শরণ্যা নিজেও বেলা অবধি শুয়ে থাকতে পারে না, অনিন্দ্যকেও বেশিক্ষণ গড়াগড়ি খেতে দেয় না বিছানায়। ছুটির দিনেও না।

এও তো অভ্যেসের বদল। নীলাচল চা দিয়ে গেছে, কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবছিল অনিন্দ্য। আর কী কী পরিবর্তন ঘটেছে? আগে শার্টপ্যান্ট যেমন তেমনভাবে ছড়ানো থাকত, যেটা হাতের সামনে পেল সেটাই গলিয়ে অনিন্দ্য ছুট লাগাচ্ছে, এখন কোন দিন কী পরবে শরণ্যাই ঠিক করে দেয়। খাওয়ার সময়ে পাশে কেউ দাঁড়িয়ে, এটাও কি পরিবর্তন নয়! অফিস থেকে ফিরে এতদিন অনিন্দ্যর কাজ ছিল সিডি চালিয়ে হরর মুভি দেখতে দেখতে একা একা মদ্যপান, নয়তো কম্পিউটারে চ্যাট রুম খুলে বসে থাকা। কিম্বা স্রেফ শুয়ে থাকা টানটান। আর ছুটির দিনে তো শুধুই শুয়ে থাকা, অনন্ত শুয়ে থাকা। সেই সঙ্গে মনে মনে মাকড়সার জাল বুনে যাওয়া অবিরাম। জীবনে কী কী সে পায়নি, কোনটা কোনটা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে তার হিসেব কষতে কষতে বিষাক্ত লালা ঝরত হৃদয় থেকে, আঠালো জালে বন্দি হয়ে ছটফট করত অনিন্দ্য। এখন তো সন্ধে মানেই শরণ্যা। কত কী যে কানের কাছে বিনবিন করে যায় মেয়েটা। কী বলে আর কী না বলে। নিজের বাড়ির লোকদের কথা, কলেজ ইউনিভার্সিটির গল্প, বন্ধুদের উপাখ্যান...। শরণ্যা একটুক্ষণ চুপ করে থাকলে ইদানিং কেমন যেন অস্বস্তি হয় অনিন্দ্যর। এ তো রীতিমত বড়সড় বদল। অনিন্দ্যকে আজকাল দু পেগের বেশি পান করতে দেয় না শরণ্যা, হাত থেকে গ্লাস কেড়ে নেয়। কদিন আগেও অনিন্দ্যর কাছে এ তো অচিন্ত্যনীয় ছিল।

সব চেয়ে বড় বদলটা বোধহয় এসেছে অনিন্দ্যর মনোজগতে। সে তো ছোট থেকেই একা। এই একাকিত্বকে সে তো নিয়তির মতোই মেনে নিয়েছিল। বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল খানিকটা জৈবিক কারণে। তার এক মামিমা, নিবেদিতার খুড়তুতো দাদার স্ত্রী স্বরূপা, হঠাৎই এনেছিলেন সম্বন্ধটা। শরণ্যার এক মাসি স্বরূপার ঘনিষ্ট বন্ধু, সেই সূত্রে। তা বিয়েটা ঘটে যাওয়ার পরও অনিন্দ্যর ধারণা ছিল শরীরটুকু ছাড়া আর কোনও রকম সম্পর্ক বোধহয় গড়ে উঠবে না মেয়েটার সঙ্গে। শরণ্যাকেও বেশ গায়ে পড়া মনে হত প্রথম প্রথম। কিন্তু দার্জিলিং-এর একটা রাত তাকে যেন আমূল নাড়িয়ে দিল। সেদিন মাঝরাতে শরণ্যার কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল অনিন্দ্যর। কী কাণ্ড, বিছানায় উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা। শুধু অনিন্দ্য তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেনি বলে! শুধু অনিন্দ্য তাকে একা ফেলে চলে এসেছিল বলে!

কী অসম্ভব এক দৃশ্য।

একটা মেয়ে শুধু অনিন্দ্যর জন্য এত আকুল হতে পারে?

ওই মেয়ের চোখে অনিন্দ্য এত মূল্যবান?

পৃথিবীতে তাহলে একজনও অন্তত আছে সে শুধুই অনিন্দ্যর কথা ভাববে এবার থেকে? শুধু অনিন্দ্যকেই ভালবাসবে? মনে করবে অনিন্দ্য ছাড়া তার অস্তিত্ব বৃথা?

মনের মধ্যে গড়ে ওঠা এই রোমাঞ্চকর ভাবনাগুলোই অনিন্দ্যকে তোলপাড় করছে দিনরাত। ভাবনা নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। বিশ্বাস। অহরহ তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঝংকার উঠছে— শরণ্যা আমার, শরণ্যা আমার, শরণ্যা আমার।

এই অনুভূতিতে যে কী তীব্র সুখ!

সুখটুকুকে গায়ে মেখে স্নানে গেল অনিন্দ্য। বেরিয়ে অফিসের জন্য তৈরি হল ঝটপট। তারপর সোজা খাওয়ার টেবিলে।

সাধারণত এ সময়ে ডাইনিংটেবিল ফাঁকাই থাকে। আজ পরিবারের দুই সদস্য আগেভাগে মজুত। সাবেকি আমলের বড়সড় ডাইনিংটেবিলের ঈশান কোণে আর্য, নৈর্ঋত কোণে সুনন্দ। প্রাতরাশ চলছে। সুনন্দ এমন গপগপ করে খাচ্ছে যেন এক্ষুনি কেউ তার প্লেট থেকে খাবার কেড়ে নেবে। সম্ভবত তাড়া আছে। আর্যর মুখের সামনে খবরের কাগজ, ক্বচিৎ কখনও হাত নামছে প্লেটে। মুখ চলছে অতি ধীরে, যেন লোহা চিবোচ্ছেন। অবশ্যই তাড়া নেই।

অনিন্দ্য দখল করল অগ্নি কোণ। তার চেয়ার টানার শব্দ বোধহয় একটু জোরেই হয়েছিল, পলকের জন্য হাত থামল সুনন্দর, কাগজ থেকে উঠল আর্যর চোখ। পরক্ষণেই আবার যে যার নিজস্ব ছন্দে।

অনিন্দ্য গলা ওঠাল, —নীলাচল?

—আসছি। রান্নাঘর থেকে উত্তর উড়ে এল, —এক মিনিট।

অনিন্দ্য ঘড়ি দেখল। আটটা চল্লিশ। মিনিট পনেরোর মধ্যে রওনা দিতে পারলে সাড়ে নটায় অফিসে ঢুকে যাবে। শেয়ার ট্যাক্সিতে কতক্ষণ আর লাগবে থিয়েটার রোড। জোর বিশ মিনিট। আজ সপ্তাহের প্রথম দিন, আজ দেরি করাটা উচিত হবে না।

দু'হাতে চায়ের কাপপ্লেট ব্যালান্স করতে করতে রান্নাঘর থেকে ধেয়ে এল নীলাচল। টেবিলের দু'কোণে পেয়ালা পিরিচ নামিয়ে ঝড়ের বেগে অনিন্দ্যর সামনে,— তোমার টোস্ট রেডি। সীতাদি বাটার লাগাচ্ছে। সঙ্গে কী খাবে? হাফ বয়েল? না ওয়াটার পোচ?

—দে যা হোক। জলদি কর।

—তোমায় দুটো করে কলা দিতে বলেছে বউদিমণি।

শরণ্যা কিছুই বলতে ভোলেনি। অনিন্দ্য টেবিলে টকটক করল,— দে। সঙ্গে আজ কফি দিস।

নীলাচল তির বেগে চলে গেল।

আর্য পুরো কাপ চা খান না, দু তিনটে চুমুক দিয়ে উঠে পড়েছেন। কয়েক পা গিয়েও দাঁড়ালেন। শীতল গলায় অনিন্দ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, —তুমি কি নিউজ পেপারটা দেখবে?

অনিন্দ্য কাঁধ ঝাঁকাল, —নো। থ্যাংকস্।

কাগজ হাতে আর্য ধীর পায়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখনই টেবিলের বায়ুকোণে যাঁর বসার কথা সেই নিবেদিতার আবির্ভাব। নিজের কোটর থেকে। পরনে সবুজ কটকিপাড় তসর, গায়ে তসর রঙা শাল। পারফিউম ছড়িয়েছেন শরীরে, সুবাসে ভরে গেছে হলঘর।

বায়ুর গতিতে আর্যকে পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে গেলেন নিবেদিতা। ক্ষণপরেই শাড়িতে খসখস শব্দ বাজিয়ে ফিরেছেন। টেবিলের কাছে এসে একবার সুনন্দকে দেখলেন, একবার অনিন্দ্যকে।

কেজো গলায় অনিন্দ্যকে প্রশ্ন করলেন, —শরণ্যা কাল গেল কখন?

শৌখিন কৌতূহল! অনিন্দ্য দায়সারা ভাবে বলল, —গেছে কোনও এক সময়ে।

—তুমি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলে তো?

অনিন্দ্য টেরছা ভাবে বলল, —জানাটা কি বিশেষ জরুরি?

—টেড়াবেঁকা কথা বলছ কেন? সোজা কথার সোজা জবাব হয় না?

—বাঁকা মানুষদের সোজা উত্তর দিতে নেই।

—সক্কালবেলা ফর নাথিং তুমি আমায় ইনসাল্ট করছ কেন?

—তুমিই বা আননেসেসারি প্রশ্ন করছ কেন?

—স্ট্রেঞ্জ! বাড়ির বউ কখন বাপের বাড়ি গেল জিজ্ঞেস করাটা আননেসেসারি কোয়েশ্চেন?

—বাড়ির বউ নয়। আমার বউ। তুমি যখন তার যাওয়া আসার দায়িত্ব নাওনি, তখন সে কী ভাবে গেল, কখন গেল তা জানারও তোমার মরাল রাইট নেই।

—ও কে, ও কে, আয়াম সরি। সামান্য একটা প্রশ্নকে নিয়ে তুমি এত চটকাবে জানলে আমি কিছুই জিজ্ঞেস করতাম না। নিবেদিতা চাপা স্বরে ঝলসে উঠলেন— বিয়ে করেও তুমি শোধরালে না অনিন্দ্য। দিনকে দিন ক্রুকেড হচ্ছ।

—আমাকে সিধে করার জন্য বিয়ে দিয়েছিলে বুঝি?

—ওফ্, হরিবল্। তোমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা খুব মুশকিল।

—কথা বলো কেন? কেটে পড়ো। যেখানে যাচ্ছ, যাও।

নিবেদিতা তবু নড়লেন না, ঘন ঘন কব্জি উলটোচ্ছেন।

সুনন্দ নির্বিকার মুখে চা খাচ্ছিল। মুখভাব এমন, যেন দুটো ভিন্ন গ্রহের প্রাণী কথা বলছে তার সামনে, সে তাদের ভাষা বুঝছেও না, শুনছেও না। কাপ শেষ করে উঠে পড়ল, শিস দিতে দিতে ঢুকে গেল নিজস্ব গুহায়।

ঘাড় ঘুরিয়ে ছোট ছেলেকে দেখতে দেখতে নিবেদিতা গলা চড়ালেন— কী রে নীলাচল, কী হল কী? বললাম না, সুরেন গাড়ি বার

করেছে কিনা দ্যাখ্‌?

অনিন্দ্যকে খেতে দিয়ে ত্বরিত পায়ে নীচে গেল নীলাচল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার চিৎকার, —মা, গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না।

—ডিসগাস্টিং। নিবেদিতা গজগজ করে উঠলেন, —আজ এত কাজ... হাজরা ঘুরে এগারোটার মধ্যে বেহালা পৌঁছতে হবে... আজই কিনা...!

টোস্ট চিবোতে চিবোতে অনিন্দ্য পুট্‌স মন্তব্য ছুঁড়ল। —গাড়ি যে চড়ে গাড়ির পেছনে তাকে কিছু খরচাও করতে হয়।

—আমি জানি। নিবেদিতা বিরক্ত মুখে তাকালেন, —তোমার নিজের সেই বোধটুকু আছে তো? বলেই হনহনিয়ে নেমে গেছেন একতলায়।

অনিন্দ্য চিড়বিড়িয়ে উঠল। কী ইঙ্গিত করে গেল মা? ইদানীং অনিন্দ্য মাঝেমাঝে গাড়িটা ব্যবহার করছে, তাই নিয়ে খোঁটা দিল কি? অনিন্দ্যর বাথরুমের গিজার অনিন্দ্যকেই সারিয়ে নিতে বলল না তো? নাকি সংসারে থাকতে গেলে টাকাপয়সা দিতে হয়, কায়দা করে সেই কথাটাই শুনিয়ে গেল?

ইল্লি রে, কেন দেবে টাকা? চায়'ই বা কোন মুখে? লেখাপড়া শেখানোর খরচটুকু ছাড়া ছেলের প্রতি আর কোন কর্তব্যটা পালন করেছে? একজন তো সারাজীবন গর্তে ঢুকে বসে রইলেন, আর একজন উড়ছেন সর্বক্ষণ! সমাজসেবা! হাহ্‌। এতই যখন মহৎ সাজার নেশা, মা হওয়ার দরকারটা কী ছিল? ছেলেকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিব্যি হাত ধুয়ে বসে রইল, স্কুলে গিয়ে তাকে একবার দেখে আসার কারুর সময় হয় না! সব ছেলের বাবা মা আসছে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো খুশিতে ডগমগ, সারা সপ্তাহের খুঁটিনাটি তারা উগরে দিচ্ছে বাবা-মার কাছে, কোলের কাছে বসে সন্দেশ কমলালেবু খাচ্ছে, শুধু অনিন্দ্য একা দাঁড়িয়ে ফাঁকা করিডোরে। কাঁদতে পারছে না, পাছে বন্ধুরা খেপায়। আরও আছে। ছুটিতে বাড়ি এল অনিন্দ্য, কারুর তাকে সময় দেওয়ার সময় নেই, বাপ মা দুজনেই যে যার জগতে বিভোর। কখনও যদি একত্র হয়ও, দু'জনে কামড়াকামড়ি করে কুকুরের মতো। উঁহু, একজনই কামড়ায়, অন্য জন আর্তনাদ করে। কিছু ভোলেনি অনিন্দ্য। সব মনে আছে। সব।

এখন সেই মা কী করে আশা করে ছেলে চাকরি করে তার হাতে টাকা এনে তুলে দেবে?

কিচ্ছু দেবে না অনিন্দ্য। কোনও দিন না। এক পয়সাও না।

নিমতেতো মেজাজে অনিন্দ্য বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। বাইরে একটা ঝকঝকে দিন। আকাশ নির্মেঘ, সূর্য তেমন প্রখর নয়, হাওয়াতেও ভারী নরম শীতলতা। এমন সুন্দর দিনটা, রাস্তাঘাট লোকজন যানবাহন সবই অনিন্দ্যর বিরস লাগছিল আজ।

অফিসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ইন্টারকমে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের ডাক, —মুখার্জি, একবার এসো তো।

কনস্ট্রাকশান কোম্পানির অফিস। বিশাল নামজাদাও নয়, আবার একেবারে অখ্যাতও নয়। কাজকর্ম বেশির ভাগই হয় সাইটে সাইটে, অফিসে তাই লোকজনের সংখ্যা কম। জোর জনা চল্লিশ। থিয়েটার রোডের বহুতল বাড়ির পঞ্চম তলার অফিসটাকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে বাঙালি মালিকরা।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের ঘর ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরের পাশেই। প্রধান বাস্তুকার বাদলবরণ ভৌমিক ওরফে বি বি-র বয়স বছর পঞ্চাশ, গোলগাল চেহারা, মাথা জুড়ে টাক আছে। বি বি কোম্পানির একজন অংশীদারও বটে।

অনিন্দ্য যেতেই বি বি সহাস্য মুখে বললেন, —বোসো। মন দিয়ে কথাগুলো শোন। লাস্ট উইকে রেলের একটা টেন্ডার বেরিয়েছিল। তিনটে ওভারব্রিজ কনস্ট্রাকশানের। উই লাইক টু বিড ফর দি অর্ডার।

অনিন্দ্য ঝিমোন গলায় বলল, —রেলে অর্ডার আমরা পাব কি স্যার? মনে হয় না।

—তুমি সবসময়ে এত পেসিমিস্টিক কেন বল তো? একবার পাইনি, দুবার পাইনি, থার্ড বার পেতেও পারি। বি বি গাল চওড়া করে হাসলেন। চোখ টিপে বললেন, —ইনফ্যাক্ট, আমরা গ্রিন সিগনালও পেয়েছি। বাট উই হ্যাভ টু প্রসিড ভেরি সুন। শুক্রবার টেন্ডার ভরার লাস্ট ডেট।

—ও।

—সুতরাং বুঝতে পারছ, উইদিন থ্রি ডেজ আমাদের প্ল্যানটা তৈরি করে ফেলতে হবে। ওয়েডনেজডে'ই আমরা এস্টিমেটে বসব।

অনিন্দ্য আবার বলল, —ও।

—তুমি আজকের মধ্যেই ইনিশিয়াল লে-আউটটা করে ফ্যালো। অসীম আর সুজিত তোমায় হেল্প করবে।

—এক দিনে কী করে হবে স্যার?

—কাম অন ইয়াং ম্যান। না হওয়ার কী আছে? একটা ওভারব্রিজেরই তো লে-আউট করবে, বাকি দুটো তো সিমিলার কেস। স্টেশনগুলোর ডিটেল ডাটা... আই মিন লেগ, হাইট, কী চাইছে রেল, সবই আমাদের হাতে আছে। টেবিল থেকে ফাইল বাড়িয়ে দিলেন বি বি,— দ্যাখো খুলে। কাজটা মোটেই কঠিন নয়।

ফাইলে আলগা ভাবে চোখ বোলাল অনিন্দ্য। মাথা নেড়ে বলল, —বাট ইটস্‌ টাইম কনজিউমিং স্যার।

—টাইম দাও। খাটো। এই বয়সে সময় না দিলে কবে আর কাজ করবে?

—একদিনে হবে না স্যার।

—হবে না ইজ ও ডার্টি ওয়ার্ড মুখার্জি। বলতে নেই। প্লিজ গো অ্যান্ড ডু ইট। দরকার হলে লেট আওয়ার্স অব্দি থেকে করে দাও।

বি বি-র চেম্বার থেকে বেরিয়ে মেজাজ আরও বিগড়ে গেল অনিন্দ্যর। মতলবটা কী বি বি-র? জানে কাজটা এক দিনে করা সম্ভব নয়, তবু কেন এমন জোরাজুরি করছে? অনিন্দ্যকে ফাঁদে ফেলার ধান্দা? হিউমিলিয়েট করতে চায়? তাড়ানোর প্ল্যান ভাঁজছে নাকি? হাহ্‌, অনিন্দ্য সে সুযোগ দিলে তো! কী এমন মাইনে দেয় যে রাত দশটা এগারোটা অবধি কলুর বলদের মতো খাটবে সে? ছ বছরে অনিন্দ্য তিনটে চাকরি ছেড়েছে, তেমন হলে এই চার নম্বরটাকেও ছেঁড়া চটির মতো ফেলে দেবে। নয় বসে থাকবে দু চার মাস, তারপর একটা কিছু ঠিক জুটে যাবেই। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের এখনও তত বুভুক্ষুর দশা হয়নি, যে দাঁতে দাঁত চেপে এক চাকরিতেই পড়ে থাকতে হবে।

রাগটা মাথায় পুষে রেখেই টেবিলে এসে কাজে বসল অনিন্দ্য। দুই ড্রাফট্‌সম্যানকে সঙ্গে নিয়ে। ঘণ্টা পাঁচ ছয় খেটেখুটে একটা ওভারব্রিজের মোটামুটি নকশা বানিয়েও ফেলল। এখনও নিখুঁত হয়নি, ঘসামাজা দরকার। কিন্তু শরীর আর চলছে না, ঝিমঝিম করছে মাথা।

অসীমকে বলল, —আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল ফাস্ট আওয়ারে কমপ্লিট করে ফেলব। বেশিক্ষণ তো আর লাগবে না, কী বলেন?

অসীমের বয়স বছর চল্লিশ। সংসারী, সাবধানী মানুষ। সে নার্ভাস গলায় বলল, —কিন্তু বি বি যে আজকেই কাজটা...!

—সম্ভব নয়। আমি কি মেশিন?

সুজিতের বয়স কম। অনিন্দ্যরই সমবয়সী প্রায়। সে বলল,— আপনি তো বলছেন বাকি দুটোও সিমিলার হবে। আমরা কি প্রথমটা দেখে দেখে এগোব? যতটা পারি?

সুজিত কি বি বি-র লোক? অনিন্দ্যকে বাজিয়ে দেখছে? অনিন্দ্যর সেরকমই সন্দেহ হল। ধুর, হলেই বা কী এসে যায়? কেউ সামান্যতম বেগড়বাই করলে সে তো চাকরিটা ছেড়েই দেবে।

অনিন্দ্য শ্রাগ্‌ করল, —পারলে করুন। আমি কাল এসে চেক করে নেব। বি বি খোঁজ করলে বলবেন মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, চলে গেছে।

ঘড়ি ধরে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় পথে নেমে পড়ল অনিন্দ্য। কোথায় যাওয়া যায় এখন? বাড়ি? ভালো লাগছে না। সিনেমা দেখতে ঢুকবে? একা একা সিনেমা দেখার অভ্যেস আছে অনিন্দ্যর। সত্যি বলতে কি, অজস্র অচেনা মানুষের ভিড়ে ওই একা হয়ে থাকাটা বেশ উপভোগই করে সে। এ যেন আমি সবাইকে দেখছি, অথচ আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না এমনই একটা খেলা। ধুৎ, সিনেমায় যেতেও ইচ্ছে করছে না আজ। ভেতরে ভেতরে অন্য একটা টান অনুভব করছে অনিন্দ্য। নিশির ডাকের মতো। সদ্য চেনা এক মাদকের আহ্বান বেজে উঠছে রক্তে। কিন্তু কালই তো শরণ্যাকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল, আজ আবার ওখানে ঢুঁ মারাটা কি ভাল দেখাবে?

রাস্তায় চরকি খেতে খেতে অনিন্দ্য শেষ পর্যন্ত ঝেড়ে ফেলল দ্বিধাটা। সে যাবে তার শরণ্যার কাছে, এতে এত ভাবাভাবির কী আছে!

শরণ্যাদের বাড়ি মানিকতলা মোড়ের কাছেই। চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ি, নবেন্দুরা থাকেন তিনতলায়। অনিন্দ্য পৌঁছে দেখল নবেন্দু মহাশ্বেতা

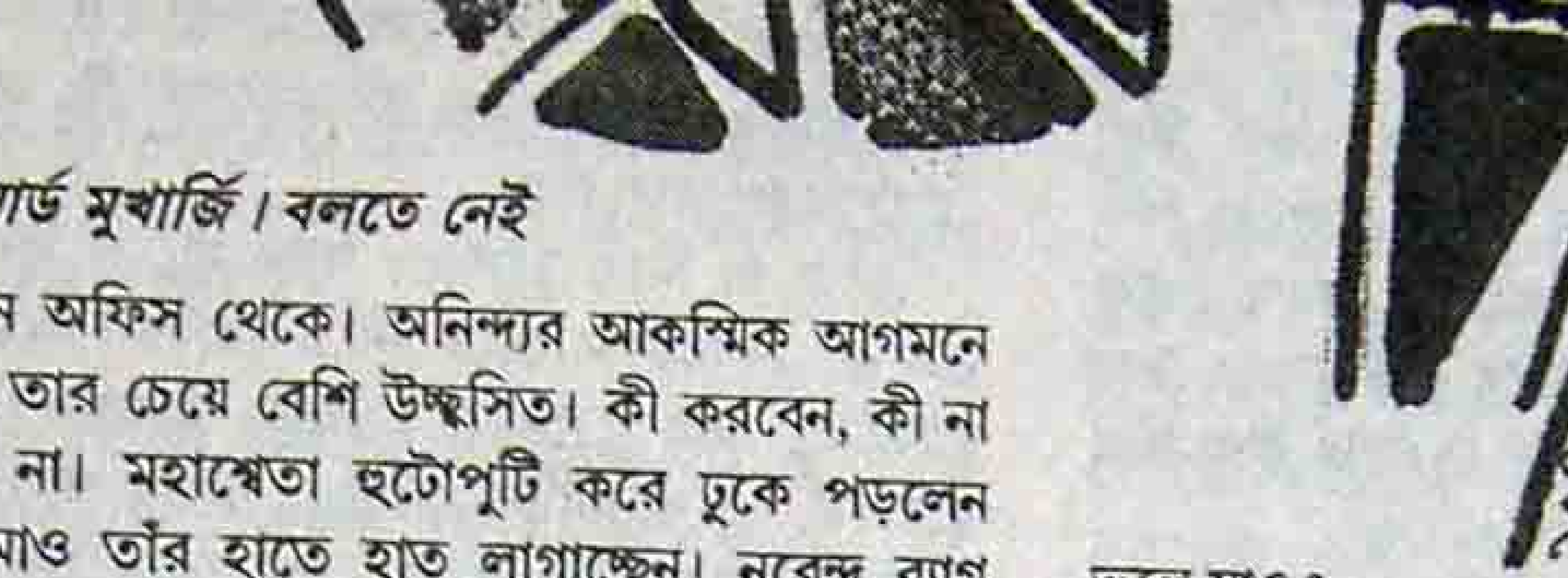

হবে না ইজ এ ডার্টি ওয়ার্ড মুখার্জি। বলতে নেই

দু'জনেই ফিরে এসেছেন অফিস থেকে। অনিন্দ্যর আকস্মিক আগমনে তাঁরা যতটা না বিস্মিত, তার চেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত। কী করবেন, কী না করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মহাশ্বেতা হুটোপুটি করে ঢুকে পড়লেন রান্নাঘরে, শরণ্যার ঠাকুমাও তাঁর হাতে হাত লাগাচ্ছেন। নবেন্দু ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে পড়লেন, আজ রাত্রে জামাইকে না খাইয়ে ছাড়ছেন না।

অনিন্দ্যকে ঘিরে নবেন্দু মহাশ্বেতার মাঝারি সাইজের ফ্ল্যাটখানা সহসা যেন খুশির ঝরনা।

শ্বশুরবাড়ির এই আন্তরিক আদর আপ্যায়ন অনিন্দ্যর বেশ লাগে। তার কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এখানে এলেই নিজেকে বেশ একটা কেউকেটা বলে মনে হয়। আবার একটু একটু অস্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করে কখনও কখনও। মাঝে মাঝেই মনে হয় তাকে এত খাতিরযত্ন করাটা কি স্বাভাবিক হতে পারে? নিশ্চয়ই কৃত্রিমতাটাকে সুচারু ভাবে গোপন করে রাখেন শরণ্যার বাবা মা! শরণ্যাকেও এ বাড়িতে কেমন অন্য রকম লাগে। ফার্ন রোডের বাড়ির শরণ্যার আর মানিকতলার বাড়ির শরণ্যায় যেন আকাশ-পাতাল তফাত। এখানে শরণ্যার হাঁটাচলা হাসি কথা সবই যেন ভিন্ন প্রকৃতির।

সেই শরণ্যা এখন মুখ টিপে টিপে হাসছে। অনিন্দ্য শরণ্যাকে দেখছিল। দু'জনে বসে আছে সেই ঘরখানায়, যেটা ক'দিন আগেও শরণ্যার বেডরুম ছিল।

ঠোঁটের হাসি চোখে এনে শরণ্যা বলল, —কী দেখছ? হাঁ করে?

—তোমায়। অনিন্দ্য গুমগুমে গলায় বলল, —দিব্যি মজাসে আছ। সারাদিনে একটা ফোন করারও সময় পেলে না?

—তোমার লাইন পাওয়া গেলে তো। দুপুরে অন্তত এক ঘণ্টা ট্রাই করেছি।

—বাজে কথা। ফার্ন রোড থেকে তো রোজ লাইন পাও, আর মানিকতলায় এসেই...! কী হয় তোমার, অ্যাঁ? এ বাড়িতে ঢুকেই আমায় ভুলে যাও?

শরণ্যা খিলখিল হেসে উঠল, —সেই ভেবে তুমি হালুম হুলুম করে চলে এলে?

হাসিটা অনিন্দ্যর মোটেই পছন্দ হল না। গোমড়া মুখে বলল, —না এলেই বুঝি খুশি হতে?

—ওমা, তাই বললাম নাকি? শরণ্যার হাসি আরও মদির, —আমারও তোমায় খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল। সত্যি। খুব মন কেমন করছিল।

—তাহলে চল। অনিন্দ্য ঝপ করে বলল, —আর এখানে থাকতে হবে না।

—ইঁউ?

—হুঁ নয়, হ্যাঁ। তুমি আজই আমার সঙ্গে ফিরবে। অ্যান্ড আই মিন ইট।

—যাহ্, তা হয় নাকি? শরণ্যা ফের হেসে ফেলল, —সবে কাল এলাম...

—তো? কাল এসেছ বলে আজ যাওয়া যায় না?

—এমা ছি। লোকে কী বলবে?

—আমি লোক ফোক কেয়ার করি না। তুমি রেডি হয়ে নাও।

এতক্ষণে থমকেছে শরণ্যা। স্থির চোখে অনিন্দ্যকে দেখতে দেখতে বলল, —হঠাৎ ছেলেমানুষি শুরু করলে কেন? বললেই যাওয়া যায় নাকি?

—কেন যায় না?

—বা রে, বাবা মার কাছে কটা দিন থাকব বলে এই প্রথম এলাম...

বাবা মা কী ভাববে? কষ্ট পাবে না?

অনিন্দ্য থমথমে মুখে বলল, —বাবা মা কষ্ট পাবে বলে তুমি যাবে না?

—আমারও খারাপ লাগবে। শরণ্যা গলাটা আদুরে আদুরে করল, —আমার বুঝি বাবা মার কাছে থাকতে ইচ্ছে করে না?

—যাবে না তাহলে? অনিন্দ্য ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছে, —থাকো তবে। যেভাবে খুশি। যদ্দিন খুশি।

—অ্যাই অ্যাই, কী হল? কোথায় চললে? বোসো।

—কেন বসব? কিসের জন্য বসব?

বলেই অনিন্দ্য গটমট করে ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসে। সোফায় বসে জুতো পরছে।

শরণ্যা দৌড়ে এসেছে পিছন পিছন। চাপা গলায় বলল, —কী সিন ক্রিয়েট করছ? তোমার জন্যে রান্নাবান্না হচ্ছে... কী ভাববে বল তো সবাই!

অনিন্দ্য দরজা খুলতে খুলতে বলল, —বলে দিও যা হোক কিছু। আমি তো তাদের কাছে আসিনি। আমি তোমার জন্য এসেছিলাম। তোমার কাছে। ও কে?

চার

সমিতির অফিসঘরে বসে ছোট্ট একটা মিটিং সেরে নিচ্ছিলেন নিবেদিতা। অর্চনার সঙ্গে। সম্প্রতি একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সুহাসিনী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মেয়েরা যে জ্যাম জেলি আচার বানায়, দু-চারটে খুচরো বিক্রি ছাড়া তার প্রায় সবটাই কিনে নেয় মাঝারি নামজাদা এক আচার কোম্পানি, নিজেদের লেবেল লাগিয়ে বেচে বাজারে। মাস তিনেক হল বেশ কিছু বিল বাকি পড়েছে, সুহাসিনীকে তারা ঠিকঠাক পেমেন্ট দিচ্ছে না।

অর্চনা বললেন,— এভাবে তো আর পারা যায় না নিবেদিতাদি। পর পর দুটো রিমাইন্ডার দিলাম, নো রেসপন্স। টেলিফোন করছি, বলছে বাজার ডাউন, একটু ধৈর্য ধরুন। কী করা যায় বলুন তো?

নিবেদিতার কপালে ভাঁজ,— কত ডিউ আছে?

—এক্‌জ্যাক্ট ফিগারটা দেখে বলতে হবে। তবু ধরুন...দিনে মোটামুটি একশো বোতল সাপ্লাই যায়... জ্যাম জেলি বোতল পিছু আড়াই টাকা, আচারে দুই, সসে দেড়... আমাদের তো জ্যাম জেলি বেশি...। অর্চনা মনে মনে হিসেব কষলেন,— উনিশ কুড়ি হাজার টাকা তো হবেই। অথচ প্রত্যেক উইকে ওদের পেমেন্ট দেওয়ার কথা ছিল ভাগ্যিস ওদের ফার্স্ট প্রোপোজালটায় রাজি হইনি।

—কাঁচা মাল কেনার ব্যাপারটা?

—হ্যাঁ। কাঁচা মাল আমরা কিনলে কী অবস্থাটা হত বলুন তো? সুহাসিনী লাটে উঠে যেত এতদিনে।

—হুম্। নিবেদিতাকে চিন্তিত দেখাল,— আমি একবার গিয়ে কথা বলে দেখব?

—তাহলে তো ভালই হয়। আপনি গিয়ে দাঁড়ালে তার একটা ওয়েটেজ আছে। আপনি যেভাবে জোরের সঙ্গে কথা বলেন...

—কথা অনেকেই জোরের সঙ্গে বলতে পারে অর্চনা। কিন্তু দেখা দরকার তাতে সুহাসিনীর কাজ হয়, না অকাজ হয়।

নিবেদিতা ইচ্ছে করেই অর্চনাকে ঠেস দিলেন একটু। ইদানীং দময়ন্তী পাইনকে বড় বেশি মাথায় তুলছে অর্চনারা। সেদিনের একটা মেয়ে, সবে বছর দুয়েক হল সুহাসিনীর সদস্য হয়েছে, এর মধ্যেই গলা ফুলিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে সমিতির মিটিং-এ। দময়ন্তীর কাজকর্মে উৎসাহ দেখে নিবেদিতা অবশ্য নিজেই তাকে নিয়ে এসেছিলেন এক্‌জিকিউটিভ বডিতে। সম্প্রতি দুটো বড় বড় সংস্থা থেকে মোটা ডোনেশানও জোগাড় করে এনেছে দময়ন্তী। অবশ্যই নিজের ক্ষমতায় নয়, বরের প্রতিপত্তির সুবাদে। প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক ধূর্জটি পাইনের নাম কে না জানে। কিন্তু টাকা আনছে বলে কর্মসমিতির সভায় উদ্ভট উদ্ভট প্রস্তাব রাখার অধিকার জন্মে যাবে? গত মিটিং-এ কী অবলীলায় বলে দিল, সেলাই টেলাই তুলে ওঘরে কম্পিউটার বসিয়ে দিন! এখন কম্পিউটারের যুগ, মেয়েগুলো চড়চড় করে ওপরে উঠে যাবে! তা কম্পিউটার কেনা হোক না, নিবেদিতার তাতে কিসের আপত্তি! তা বলে সেলাই ডিপার্টমেন্ট তুলে দেওয়ার মতো অবাস্তব কথা বলে কোন বুদ্ধিতে? পোশাক আশাক বানিয়ে মেয়েগুলো দুটো পয়সা রোজগার করে, সুহাসিনীর ফান্ডেও যৎসামান্য আসে, তার জায়গায় কম্পিউটার কোন্ সুরাহাটা করবে? আশ্চর্য, অমন একটা হাস্যকর কথা শুনেও অর্চনারা কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করল না! এত কেন তেল মারবে দময়ন্তীকে?

অর্চনা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। নিবেদিতার ইঙ্গিত বুঝেছেন। খানিকটা তোষামোদের সুরে বললেন,— আপনার সঙ্গে কার তুলনা নিবেদিতাদি? আপনি আছেন বলেই না সুহাসিনী আছে।

—তা কেন, আমি না থাকলেও সুহাসিনী থাকবে। নিবেদিতা ঈষৎ অপ্রসন্ন গলায় বললেন,— তুমি তো জান, কীভাবে শুরু হয়েছিল সুহাসিনী। মাত্র ছ'জন মেম্বার ছিলাম আমরা। বাবা প্রেসিডেন্ট, সঙ্গে আমি ঝটিকাদি বাসন্তী শুভ্রা আর আমার ছোটপিসি। আমি ছাড়া বাকিরা এখন কোথায়? ঝটিকাদি তো মারাই গেলেন। ছোটপিসির কথাও বাদ দাও, তার আর শরীর চলে না। কিন্তু শুভ্রা আর বাসন্তী? শুভ্রা তাও চাঁদাটা নিয়মিত দেয়, অ্যানুয়াল মিটিংটাও অ্যাটেন্ড করে, বাসন্তী তো সুহাসিনীর রাস্তা ভুলেই গেছে। সুহাসিনী কি তাই বলে থমকে গেছে? এখন সুহাসিনীর বিরাশি জন মেম্বার। আমি না থাকলেও এতগুলো সদস্য তো থাকবে।

অর্চনা কথা বাড়ালেন না। চুপ করে আছেন।

—হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। নিবেদিতা প্রসঙ্গে ফিরলেন, —সে আমি নয় পায়োনিয়ার ফুড প্রোডাক্টসে যাব একবার, ওদের সেনগুপ্তর সঙ্গে কথাও বলব। তবে সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাবনাও তো করে রাখা ভাল।

—কীরকম?

—আমরা গোল্ডেন ফুড প্রোডাক্টসের সঙ্গে কনট্যাক্ট করতে পারি। গোল্ডেন তো আগে আমাদের মাল পছন্দই করেছিল। রেট একটু কম ছিল, এই যা। তা ওরা যদি ক্যাশ টার্মে রাজী থাকে... নেইমামার চেয়ে তো কানামামা ভাল।

—কিন্তু নিবেদিতাদি... অর্চনা গলা ঝাড়লেন, —ব্যাপারটা তো আগে কমিটি মিটিং-এ পাস করাতে হবে।

—আহা, তুমি আগে যোগাযোগটা তো করো। ওভার ফোন কথা বলে দ্যাখো ওরা এখনও ইন্টারেস্টেড কি না। তারপর নয় ফরমাল প্রোপোজাল আনা যাবে।

রেখা চা নিয়ে ঢুকেছে। বছর ষাটেক বয়স, বেঁটেখাটো থপথপে চেহারা। যে চারজন মেয়ে নিয়ে সুহাসিনী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি শুরু হয়েছিল, রেখা তাদেরই একজন। বর্ধমানের কোন গ্রামে যেন বিয়ে হয়েছিল, বর সাংঘাতিক পেটাত, বাপের বাড়িও ফিরিয়ে নিতে চাইছিল না, সুহাসিনীতে ঠাঁই পেয়ে রেখা বেঁচে গিয়েছিল। সুখের না হোক, স্বস্তির নীড় তো বটে। তা সেই নীড়ে পঁয়ত্রিশ বছর বাস করতে করতে রেখা এখন নীড়েরই অংশ বনে গেছে। দারুন আচার বানায়, ফার্স্ট ক্লাস বড়ি দিতে পারে, সেলাইফোঁড়াই-এর হাতও মন্দ নয়। ইদানীং রান্নাঘরের দায়িত্বে আছে। সুহাসিনীতে এখন আশ্রিতের সংখ্যা তিয়াত্তর, এতগুলো মেয়ের খাওয়া দাওয়ার ঝক্কিটা রেখাই সামলায়। পুরনো বাসিন্দা বলে নিবেদিতার সঙ্গে এক ধরনের সখ্যও আছে রেখার।

দু কাপ চা টেবিলে রেখে একগাল হেসে রেখা বলল, —তোমার বউমার তো দেখি খুব উৎসাহ নিবিদি। ঘুরে ঘুরে সকলের কাজ দেখে বেড়াচ্ছে। এই বাটিকের ঘরে ঢুকছে, এই বেতের কাজ... কৃষ্ণাকে বলছিল, আমায় একটু জ্যাম জেলি তৈরি শিখিয়ে দেবেন?

শরণ্যার কথা এতক্ষণ মাথাতেই ছিল না নিবেদিতার। মেয়েটা আজ এসেছে তাঁর সঙ্গে। আগেও এসেছিল একদিন। সুহাসিনীর কাজকর্ম দেখে শরণ্যা বেশ অনুপ্রাণিতই হচ্ছে মনে হয়। ভাল। তেমন হলে শরণ্যাই তাঁর উত্তরসূরি হতে পারবে। আজ এখান থেকে শরণ্যাকে নিয়ে নিবেদিতা শোভাবাজার যাবেন একবার। কাকিমার শরীর খারাপ, অনিন্দ্যর বিয়েতে আসতে পারেননি, বার বার বউ দেখতে চাইছেন। নিবেদিতারও গিয়ে বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা বুঝে আসা দরকার। আজ এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে।

মৃদু হেসে নিবেদিতা বললেন, —আমার বউমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে রেখা?

—পছন্দ কী গো, সোনার টুকরো মেয়ে। কী মিষ্টি ব্যবহার, আহা।

রেখা মাথা দোলাচ্ছে, —তোমার বাড়ি তো আলো হয়ে গেছে নিবিদি।

অর্চনা হাসতে হাসতে বললেন, —কিন্তু তুমি যে সুহাসিনীকে অন্ধকার করে দিচ্ছ গো!

—কেন?

—একটু আগে কী বাঁধাকপি রাঁধছিলে, দুর্গন্ধে তো ওয়াক উঠে আসার জোগাড়।

—জগন্নাথ বাঁধাকপি আনছে কেন? রেখা ঝনঝন করে উঠল, —এই সময়ের বাঁধাকপি থেকে কি গোলাপের বাস বেরোবে? গরুতেও এখন আর কপি খায় না।

রেখা এভাবেই কথা বলে। দাপটের সঙ্গে। নিবেদিতা হেসে বললেন, —বুঝেছি। জগন্নাথকে একটু বকে দিতে হবে।... যাও, এবার আমার বউমাকে ডেকে দাও। বেরোব।

রেখা চলে যাওয়ার পর অর্চনার সঙ্গে বসে আরও কয়েকটা টুকটাক দরকারি কাজ সেরে নিলেন নিবেদিতা। মার্চ মাস পড়ে গেল, সরকারি অ্যালটমেন্টের টাকা এখনও এসে পৌঁছল না। প্রতি বছরই দেরি করে, এবার যেন একটু বেশি বিলম্ব করছে। শুক্রবারের মিটিং-এ ফান্ড থেকে কিছু টাকা তোলার প্রস্তাব রাখতে বললেন অর্চনাকে। দারোয়ান, টাইপিস্ট, একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট কাম ক্লার্ক, দু'জন সেলাই দিদিমণি, আড়দার টাড়দার, মিলিয়ে সুহাসিনীতে জনা বারো কর্মচারী, তাদের মাইনের চেক সই করলেন। মাস ছয়েক হল বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পে গভর্নমেন্ট কিছু টাকা দিয়েছে, সন্ধেবেলা সুহাসিনীতে ক্লাসও হচ্ছে নিয়মিত, দশ বারো জন গরীবঘরের স্থানীয় বউঝি আসছে পড়তে, তাদের নিয়েও আলোচনা হল খানিক।

তার মধ্যেই শরণ্যা উপস্থিত। নিবেদিতার পাশে বসতে বসতে বলল, —কী অসাধারণ একটা কাঁথাস্টিচের কাজ করছে মামণি! আমার তো চোখের পলক পড়ছিল না!

নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন,—কে করছে? দীপ্তি?

—ওর নাম দীপ্তি বুঝি? ফর্সা মতন? ভীষণ রোগা?

—হ্যাঁ। দীপ্তির সুন্দর আর্টিস্টিক সেন্স আছে। চমৎকার আলপনাও দেয়। নিজেই মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন ড্রয়িং করে শাড়িতে। ওর তৈরি শাড়ির ভাল ডিমান্ড।

—ইস, কী ব্যাড লাক, না? এত গুণী হয়েও এখানে পড়ে আছে।

অর্চনা বললেন,—না শরণ্যা। ও যে দশায় ছিল তার তুলনায় সুহাসিনী তো স্বর্গ। তুমি জান ওর হিস্ট্রি?

—না তো। কী?

—শী ইজ আ রেপ ভিক্টিম। প্রেমিক আর তার দুই বন্ধু মিলে মেয়েটাকে ধর্ষণ করেছিল। কোর্টে অবশ্য তাদের সেন্টেন্স হয়, কিন্তু দীপ্তির বাবা মা আর মেয়েকে ফেরত নিতে রাজি হয়নি। দীপ্তি থাকলে তার বোনদের না কি বিয়ে হবে না। শি ওয়াজ সেন্ট হিয়ার বাই দি সোশাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।

শরণ্যা শিউরে উঠল,—ও মা, কী সাংঘাতিক!

নিবেদিতার মুখে বিষণ্ণ হাসি,—সুহাসিনীর কোনও মেয়েরই পাস্ট খুব মধুর নয় শরণ্যা। এদের সঙ্গে মিশলে বুঝতে পারবে পৃথিবীটাকে তুমি যতটা খারাপ কল্পনা করতে পারো, পৃথিবী তার চেয়ে অনেক বেশি কুৎসিত।

অর্চনা বললেন,—থাক নিবেদিতাদি, মেয়েটাকে আর ভয় দেখাবেন না। নতুন বিয়ে, এখন একটা স্বপ্নের জগতে আছে...

খুব স্বপ্নের জগতে আছে কি? অনিন্দ্য যা অবুঝ! এর মধ্যেই তো বোধহয় একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসেছিল। ক'টা দিন বাপের বাড়ি থাকবে বলে গেল মেয়েটা, একদিন পরেই বাপ মা এসে পৌঁছে দিয়ে গেল মেয়েকে। নবেন্দু শরণ্যার মুখ দেখে মনে হল তারা বেশ ক্ষুব্ধ। অনিন্দ্য কি মানিকতায় গিয়ে ঝামেলা পাকিয়ে এসেছিল? হতেই পারে। যা উদ্ধত! শরণ্যারও মুখে ক'দিন হাসি ছিল না। ভেতরের ব্যাপার জানার উপায় নেই। শরণ্যাকে জিজ্ঞেস করেও সদুত্তর পাননি নিবেদিতা। আর অনিন্দ্য? তাকে কে প্রশ্ন করতে যাবে। হয়তো মুখের ওপর বলে দেবে, নিজের চরকায় তেল দাও!

নিবেদিতা শরণ্যাকে বললেন,—তুমি তাহলে বসে অর্চনামাসির সঙ্গে গল্প করো, আমি চট করে একটা চক্কর দিয়ে আসি।

সুহাসিনীতে এসে প্রতিদিন একটা করে রাউন্ড মারা নিবেদিতার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। প্রত্যেকটি ঘরে উঁকি দেবেন এখন, মেয়েদের সঙ্গে দুটো চারটে কথা বলবেন। সুহাসিনী তো এখন আর ছোট নেই, সময় লাগবে।

সুহাসিনীর পুরনো বাড়িটায় একতলা দোতলা মিলিয়ে দশখানা ঘর। প্রথম প্রথম বাড়িটা খাঁ খাঁ করত, এখন আর একটা বাড়িতে কুলোয় না, পিছনের ফাঁকা জমিটায় সরকারি অনুদান আর এদিক ওদিক থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে আরও একটা দোতলা বাড়ি বানানো হয়েছে। দু বাড়িরই একতলায় কর্মযজ্ঞ চলে, দোতলায় মেয়েদের বাস।

নিবেদিতা ভেতরের হল মতন জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেন ক্ষণকাল। সুহাসিনীর বার্ষিক মিটিং-টিটিংগুলো এখানেই হয়। ছোট্ট স্টেজ মতোও করা আছে। মাঝে মাঝে গানবাজনা নাটক-টাটক করে মেয়েরা। আশ্রিত বলে জীবনটা একেবারে শুকনো কাটবে, এ নিবেদিতার অভিপ্রেত নয়।

স্টেজের পিছনেই দেওয়ালে পাশাপাশি দুখানা ফোটো। নিবেদিতার বাবা সোমশংকর মুখার্জি, আর ঠাকুমা করুণা। স্যুটটাই পরা সোমশংকরের মুখে টুকরো হাসি ঝুলছে, আটপৌরে ঢঙে শাড়ি পরা করুণার চোখে আলগা বিষাদের প্রলেপ।

একজন প্রতিষ্ঠাতা। অন্যজন প্রেরণা।

করুণার মনে সারাজীবন একটা ক্ষত ছিল, তাঁর মা সুহাসিনীকে নিয়ে। সুহাসিনীর জীবনটা ছিল ভারি কষ্টের। করুণার বাবার দুই বিয়ে, সুহাসিনী তাঁর প্রথম পক্ষ। কাকবন্ধ্যা সুহাসিনী স্বামীকে পুত্র উপহার দিতে পারেননি বলে কাঁটা হয়ে থাকতেন সবসময়ে, শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তবু তিনি সেখানে টিঁকতে পারেননি শেষপর্যন্ত। একদিন এক অতি তুচ্ছ কারণে সুহাসিনীকে ত্যাগ করেছিলেন তাঁর স্বামী। ত্যাগ নয়, গলাধাক্কা। এক বস্ত্রে রাতারাতি স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়েছিল সুহাসিনীকে। তো অপরাধটা কী? না মেয়ের ধুম জ্বর, এক্ষুনি ডাক্তারবদ্যি না করলেই নয়, আর্জিটা জানাতে সুহাসিনী মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়েছিলেন স্বামীর বৈঠকখানার আড্ডায়, এবং তখন তাঁর মাথায় ঘোমটা ছিল না! ব্যস, ওই অজুহাতেই পত্রপাঠ নির্বাসন। বাপের বাড়িতেও জীবনের বাকি দিনগুলো আশ্রিতের মতো কেটেছিল সুহাসিনীর। একটাই সৌভাগ্য, বেশিদিন বাঁচেননি তিনি। করুণার বিয়ের পর পরই সুহাসিনী গত হন। যক্ষ্মায়। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে।

সুহাসিনীর গল্প বলতে গিয়ে শেষ বয়সেও চোখে জল এসে যেত করুণার। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি সবাইকে তিনি বলতেন, মেয়েমানুষের জীবন বড় কষ্টের রে। নেহাত আমার কপাল ভাল, দেখতে শুনতে মন্দ ছিলাম না, তাই এমন ঘর-বর জুটে গেছে। নইলে আমারও যে কী গতি হত কে জানে! সংসারে দুঃখী মেয়েদের কথা পারলে একটু ভাব তোরা। ভগবানের দয়ায় তোদের তো অনেক আছে, তাদের জন্য কিছু অন্তত কর।

মাতৃভক্ত সোমশংকরকে নাড়া দিত আর্তিটা। গেঁথে গিয়েছিল নিবেদিতার হৃদয়েও। করুণা যখন মারা যান, নিবেদিতা তখন এম-এ পড়ছেন। দুঃস্থ মেয়েদের জন্য কোনও একটা প্রতিষ্ঠান গড়ার চিন্তা তখন থেকেই তাঁর মনে দানা বাঁধে।

সুযোগও এসে গেল। আকস্মিক ভাবে। সোমশংকরের এক মক্কেল ঘরবাড়ি বেচে দিয়ে পাকাপাকি ভাবে দিল্লি চলে যাচ্ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে প্রায় জলের দরে হাজরা রোডের বাড়িটা কিনে নিলেন সোমশংকর। প্রতিষ্ঠিত হল সুহাসিনী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

করুণা মারা যাওয়ার ঠিক ছাব্বিশ মাস পর। করুণার জন্মদিনের দিন।

পঁয়ত্রিশটা বছর কেটে গেল তার পরে, নিবেদিতার এখনও মনে হয় এই তো সেদিন!

দেখতে দেখতে সুহাসিনীও আজ অনেক বড় হয়েছে। কীভাবে যে নিবেদিতা তিলে তিলে গড়েছেন সুহাসিনীকে। সোমশংকর ছিলেন হাইকোর্টের নামী ব্যারিস্টার, ইচ্ছে থাকলেও তাঁর সময় কোথায়, প্রথম থেকেই তাই কাজকর্মের মুখ্য দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন নিবেদিতা। কোনও দিকে তাকাননি, অষ্টপ্রহর শুধু সুহাসিনী সুহাসিনী সুহাসিনী। নিরাশ্রয় মেয়েদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করা, কাজ চলা গোছের লেখাপড়া শেখানো, পাশে পাশে নানান ধরনের হাতের কাজের ট্রেনিং, ঘুরে ঘুরে সমিতির জন্য অর্থসংগ্রহ, গভর্নমেন্টের কাছে গ্রান্টের

জন্য দরবার— এক নিবেদিতাই তখন একশো নিবেদিতা। সকাল থেকে রাত চরকি খাচ্ছেন। মাঝে বিয়ে হল, ছেলেপুলে হল, তবু কোনওদিন সুহাসিনীর কাছে ঢিল দেননি। আমার কাছে বাচ্চা রেখে চলে এসেছেন হাজরা রোডে, ছেলেদের অসুখ বিসুখেও কাজে ভাটা পড়েনি।

সুহাসিনী নিবেদিতার বেঁচে থাকার অক্সিজেন। সুহাসিনী ছাড়া নিবেদিতার আর আছেটা কী?

অফিসঘরে ফিরে নিবেদিতা দেখলেন মঞ্জুলিকা আর জয়শ্রী এসেছেন। সুহাসিনীর সদস্যদের অনেকেই প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ঘরের মহিলা, হাতের কাজকর্ম সেরে রোজই এরকম কেউ না কেউ হাজিরা দেন দুপুরের দিকে। কাজ-টাজ দেখেন, গল্পগাছা হয়, সুহাসিনীতে বানানো জিনিসপত্রের জন্য খদ্দেরও আনেন মাঝেমধ্যে। মিছিমিছি অলস সময় না কাটিয়ে সমাজের জন্য কিছু অন্তত করার চেষ্টা করেন এঁরা। সুহাসিনীর মতো প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাশ্রম কারুর কারুর সামাজিক মর্যাদাও বাড়ায়।

মঞ্জুলিকাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে শরণ্যাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নিবেদিতা। আকাশে অল্প অল্প মেঘ। সূর্য আর মেঘে লুকোচুরি চলছে। ফাল্গুনের রোদ্দুর চড়া নয় তেমন, বাতাসেও বেশ মিঠে মিঠে ভাব। তবু একটা গুমোটও আছে। সম্ভবত ওই মেঘের জন্যই।

শম্বুক গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে সুরেন। কলকাতায় ইদানীং গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে খুব, দুপুরবেলাতেও যত্রতত্র যানজট। নিবেদিতা ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলেন। দক্ষিণ থেকে উত্তরে পৌঁছতে কত সময় লাগবে কে জানে!

হঠাৎ শরণ্যা বলল,—মামণি, আপনারা শুনলাম বৃদ্ধাশ্রম করছেন?

নিবেদিতা ফিরে তাকালেন,—কে বলল? মঞ্জুলিকা?

—অর্চনামাসি বলছিলেন। জমিও নাকি দেখা হয়ে গেছে? বেহালায়?

—প্রপার বেহালা নয়, এক্সটেন্ডেড বেহালা। শীলপাড়া চেনো? শীলপাড়া ক্রস করে। জোকা আর শীলপাড়ার মাঝামাঝি।

—কবে শুরু হবে?

—দাঁড়াও, জমিটা আগে হাতে আসুক।...তবে ওল্ডহোমটা স্টার্ট করার একটা টার্গেট ডেট রেখেছি। সামনের বছরের পরের বছর ইন্টারন্যাশনাল বৃদ্ধদিবসে হোম ওপেন করে দেব। এর মধ্যে যে করে হোক কাজ শেষ করতেই হবে।

—তার মানে আপনার খুব পরিশ্রম যাবে?

—পরিশ্রম না করলে কি ফল পাওয়া যায় শরণ্যা? অমানুষিক খাটুনি খাটতে হবে। অনেক টাকার ব্যাপার। সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ তিরিশ লাখ টাকার প্রোজেক্ট। জমিতেই তো প্রায় ছ'লাখ পড়বে। তারপর ফান্ড রেজ করা, আর্কিটেক্টদের ধরে একটা সুন্দর প্ল্যান বানানো, এখানে ছোটাছুটি, ওখানে ছোটাছুটি, রেগুলার দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে বাড়ি তৈরির তদারকি...

—গভর্নমেন্ট টাকা দেবে না?

—কিছু দেবে। তবে মেজর পোরশান বাইরে থেকেই তুলতে হবে।

—কিন্তু মামণি, এত ধকল আপনি নিতে পারবেন? এদিকে তো আপনার সুহাসিনীও আছে, সেখানেও তো সময় দিতে হবে।

আপনার সুহাসিনী শব্দবন্ধটা নিবেদিতাকে ভারী তৃপ্তি দেয়। মনে হয় পঁয়ত্রিশ বছরের শ্রম সার্থক। প্রীত মুখে বললেন, —পারতেই হবে। গরিব মেয়েদের নিয়ে কিছু কাজ তো করলাম, এবার মিডলক্লাসদের কথাও একটু ভাবি। মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে বাবা মাকে শেষ বয়সে যে কী দুর্দশায় পড়তে হয়। তোমার বাবা কাকারা নয় তোমার ঠাকুমাকে মাথায় করে রেখেছেন, কিন্তু বেশিরভাগ বাড়িতেই তো...

বলতে বলতে নিবেদিতা থমকে গেলেন। শরণ্যার পরিবারের উল্লেখ শরণ্যাকে আহত করল না তো? প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, —তোমার সেই রিসার্চে জয়েন করার কী হল?

—স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে না। বাইরে গেছেন। নেক্সট্ উইকে ফিরবেন।

—ও। ডক্টরেটের পর তোমার কী করার ইচ্ছে?

—দেখি। এখনও কিছু ভাবিনি সেভাবে।

—ও।

নিবেদিতা আর কথা খুঁজে পেলেন না। একবার ভাবলেন অনিন্দ্যর কথা তুলবেন কি না। পারলেন না। বাধল। শরণ্যার সঙ্গে আর্যরও বেশ ভাব হয়েছে। একমাত্র শরণ্যার সঙ্গেই বাক্যালাপ চলে আর্যর, লক্ষ করেছেন নিবেদিতা। পরশু কী নিয়ে যেন আলোচনাও হচ্ছিল দুজনের, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ে কানে এসেছিল। পড়াশুনো নিয়ে কথা হচ্ছিল কি? কিন্তু দুজনের সাবজেক্ট তো এক নয়। একজন প্রাচীন ইতিহাস, অন্যজন অর্থনীতি। জিজ্ঞেস করবেন শরণ্যাকে? থাক। আর্য কী বলেন, কী ভাবেন তা নিয়ে কবেই বা মাথা ঘামিয়েছেন নিবেদিতা!

শোভাবাজার পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। এক বৃদ্ধ দোতলা বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে থামল সুরেন।

নামতে নামতে শরণ্যা বলল,—বাহ্, দারুণ তো। এরকম পুরনো আমলের বাড়ি আমার ভীষণ ভাল লাগে।

নিবেদিতা বললেন,—বাড়িটাকে দেখতে যত থুরথুরে লাগে, তত বুড়ো কিন্তু নয়। লেট থারটিজে তৈরি। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার লাগার আগের বছরে। আমার ঠাকুরদা বানিয়েছিলেন। বাগবাজারের পৈতৃক ভিটে ছেড়ে এসে। মেনটেনেন্স নেই তো, তাই এই হাল। দ্যাখো, কার্নিশে বটগাছ গজিয়ে গেছে। আমার বাবা এই বাড়িতেই বড় হয়েছেন।

বাড়িটার একতলা অস্বাভাবিক রকমের ঠাণ্ডা। শীত শীত করে। চওড়া খানিকটা প্যাসেজের পরে ডানদিকে সিঁড়ি উঠে গেছে। ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে একতলায়। প্রেস চলছে।

দোতলায় উঠতে উঠতে শরণ্যা জিজ্ঞেস করল,—আপনাদের বাগবাজারের বাড়িটার এখন কী অবস্থা?

—ভেঙেচুরে গেছে, তবে আছে এখনও। সে তো প্রায় রাজপ্রাসাদের মতো। পাঁচ পুরুষের বনেদি বাড়ি, অজস্র শরিক, এখনও মানুষে গিজগিজ করে। তোমার বউভাতের দিন তো সবাই এসেছিল, দ্যাখোনি?

কথা আর এগোল না। সিঁড়ির মুখে স্বরূপা। নিবেদিতারই সমবয়সী। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। মুখে বয়সের ছাপ পড়লেও দেখে বোঝা যায় যৌবনে বহু তরুণের হৃদয় বিদীর্ণ করেছেন।

স্বরূপার মুখে ছদ্ম কোপ,—এতদিনে তাহলে তোমাদের আসার সময় হল?

নিবেদিতা হেসে বললেন,—সত্যি, কিছুতেই আর সময় হচ্ছিল না। জানই তো কীভাবে ফেঁসে থাকি।

—আমাকে বলে কী হবে, মাকে গিয়ে বোঝাও।

শরণ্যা প্রণাম করল স্বরূপাকে,—ভাল আছেন তো মামিমা?

—থাক থাক। সুখে থাকো। স্বরূপা শরণ্যার চিবুক ছুঁলেন, —তোমার মাসি... কণার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল। কণা বলছিল তোমার বাবা মা নাকি এখনও তোমার শোকে মুহ্যমান। দুঃখ ভুলতে তাঁরা নাকি কেদারবদরি বেড়াতে যাচ্ছেন!

শরণ্যা হাসি হাসি মুখে বলল,—এখন তো নয়, যাবে সেই মে মাসে। বাবার এখন তো জোর ইয়ারএন্ডিং চলবে। সেই এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

শরণ্যা কথা বলছে স্বরূপার সঙ্গে। নিবেদিতা সামনে বড় ঘরটায় ঢুকলেন। ঘর জুড়ে সাবেকি আসবাব। মাঝখানে পাতা পালঙ্কে আধশোওয়া হয়ে আছেন শেফালি, পরনে ধবধবে সাদা থান। আশি ছুঁই ছুঁই শেফালির, চুল আর কাপড় দুটোই এক রঙের।

নিবেদিতাকে দেখেই শেফালি হাউমাউ করে উঠলেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে শান্ত করলেন নিবেদিতা। বউ দেখালেন।

সুন্দর একটা আনন্দের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। চলছে কথার পরে কথা। নিবেদিতার খুড়তুতো দাদা জ্যোতিশংকরও উঠে এসেছেন ঘুম থেকে, যোগ দিয়েছেন আড্ডায়। জ্যোতিশংকর আর স্বরূপার ছেলেমেয়ে দুজনেই কলকাতার বাইরে থাকে, স্বরূপা তাদের ছবি দেখালেন শরণ্যাকে, শেফালি শোনালেন তাঁর তিন মেয়ের নাতিনাতনির গল্প।

বাড়ি বিক্রির প্রসঙ্গে আসার জন্য নিবেদিতা ছটফট করছিলেন। স্বরূপা জলখাবারের আয়োজন করতে চলে যাওয়ার পর পাড়লেন কথাটা। বললেন, —তাহলে সইসাবুদগুলো কবে হচ্ছে সোনাদা?

জ্যোতিশংকর এতক্ষণ হালকা মুডে ছিলেন, হঠাৎই টান টান চিন্তিত মুখে বললেন, —সবই তো রেডি হয়ে গিয়েছিল রে খুকু।

এদিকে যে আবার একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

—সে কী? কী হল?

—মিনু তো এখন কানাডা থেকে আসতে পারবে না। সে তো এখন মন্ট্রিলে আরও মাস ছয়েক আটকে গেল।

মিনু মানে নিবেদিতার বড়পিসির মেজ মেয়ে। শোভাবাজারের এই বাড়িই এখন চার তরফের। সোমশঙ্কররা দুই ভাই, দুই বোন। বড়পিসি মারা গেছেন, তাঁর উত্তরাধিকারী এখন তাঁর তিন মেয়ে। এক মেয়ের সই বাকি থাকলেও এ বাড়ি এখন বেচা যাবে না, নিবেদিতা জানেন। বউ-এর বাচ্চা হবে বলে মিনুকে তার বড় ছেলে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রেখেছে এখন।

নিবেদিতা ভুরু কুঁচকে বললেন, —এ তো ভারী অন্যায় কথা। মিনু তাহলে কাউকে একটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দিক।

—সে তো দিয়েই গেছে। নইলে আমি লাখোটিয়ার সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করলাম কী করে। কিন্তু বিক্রির সময়ে সকলকেই তো প্রেজেন্ট থাকতে হবে।

—তার মানে আরও ছ মাস পিছোলো?

—কী আর করা। অ্যাদ্দিন যখন ধৈর্য ধরলাম...

নিবেদিতা তেতো হাসলেন, —তোমার তো ধৈর্য ধরতে অসুবিধে নেই সোনাদা। বাড়ি ছ মাস পরে বেচলেও যা, বিশ বছর পরে বেচলেও তাই। লস যা হওয়ার তা তো আমাদেরই।

কথার অন্তর্নিহিত অর্থটা ধরতে পেরেছেন জ্যোতিশংকর। তিনি এ বাড়ির পুরো দোতলাটা জুড়ে আছেন, প্রোমোটার নিলে তিনি পাবেন একটি ফ্ল্যাট, বাকিরা নগদ টাকা। কোনও দিনই এ বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে তাই জ্যোতিশঙ্করের তেমন চাড় ছিল না। নিবেদিতার ইঙ্গিতটা সেদিকেও।

ঈষৎ ম্রিয়মান গলায় জ্যোতিশঙ্কর বললেন, —দ্যাখ খুকু, চার ভাগের বাড়ি আমি একা ভোগ করছি ঠিকই, তবে দেখভালও তো করছি। এই তো একতলার সিলিং-এর চাঙর ভেঙে পড়ছিল, পুরো সারাতে হল...

—কিন্তু খরচা কি তোমার নিজের পকেট থেকে করতে হয়েছে সোনাদা? নিবেদিতা বলব না বলব না করে বলেই ফেললেন, —প্রেস থেকে যে ভাড়াটা পাও, আমরা তো কোনও দিন তার ভাগ চাইনি। আমিও না, মিনু চিনুরাও না, ছোটপিসিরাও না। কী, ঠিক বলছি?

শেফালি হঠাৎ বলে উঠলেন, —সে আর কত পায় রে খুকু? প্রেস তো বসেছে সেই তোর কাকার সময় থেকে। তখনকার দুশো টাকা ভাড়া এখন বেড়ে বেড়ে সাড়ে চারশো। ওই টাকা তো বাড়ির ট্যাক্সেই বেরিয়ে যায়।

—কিন্তু কাকিমা, ভাড়াটের জন্যই তো দামটা কমে গেছে। পাঁচ কাঠা তিন ছটাক সাতাশ স্কোয়্যার ফিট জমি, বাড়ি বাদ দিয়ে শুধু জমিরই তো এখানে বিশ লাখ টাকা দাম হওয়া উচিত ছিল।

জ্যোতিশঙ্কর বললেন, —সেটা অবশ্য ঠিক। ওই হারামজাদাদের জন্যই তো দাম পুরোপুরি তোলা গেল না।

নিবেদিতা মনে মনে বললেন, জ্ঞানপাপী। লাখোটিয়া সাকুল্যে দাম দিয়েছে উনিশ লাখ, নিবেদিতার ভাগে পাঁচ লাখও পুরো জুটবে না। এদিকে সোনাদা নিজেদের জন্য একটি হাজার স্কোয়্যার ফিট ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ক্যাশ নেবে না বটে, তবে এই এলাকায় ওই ফ্ল্যাটের দাম দশ লাখের বেশি বই কম হবে কি? মুখে যাই বলুক, ক্ষীরটা সোনাদা একাই খেল।

শোভাবাজারের বাড়ি থেকে বেরোনর পরও ভেতরটা বিস্বাদ হয়ে রইল নিবেদিতার। টাকাটা এখন হাতে আসা খুব জরুরি ছিল। আর্য তো শুধু সংসারের কাঁচা বাজারের খরচটুকু টানেন, আর ইলেকট্রিক টেলিফোনের বিলটা। বাকি সবই তো নিবেদিতার কাঁধে। বাড়িতে কাজের লোক আছে, ড্রাইভার আছে, গাড়ির তেল আছে, মাসকাবারি, এটা সেটা...। নিজের হাতখরচও তো আছে কিছু। এর মধ্যে বাড়িভাড়া থেকে আসে মাত্র চার হাজার, বেশির ভাগটা বাবার রেখে যাওয়া অর্থের সুদেই চলে। তা সেই সঞ্চয়েও তো কবেই হাত পড়ে গেছে। সুরেন বলছিল মেকানিক নাকি সাফসাফ জানিয়ে দিয়েছে গাড়ি টিপটপ করতে গেলে অন্তত তিরিশ হাজার পড়বে। তার চেয়ে নাকি নতুন কিনে নেওয়া বেশি লাভজনক। একটা নতুন গাড়ির ইচ্ছে তো নিবেদিতারও আছে, কিন্তু সেও তো প্রায় আড়াই লাখের ধাক্কা। ছ মাসের মধ্যে গাড়ি যদি পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়ে, তাহলেই তো চিত্তির। ডল্টে কিছু শেয়ারের কাগজ রাখা আছে, ছেড়ে দেবেন এখন? বাজার এখন খুব ডাল, ভাল দামও তো পাবেন না। নাহ্, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার খালি করাটা উচিত হবে না। কখন কী বিপদ আসে কেউ বলতে পারে!

গাড়ি পার্ক ষ্ট্রিট পেরিয়ে গেছে। বাইরে শেষ বিকেলের মলিন আলো। নিবেদিতা সিটে মাথা রেখে বসে আছেন চোখ বুজে। হিসেব কষছেন। হিসেব মেলাচ্ছেন।

শরণ্যা পাশ থেকে ডাকল, —মামণি?

উঁ?

—শরীর খারাপ লাগছে?

—না তো।

—কী ভাবছেন এত?

—কিছু না। নিবেদিতা সোজা হলেন। ঠোঁটে আবছা হাসি ফুটিয়ে বললেন, —বৃদ্ধাশ্রমের চিন্তাটাই ঘুরছে মাথায়। কী ভাবে যে কী করব...!

পাঁচ

পার্থসারথি বললেন, —কাজের নেচারটা বুঝতে পারছ তো? খুব সহজ নয়। খাটতে হবে।

শরণ্যা মাথা নাড়ল, —হ্যাঁ, স্যার। এতগুলো সেনসাস রিপোর্ট স্টাডি করা। বেছে বেছে একটা বিশেষ ইনকাম গ্রুপের মধ্যে মেয়েদের এডুকেশান কতটা ছড়িয়েছে তা সর্ট আউট করা... তাও শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল বা ইন্ডিয়ার নয়, সব কটা সার্ক কান্ট্রির... এ তো স্যার হিমালয়ান টাস্ক।

—উঁহু, আরও আছে। প্রোজেক্টের উদ্দেশ্যটা ভুলো না। ফিমেল লিটারেসি কী ভাবে পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করছে তা স্টাডি করাই আমাদের গোল। কাজটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। করবে?

শরণ্যা সামান্য চিন্তায় পড়ে গেল। সে আজ স্যারের কাছে এসেছিল গবেষণার বিষয় ঠিক করতে। এখনও রেজিস্ট্রেশান হয়নি বটে, কিন্তু অল্প অল্প করে কাজ তো শুরু করে দেওয়াই যায়। তবে স্যার আজ রিসার্চের টপিক নিয়ে মোটেই আগ্রহী নন। চেতনা নামের এক সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে পার্থসারথির, বলা যেতে পারে বকলমে তিনিই চেতনার কর্ণধার। চেতনা বেশ কয়েকটা প্রকল্প তৈরি করে পাঠিয়েছিল বিভিন্ন জায়গায়, সম্প্রতি তার মধ্যে একটি ইউনেস্কোর অনুমোদন পেয়েছে। পার্থসারথির ইচ্ছে তাঁর কৃতী ছাত্রী শরণ্যা এই প্রোজেক্টে যোগ দিক। বিনা পয়সায় খাটাবেন না, মাসে হাজার আষ্টেক করে দেবেন। প্রস্তাবটা লোভনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু টাকা নিলে খানিকটা বাধ্যবাধকতাও এসে যাবে না? চাকরি করার মতো?

একটু ইতস্তত করে শরণ্যা বলল, —কিন্তু স্যার ...রিসার্চের কাজটাও শুরু করব ভেবেছিলাম...

পার্থসারথি কাঁধ ঝাঁকালেন, —রিসার্চের সঙ্গে প্রোজেক্টের তো কোনও বিরোধ নেই। দুটোই পাশাপাশি চলতে পারে। ইনফ্যাক্ট, দিস উইল হেলপ ইউ ইন রিসার্চ। প্রথমত, তুমি এই কাজটা করতে গিয়ে প্রচুর মেটিরিয়াল পাবে। যা থেকে তোমার বেশ কয়েকটা পেপার হয়ে যাবে। সেকেন্ডলি, প্রোজেক্টেরই কোনও একটা এরিয়াকে ডিটেলে হাইলাইট করে ইউ ক্যান গো ফর ইওর থিসিস। আমি তো সেই লাইনেই ভেবেছি। আগে কয়েকটা পেপার পাবলিশড হয়ে থাকলে তোমার থিসিসও স্পেশাল ওয়েটেজ পাবে।

—হুঁ, তা অবশ্য ঠিক। শরণ্যা স্বীকার করতে বাধ্য হল, —প্রোজেক্টটা কতদিন চলবে স্যার?

—সে কি এক্ষুনি বলা যায়? আপাতত এইট্টিন মান্থসের একটা ডেটলাইন দেওয়া আছে। তবে প্রোজেক্ট যদি সুষ্ঠুভাবে এগোয়, টাইম মে বি এক্সটেন্ডেড। আপাপতত আমি দুজন প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে কাজ শুরু করব। পরে রেট অফ প্রোগ্রেস দেখে নাম্বারটা বাড়াতেও পারি। তবে মনে রেখো, কাজটা কিন্তু শুধু বই ঘেঁটেঘেঁটে হবে না। উই নিড সাম ফার্স্টহ্যান্ড ইনফরমেশান। তৃতীয় বিশ্বের স্যাম্পল সিটি

হিসেবে কলকাতা খুব আইডিয়াল। এখানকার কারেন্ট ডাটা প্রোজেক্টটাকে এনরিচ করবে।

—বাড়ি বাড়ি ঘুরে ডাটা কালেকশান করতে হবে স্যার?

—পারলে তো খুবই ভাল। ...অন্য আর কী ভাবে ডাটা জোগাড় হবে তা তোমরা নিজেরাও ডিসাইড করে নিতে পারো।

শরণ্যা স্যারের কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারল না। স্যার নিশ্চয়ই ডাটা ম্যানুফ্যাকচার করার কথা বলছেন না? প্রফেসার পার্থসারথি বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উজ্জ্বল অধ্যাপক। শরণ্যাদের ম্যাক্রো ইকনমিকসের ক্লাস নিতেন তিনি। দারুণ ফান্ডা, পড়াতেনও চমৎকার। রিসার্চ গাইড হিসেবেও পার্থসারথির যথেষ্ট খ্যাতি আছে, প্রায় বছরেই তাঁর হাত থেকে একটা দুটো পি এইচ ডি বেরোয়। অর্থাৎ শরণ্যাদের ভাষায় হাইলি ফারটাইল। তবে ছাত্রছাত্রী মহলে একটা চাপা গুঞ্জনও আছে পার্থসারথিকে নিয়ে। দুধে জল মিশিয়ে যেমন করে হোক গবেষণার কাজ শেষ করিয়ে দেন রিসার্চ স্কলারদের। ছাত্রছাত্রীরা অবশ্য এ নিয়ে বেশি উচ্চবাচ্য করে না। দেশে বিদেশে পার্থসারথির দারুণ কানেকশানও আছে যে।

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট বুঝে নিতে চাইল শরণ্যা। জিজ্ঞেস করল, —মানে?

—কাজ চলতে চলতে বুঝে যাবে। পার্থসারথিও খেলোয়াড় লোক, ঝেড়ে কাশছেন না। বছর পঞ্চান্নর ক্ষুদে চেহারার মানুষটি চশমা খুলে কাচ মুছছেন। ফের চশমা পরে নিয়ে মুচকি হাসলেন, —আরে, প্রোজেক্টটা তো তুমি একা করছ না। আওয়ার টিম উইল রান ইট। তোমার সঙ্গে আর একজন তো থাকছেই। সে খুবই চালাক চতুর।

—কে স্যার? শরণ্যা কৌতূহলী হল, —আমাদের ব্যাচের কেউ?

—তোমাদের আগের ব্যাচ। শুভ্র। চেনা নিশ্চয়ই?

শরণ্যা সামান্য হোঁচট খেয়ে গেল। শুভ্রকে সে ভাল মতোই চেনে। মহা ফোক্কোড় ছেলে। কারণে অকারণে মেয়েদের টিপ্পনী কাটত। শর্মিষ্ঠার নাম দিয়েছিল বিষ্ঠা, এমন অসভ্য। দেবলীনাকে লাইন করার চেষ্টা করেছিল খুব, ভালমানুষের মতো মুখটি করে ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসে এসে বসে থাকত প্রায়ই। প্রেমটা অবশ্য পাকাতে পারেনি, এম-এ পড়তে পড়তেই দেবলীনা ঝুলে গেল এক আই-পি-এসের গলায়। তারপরও খুচখাচ ছক চালাত এদিক ওদিক। ওই লক্কড়টার সঙ্গে কাজ করা কি শরণ্যার পোষাবে? লেখাপড়ায় অবশ্য ভালই ছিল ছেলেটা, মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য মিস্ করেছিল ফার্স্ট ক্লাস।

পার্থসারথি ভুরু কুঁচকোলেন, —এত কী ভাবছ? তোমার কি অন্য কোনও প্রবলেম আছে? আই মিন... শ্বশুরবাড়ি...?

—না না, সেরকম কিছু নেই স্যার। শরণ্যা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, —ওঁরা খুবই ওপেন মাইন্ডেড। ইনফ্যাক্ট, ওঁরাই বলছেন এখনও আমি কাজকর্ম শুরু করছি না কেন!

—তবে আর কী, জয়েন করে যাও। কাল...। না, কাল তো হবে না, কাল আমার আবার একটা পি-এইচ-ডি-র সেমিনার আছে। পরশুও বিজি থাকব। তুমি বরং সোমবার চলে এসো চেতনার অফিসে। বাই দা বাই, চেনো তো অফিসটা? মনোহরপুকুরে। দেশপ্রিয় পার্কের পেছনে। বাইরে বোর্ড আছে।

—চিনে নেব স্যার। আমার শ্বশুরবাড়ির কাছেই তো।

—ওয়েল। সোমবারই তবে তোমায় গাইডলাইন দিয়ে দেব। শুভ্রও থাকবে, কথাও বলে নিতে পারবে দু'জনে। ফার্স্ট আওয়ারেই চলে এসো।

চোরা একটা উত্তেজনা নিয়ে পার্থসারথির ঘর থেকে বেরিয়ে এল শরণ্যা। করিডোর ধরে হাঁটছিল অলস পায়ে। ডিপার্টমেন্টের ক্যাম্পাসটা এখনও একই রকম আছে। এখানে ওখানে জটলা, কলরব, হিহি হাসি, হাহা হাসি। পিন পড়লে শোনা যায় এমন ক্লাসে গমগমে স্বরে পড়াচ্ছেন ডি-এন স্যার, ক্লাসরুমটা পেরিয়ে চলে আসার পরও শোনা যাচ্ছে গলা। ওপাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটায় ফুল এসেছে, নিষ্পত্র ডালপালা যেন সেজেছে লাল গয়নায়। শেষ ফাল্গুনে হাওয়া বইছে এলোমেলো। সব মিলিয়ে কেমন একটা মন কেমন করা অনুভূতি ছড়িয়ে যাচ্ছিল শরণ্যার বুকে। একেই কি নস্টালজিয়া বলে?

বেশ গরম পড়েছে আজ। দুটো বাজে, মধ্যাহ্নের সূর্য যেন ঝলসে দিচ্ছে চামড়া। রঙিন ছাতাখানা মাথায় ধরে সিঁথির বাস স্টপটায় এসে দাঁড়াল শরণ্যা। গড়িয়াহাট যেতে পাক্কা সওয়া ঘন্টা লাগবে বাসে, একটা ট্যাক্সি করে নিলে কেমন হয়? অনিন্দ্য শ দুয়েক টাকা দিয়ে গেছে, উড়িয়ে দেবে? অনিন্দ্যর টাকাও তো নিজেরই টাকা ভাবা উচিত, তবু যে কেন বাধো বাধো ঠেকে? মাকে কখনও বাবার কাছে হাত পাততে দেখেনি বলেই কি? আট হাজার টাকাটা কম নয়, হাত খরচ চালিয়েও দিব্যি কিছু সঞ্চয় করা যাবে। পছন্দসই কেনাকাটার জন্য অনিন্দ্যর কাছে বায়না জুড়তে হবে না।

দুপুরের বাসে ভিড় নেই তেমন। উঠেই শরণ্যা বসার জায়গা পেয়ে গেল। টিকিট কাটতে গিয়ে থমকাল একটু। ফার্ন রোড ফিরে কী হবে এখন? দুপুরবেলা ওই বাড়িটা তো ভূতের বাড়ি হয়ে থাকে। নির্জন। নিঝুম। শাশুড়ি তো থাকেনই না, শ্বশুরমশাই থেকেও নেই, নীলাচল আড্ডা মারতে বেরিয়ে যায়, কিম্বা ঘুমোয় ভোঁস ভোঁস। আর সুনন্দ আছে কি নেই বোঝে কার সাধ্যি! থাকলেই বা কী, সে কি শরণ্যার সঙ্গে গল্প করবে? শরণ্যা বেশ কয়েক বার গায়ে পড়ে কথা বলার চেষ্টা করে দেখেছে, সেভাবে আমলই দেয় না সুনন্দ। এমন একটা বাড়িতে দুপুরবেলাটা যে কী অসহ্য! মনে হয় বিশাল দোতলাটা যেন গিলে খেতে আসছে। একা একা হেঁটেচলে বেড়াতেও কেমন গা ছমছম করে। তখন হয় একটু টিভি চালাও, নয় শুয়ে শুয়ে বই পড়ো, কিম্বা একে তাকে ফোন করে জ্বালাও। এর জন্য এখন তেতেপুড়ে ফার্ন রোড ছুটবে শরণ্যা? মানিকতলায় নেমে পড়লেই তো হয়। মা বাবা নেই, ঠাম্মা তো আছে।

অন্নপূর্ণা শুয়েছিলেন। দরজা খুলে নাতনিকে দেখে থতমত, —ওমা, তুই? হঠাৎ? এখন? শরণ্যা তরল গলায় বলল, —কেন, আসতে নেই?

—না, তা নয়... কিন্তু... ফোন-টোন করলি না, দুম করে ভরদুপুরে...?

হায় রে, কী অবস্থা তৈরি করেছে অনিন্দ্য! ও বাড়ির সবাই কাঁটা হয়ে থাকে এখন। বাপের বাড়িতে শরণ্যার রাত্রিবাস তো ঘুচেই গেছে, দিনের বেলা এলেও এখন আগে থেকে জানিয়ে আসতে হয়। বাবা মা মুখে বলে, ফোন করে এলে আমরা কেউ না কেউ বাড়িতে থেকে যেতে পারি। কিন্তু সেটাই কি আসল কারণ? শরণ্যা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে?

জোর করে হাসল শরণ্যা, —বেশ করেছি এসেছি। ইচ্ছে হয়েছে এসেছি। ঝটপট কিছু খেতে দাও তো, পেট জ্বলে যাচ্ছে।

—সেকি? এত বেলায় এলি... খেয়ে বেরোসনি?

—উঁহু।

—কেন রে? ঝগড়া করে চলে আসিসনি তো?

—কার সঙ্গে ঝগড়া করব? বরের সঙ্গে? শরণ্যা এবার সত্যি সত্যি হেসে ফেলল। ঠাম্মার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, —না রে বাবা, না। এত নার্ভাস হচ্ছ কেন? গিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটিতে। স্যারের সঙ্গে দেখা করতে। খিদে ছিল না বলে ভাত খাইনি। আমার শ্বশুরবাড়িতে যা হেভি ব্রেকফাস্ট হয়।

—তাই বল্। এতক্ষণে অন্নপূর্ণার মুখে অনাবিল হাসি, —তা বড়লোকদের বাড়ি কী জলখাবার হয় রে?

—জলখাবার নয় ঠাম্মা, বলো ব্রেকফাস্ট। আজ হ্যামস্যান্ডুইচ তো কাল চিকেন স্যান্ডুইচ। বাটারটোস্ট হলে সঙ্গে পোচ ওমলেট কিংবা সসেজ কিংবা সালামি। টিনফিশও থাকে মাঝে মাঝে। আর ফ্রুটস তো আছেই। কলা আপেল ব্যাগারা ব্যাগারা।

—ওমা, এ তো একেবারে সাহেববাড়ির খানা রে।

সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়েছে শরণ্যা। কাঁধের দোপাট্টা ছুঁড়ে দিল টেবিলে। পা দোলাতে দোলাতে বলল, —ব্রেকফাস্টটাই যা সাহেবি। লাঞ্চ ডিনার পাতি ইন্ডিয়ান।

—মানে?

—দুপুরবেলা ভাত, সঙ্গে ট্যালটেলে ডাল, জল একদিকে গড়ায়, ডাল একদিকে প্যাটপ্যাট তাকিয়ে থাকে, একটা ঘ্যাট মতো তরকারি আর পাতলা পাতলা কাটাপোনার ঝোল। রাত্তিরে ঘাসের মতো ব্রয়লার মুরগি, আর সীতাদির বিকেলে সেঁকে দিয়ে যাওয়া রুটি। বিশ্বাস করবে না, চার মাসে এক দিনের জন্যও ওই মেনুর বদল হয়নি। নট্ ইভন্ ইন ছুটির দিন।

—বলিস কী? রোজ এক খাবার খাওয়া যায় নাকি?

—খায় তো দেখি সব। মুখ বুজেই খায়। কারুর তো কোনও হিলদোল দেখি না। সীতাদির রান্নাও যে কী যাচ্ছেতাই তুমি কল্পনাও

পারবে না। মুখে তুলে থু থু করে ফেলে দেবে।

—আহা রে। বলিস নি তো আগে?

—বলিনি। রোজই ভাবতাম কাল বোধহয় মেনু বদলাবে।

—তোর তো তাহলে খুব কষ্ট হয়!

—চলতা হ্যায়। শরণ্যা হাত উলটাল,—এটাও একটা লাইফ ঠাম্মা।

অন্নপূর্ণা তবু যেন সান্ত্বনা পেলেন না। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন খুব। মোটাসোটা দেহটা নিয়ে আজকাল হাঁটাচলা করতে বেশ কষ্ট হয়, তবু নাতনির খাওয়ার আয়োজন করতে থপথপ ছুটে বেড়াচ্ছেন এদিক ওদিক। একবার রান্নাঘরে ঢুকছেন, একবার ফ্রিজ খুলছেন। শরণ্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, —অ্যাই বুবলি, ভাত দিই একটু?

—আছে?

—গরম করতে হবে।

—সঙ্গে কী দেবে?

অন্নপূর্ণা অপ্রস্তুত মুখে তাকালেন, —ভাত ডাল তরকারি মাছের ঝোল...

—কী মাছ?

অন্নপূর্ণা যেন আরও সংকুচিত, —আজ অন্য মাছ নেই রে। কাটা পোনা।

শরণ্যার পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল। হাসির দমকে ফুলে ফুলে উঠছে। একেই কি বলে টকের ভয়ে পালিয়ে এলাম, তেঁতুলতলায় বাস?

অন্নপূর্ণা ম্রিয়মাণ মুখে বললেন, —তুই যদি সকালেও একটা ফোন করে দিতিস...! অন্য কিছু বানিয়ে দেব? ডিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে পাঁউরুটি... তুই তো খেতে ভালবাসিস।

—কিছু লাগবে না। জো হ্যায় ওহি চলেগা। শরণ্যা টুসকি বাজাল, —তুমি সরে এসো, আমি ভাত গরম করে নিচ্ছি।

প্রোজেক্টটা তো তুমি একা করছ না

শরণ্যার সম্মতিটুকু পেয়ে অন্নপূর্ণার জোশ বেড়েছে যেন। কর্তৃত্বের সুরে বললেন, —বোস তো। এখনও আমি অত অথর্ব হইনি। খেতে দিতে দিতে পারি। ততক্ষণ তুই বরং নবু আর বউমার সঙ্গে ফোনে কথা বলে নে। এখানে এসে খাওয়া দাওয়া করছিস শুনলে ওরা খুব খুশি হবে।

—ধুস্, কী হবে ফোন করে? তুমিই বলে দিও। বোলো ইউনিভার্সিটি যেতে ফেরার পথে...

—যদি তাও গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে?

—তাহলে বোলো লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম। তোমার আদর খেতে।

অন্নপূর্ণা পুলকে গলে গেলেন। দুলে দুলে চলে গেলেন রান্নাঘরে। একটার পর একটা বাটি গরম করে এনে রাখছেন টেবিলে। থালা সাজাচ্ছেন, গ্লাস বসালেন, জল ভরলেন গ্লাসে।

শরণ্যা একদৃষ্টে ঠাম্মাকে দেখছিল। বুকটা চিনচিন করছে হঠাৎ। ছোট্ট বুবলি স্কুল থেকে ফিরলে এভাবেই খাবার সাজিয়ে দিত ঠাম্মা। কী অপরূপ এক আলোয় ভরে থাকত ঠাম্মার মুখ। আলো? না মায়া? আলোটা আছে এখনও, শুধু বুবলিটাই হারিয়ে গেল।

তুৎ, কী হবে মিছিমিছি মন ভার করে? মানুষ কি চিরকাল এক জায়গায় স্থির থাকে? বিয়ের মতো কিছু একটা হলে বদল তো ঘটবেই।

খাবার টেবিলে এসে শরণ্যা হাঁ। একটা কোথায়, তিন তিনটে সবজি! সর্ষে পটল, আলু ভেণ্ডি, পুঁই কুমড়ো বেগুনের চচ্চড়ি।

টাগরায় একটা শব্দ করে শরণ্যা বলল, —এত?

—আহা, কী এমন আছে! খা তো।

শরণ্যা আর কথা বাড়াল না। হড়াস করে ডাল ঢালল পাতে, খাচ্ছে হাপুস হাপুস। সত্যি জব্বর খিদে পেয়েছিল।

নাতনিকে নিয়ে অন্নপূর্ণার ভাবনা এখনও যায়নি। পাশের চেয়ারটিতে বসে প্রশ্ন জুড়লেন, — হ্যাঁ রে বুবলি, এই যে তোদের

রোজ একঘেয়ে রান্না হয়, তোর শাশুড়ি তাতে কিছু বলেন না? সে তো একটু দেখতে টেখতে পারে।

আলগোছে এক ঢোক জল খেয়ে শরণ্যা বলল, —শাশুড়ির সময় কোথায়? তিনি কত ব্যস্ত মানুষ। এখন তো আবার একটা বৃদ্ধাশ্রম গড়া নিয়ে ছোটাছুটি করছেন।

—তা করুক না। দেশের দশের কাজ করছে, পুণ্যি হচ্ছে। তাই বলে মেয়েমানুষের কি ঘরসংসার অবহেলা করলে চলে? শত কাজের মধ্যেও ফুরসত করে নিতে হয়।

—ওঁর পক্ষে সম্ভব নয় ঠাম্মা। ওঁর যে কত কাজ। তাছাড়া উনি একেবারে অন্য রকম। ওঁর স্ফিয়ারটাই আলাদা। সংসার টংসার নিয়ে উনি কোনও কালেই মাথা ঘামাননি। এখন নীলাচলের হাতে লাগাম, আগে হয়তো কোনও জগন্নাথের হাতে ছিল। ওদের পরিবারটাই ভৃত্যতান্ত্রিক ঠাম্মা।

—কী জানি বাপু, বাইরের কাজ করলে কি সংসার দেখা যায় না? তোর মাকে তো দেখিস, কী ভাবে হাঁচোর পাঁচোর করে ফিরে আসে অফিস থেকে। ওরে, মেয়েমানুষ বেশি বারমুখো হলে সংসার ভেসে যায়, বাড়ির লোকদের পাতে রোজ কাটাপোনাই জোটে।

ঠাম্মার কথাটা পুরোপুরি মানতে পারল না শরণ্যা। মেয়েদেরই সংসার দেখতে হবে, না দেখলে সংসার উচ্ছন্নে গেল, আদ্যিকালের এই সংস্কারটা এখনও কেন মেনে চলতে হবে? ছেলেরা সংসারের দেখভাল করলেই বা কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়?

নিবেদিতার ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা একটু আলাদা। তাঁর একটু গৃহিণীপনা থাকলে বোধহয় ভালই হত। অনিন্দ্যর মনে তাহলে হয়তো এত ক্ষোভ জমত না। সুনন্দও যে এত উড়ুউড়ু, বাড়ির কারুর ওপর সুনন্দর কণামাত্র টান নেই, এর মূলেও হয়তো ওই নিবেদিতাই। দায়িত্ব পালন করতে না পারা আর দায়িত্ব ত্যাগ করা কি একই জিনিস? তবে হ্যাঁ, মহৎ কাজে যাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করেন, তাঁদের বোধহয় এটুকু ছাড় পাওয়াই উচিত। সবাই তো আর দেবেন ঠাকুর নন যে, ঈশ্বর আর জমিদারি একই দক্ষতায় সামলাবেন!

মুখে আর কিছু বলল না শরণ্যা। খেয়ে উঠে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়েছে একটু। ঘরটা এখনও একই রকম আছে। সিঙ্গলবেড খাট, ছোট আলমারি, চেয়ার টেবিল, স্টিলের বুকর‍্যাক, টেবিলল্যাম্প, কিছুই স্থানচ্যুত হয়নি। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে আমজাদ আলির প্রোগ্রাম শুনতে গিয়েছিল রবীন্দ্রসদনে। সঙ্গতে ছিলেন জাকির হুসেন, সরোদ তবলার যুগলবন্দিতে মোহিত হয়ে গিয়েছিল শরণ্যা। পরদিনই খুঁজে খুঁজে দুজনের পোস্টার কিনে এনেছিল। এখনও ধ্যানমগ্ন আমজাদ আর উচ্ছল জাকির হুসেন সাঁটা আছেন দেওয়ালে। বিছানাতেও এখনও সেই বুবলি বুবলি গন্ধ। তবু যে আজকাল ঘরটাকে কেন অচেনা অচেনা লাগে! সত্যি, মেয়েদের জীবন এক ধাক্কায় কোত্থেকে যে কোথায় চলে যায়!

অন্নপূর্ণা গুটিগুটি পায়ে ঢুকেছেন ঘরে, হাতে ভাজা মৌরির কৌটো। নাতনির হাতে মৌরি ঢালতে ঢালতে বললেন, —তা শাশুড়ি নয় কাজের লোক, তুই কী করিস?

শরণ্যা হেসে ফেলল। ঠাম্মা আজ একা পেয়েছে তাকে, কৌতূহলে পেট ফুলছে। এখন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বুবলির শ্বশুরবাড়ির সব কথা টেনে বের করবে!

হাসতে হাসতে শরণ্যা বলল,—কী করার কথা বলছ?

—শাশুড়ি যখন দেখেই না, সংসারটাকে তুই তো কনট্রোলে নিয়ে নিতে পারিস। টিভি দেখে দেখে তো কী সব রান্না শিখেছিলি, সেগুলো কর। দেখবি দুদিনে শ্বশুরবাড়িতে তোর নাম ফেটে পড়বে।

—ওটি হওয়ার জো নেই ঠাম্মা। বললাম যে, ভৃত্যতান্ত্রিক পরিবার। জোর করে দুদিন রান্নাঘরে ঢুকেছিলাম, ওমনি দেখি নীলাচলের মুখ তোলো হাঁড়ি।

—বুঝেছি। সে যা পাচ্ছে লুটেপুটে নিচ্ছে।

—উপায় নেই। মেনে নিতেই হবে। অনিন্দ্যও চায় না আমি রান্নাঘরে গিয়ে হাত পোড়াই।

অন্নপূর্ণা চুপ মেরে গেলেন। বুঝি নাতজামাই-এর নাম শুনেই সন্ত্রস্ত। তারপর ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বললেন,—তা হলে তোকে সারাজীবন কাটাপোনা আর ব্রয়লার খেয়েই কাটাতে হবে? এ তো দেখি বালবিধবারও বাড়া দশা রে!

বিচিত্র উপমায় হি হি হাসছে শরণ্যা। কৌটো থেকে এক খাবলা মৌরি তুলে নিয়ে বলল,—না গো বাবা, না। অলটারনেট ব্যবস্থা আছে।

—কী রকম? কী রকম?

—সে এক বিটকেল সিস্টেম। যার যা খেতে ইচ্ছে করবে, কিনে এনে টেবিলে বসে যাও। কেউ কাউকে অফারও করবে না, কেউ কারুর প্লেটের দিকে তাকাবেও না। হাসিও পায়, বিচ্ছিরিও লাগে। এই তো কবে যেন ...শ্বশুরমশাই মুড়ি-সিঙাড়া খাচ্ছেন, ছোটছেলে বিরিয়ানির প্লেট নিয়ে পাশে বসে গেল, তার পরেই মোমো হাতে শাশুড়ি। কেউ কারুর প্লেটের দিকেও টেরিয়েও দেখছিল না।

—তোকেও কেউ দিল না একটু?

—বললাম যে, ও বাড়িতে অফার করার রেওয়াজ নেই। অনিন্দ্যও আনে। আমরা ঘরে বসে খাই।

—আশ্চর্য! এমন তো জন্মে শুনিনি!

—বেশি বনেদি বাড়িতে এরকমই হয়। না চাইতেই শরণ্যার গলায় শ্লেষ ফুটে গেল,—তোমরাই তো দেখেশুনে ও বাড়িতে দিয়েছ আমায়!

—তোর সুরটা যেন কেমন কেমন? তোর কি শ্বশুরবাড়ি ভাল লাগছে না?

—তা তো বলিনি। বলছি, ও বাড়িতে সবাই যে যার মতো থাকে। আমিও আছি। আমার মতো করে।

অন্নপূর্ণা কেন যেন থমকে গেলেন। কপাল কুঁচকে ভাবছেন কিছু।

শরণ্যা বলল,—কী হল? কোয়েশ্চেনিয়ার শেষ?

অন্নপূর্ণা ফোঁস করে আর একটা শ্বাস ফেললেন,—তোর বাবা মা ঠিকই বলে। অত বড়লোকের ঘরে বিয়ে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হয়নি।

—ওফ ঠাম্মা, আমি আগেও বলেছি ওরা আর তেমন বড়লোক নেই। এখন আর তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। যা ছিল, সবই তো শাশুড়ির বাবার সম্পত্তি। সেই কলসি থেকে গড়িয়েই এখনও ঠাটবাট বজায় রাখার চেষ্টা চলছে।

—কেন, তোর শ্বশুরের কিছু নেই?

—কী থাকবে, তিনি তো নেহাতই চাকরি বাকরি করা মানুষ। মাইনে টাইনে ভালই পেতেন, পেনশানটাও মনে হয় মন্দ পান না। রিটায়ারমেন্টের সময়ে হয়তো কিছু টাকাও পেয়ে থাকতে পারেন। সে আর কত বলো?

—হুম। অন্নপূর্ণা ঝুপ করে প্রসঙ্গে পাল্টে ফেললেন,—তা তোর শ্বশুরমশাই এখন তোর সঙ্গে কথা-টথা বলে? নাকি সারাক্ষণ বই মুখে করেই বসে থাকে?

—তিনি তো কারুর সঙ্গেই কথা বলেন না ঠাম্মা। তাঁর পৃথিবীটাই তো আলাদা। শরণ্যা সামান্য উদাস যেন,—তবে হ্যাঁ, উনি যেন ইচ্ছে করেই একটা খোলসে ঢুকে থাকেন। আমি তো আজকাল টুকটাক ওঁর ঘরে ঢুকে যাই। টেবিল ফেবিল গুছিয়ে দিই, বইপত্র সাজিয়ে রাখি...বেশ খুশিই হন মনে হয়। একবার উসকে দিলে কথাও বলেন বেশ। কদিন আগেই তো ইতিহাস নিয়ে ওঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা হল।

—তাই নাকি? বাহ্, ভাল ভাল। শ্বশুরের একটু সেবাযত্ন কর। এভাবেই দেখবি শ্বশুরবাড়ির লোকরা সব তোর আপন হয়ে গেছে।

—আবার ওই কথা? বললাম যে, আমার শ্বশুরবাড়িতে কেউ কাউকে আপন করতে চায় না! স্বামী-স্ত্রী ছেলে বাবা মা সবাই যে যার মতো মুক্ত। স্বাধীন। কেউ কারুর হাওয়াটি পর্যন্ত গায়ে লাগতে দেয় না। আমার শ্বশুরমশাই আর শাশুড়িতে মাসে একটা কথা হয় কি না সন্দেহ। খাবারটেবিলে ছেলে নুনের জায়গা এগিয়ে দিলে মা বলে থ্যাংকস। ওরা খুব এটিকেটদুরস্ত ঠাম্মা। বড্ড বেশি ফরমাল।

অন্নপূর্ণা কী বুঝলেন কে জানে, ঠোঁট উল্‌টে বললেন—যাক গে যাক, যে যেমনই হোক, ও বাড়িতে আসল জায়গা তো তোর বর। সে তো বাবা তোকে চোখে হারায়!

এবার আর কথার পিঠে কথা নেই শরণ্যার। চুপ করে আছে। অনিন্দ্য কি সত্যিই তাকে চোখে হারায়? নাকি অক্টোপাশের মতো আঁকড়ে থাকে? এক একসময়ে বড় চাপের মতো মনে হয় বেষ্টনটাকে। অনিন্দ্য ছাড়া সন্ধেবেলা এক পা বেরন যাবে না, অনিন্দ্য ঘরে থাকলে বাবা মার সঙ্গে বেশিক্ষণ টেলিফোনে কথা বলাও চলবে না, অনিন্দ্য ছাড়া শরণ্যার একটাও বন্ধু থাকবে না, এগুলো কি একটু বাড়াবাড়ি নয়!

শরণ্যা যে এক রাত্তিরের জন্যও এখানে এসে থাকতে পারে না, এও তো এক ধরনের আগ্রাসন।

অবশ্য এত রকম গোঁয়ার্তুমি, অবুঝপনা সত্ত্বেও অনিন্দ্যকে বেশ ভালইবেসে ফেলেছে শরণ্যা। ভালবাসা বলবে? নাকি সহানুভূতি? অনিন্দ্যর মধ্যে এখনও একটা শিশু যেন ঘাপটি মেরে আছে, শিশুটা ভীষণ ভাবে ভালবাসার কাঙাল। ছোটবেলায় বাবা-মার কাছ থেকে তেমন আদরযত্ন পায়নি অনিন্দ্য, তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের জগতে, হয়তো বা সেই জন্যেই। বাবার চেয়েও মার ওপর অনিন্দ্যর রাগটা বেশি। ক্রোধের মুহূর্তে মাতৃস্নেহ না পাওয়ার আর্তিটাই যেন অনিন্দ্যর চোখে ঝলসে ওঠে।

নিবেদিতা একটু সময় করে সঙ্গটুকু তো দিতে পারতেন ছেলেদের।

অন্নপূর্ণা ঠেলছেন নাতনিকে,—কী রে, বরের নাম শুনে বাক্যি হরে গেল যে? লজ্জা পেলি নাকি? নাতজামাই তোকে চোখে হারায় না? বল্?

—সে আর বলতে। শরণ্যা আলগা হাসল,—চোখে হারানোর বহরটা তো টের পাচ্ছ!

—আহা, বিয়ের পর পর বউকে ছেড়ে থাকতে হলে অনেক বরই অমন খ্যাপামি করে। অন্নপূর্ণা সহসা অনিন্দ্যর দলে,—তোর ঠাকুরদা কী কাণ্ডটা করত জানিস? আমি বাপের বাড়ি গেলেই সেখানে গিয়ে হত্যে দিয়ে বসে থাকত। সন্ধে গড়িয়ে যায়, রাত্তির হয়ে যায়, নড়ার নামটি নেই। শেষমেশ বাবা বলতে বাধ্য হত, বাবাজীবন, তুমি রাতটুকু তবে এখানেই থেকে যাও।

—তা হলে আর কী। তোমার নাতজামাই তোমার বরের মতোই হয়েছে।

—আমি তো তোর বাবা মাকেও তাই বলি। ওরা যে কেন মিছিমিছি এত টেনশান করে!

—হুম্।

—অনিন্দ্যকে একদিন জোর করে এখানে ধরে নিয়ে আয়। আমি জানি তুই ওকে খুব গঞ্জনা দিয়েছিস। বেচারা আর লজ্জায় এখানে আসতে পারে না। অন্নপূর্ণা চোখ টিপলেন,—এবার এলেই আগে ওর রাতে থাকার বন্দোবস্ত করে দেব।

—আহা, রসে মরে যাই।

আরও খানিকক্ষণ এতাল বেতাল কথা বলে উঠে পড়ল শরণ্যা। সাড়ে চারটে বাজে, বাসেট্রামে ভিড় হতে শুরু করেছে, এর পর ট্যাক্সি পেতেও অসুবিধে হবে। অনিন্দ্যর ফেরার টাইম ছটা থেকে সাড়ে ছটা, বাড়ি এসে শরণ্যার মুখ না দেখলে মেজাজ টং হয়ে যাবে বাবুর।

পি-এস-বি'র প্রোজেক্টে কাজ করার খবরটা শুনে কী প্রতিক্রিয়া হবে অনিন্দ্যর? আট হাজার হাতে পাবে শুনলে চোখ কি গোল গোল হয়ে যাবে? শুভ্রর কথা বলা চলবে না। অনিন্দ্যর মনের গতিপ্রকৃতি সরল নয়, কী ভেবে বসে কে জানে!

অন্নপূর্ণা দরজা অবধি এসেছেন। শরণ্যার চিবুক ছুঁয়ে বললেন,—ভাল থাকিস বুবলি।

শরণ্যা আবছা হাসল,—সেই চেষ্টাই তো করছি ঠাম্মা।

সহজ সুরেই কথাটা বলতে চেয়েছিল শরণ্যা। কেন যে তবু গলাটা কেঁপে গেল!

ছয়

আর্য অন্যমনস্ক হাতে ভাত মাখছিলেন। অতি ধীর লয়ে। অনেকটা সিনেমার স্লো মোশানের মতো। দৃষ্টি নিবদ্ধ সংবাদপত্রের চতুর্থ পৃষ্ঠায়। দিন দশেক আগে টালিগঞ্জের ফুটপাথ ধরে হাঁটছিল মা ছেলে, খোলা ম্যানহোলে হঠাৎ পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে বাচ্চাটার। খবরের কাগজের প্রতিবেদন পাঠ করে জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত, তাদের চিঠিপত্রেই আজ ছেয়ে আছে পাতাটা। কারুর মতে পুরসভাই দায়ী, কেউ বা আঙুল তুলেছে সরকারি অপদার্থতার দিকে, কোনও কোনও চিঠিতে মুণ্ডুপাত করা হয়েছে পুলিশের। নাগরিকদের মধ্যে ন্যূনতম সিভিক সেন্স গড়ে ওঠেনি বলেও আক্ষেপ করেছে অনেকে। অকালে একটা টাটকা ফুল ঝরে যাওয়ার বেদনায় চোখের জলও কম ঝরেনি।

সত্যি তো, এ কেমন দেশ? দিনের পর দিন ম্যানহোল খোলা পড়ে থাকে, পুরসভার ভ্রূক্ষেপ নেই। ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি হয়ে যায়, পুলিশ মাথাই ঘামায় না। পথেঘাটে হাঁটাচলার মতো সামান্য একটা ব্যাপারেও মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারে না সরকার। আর নাগরিকদের তো কোনও রকম সিভিক সেন্স নেইই। চুরি না আটকাতে পারুক, গর্তে একটা পাথর চাপা দিতে পারেনি?

সব ঠিক। কিন্তু, মাটির কথা কেউ লেখে না কেন? বাচ্চার হাত ধরে হাঁটার সময়ে মা কী করে এত বেখেয়াল হয়? কেমন মা? সামনে গর্ত আছে না ঢিবি, একবার তাকিয়ে দেখবে না? দোষটা তো মাকেও দেওয়া উচিত।

—বাবা, আপনাকে একটু মাছের ঝোল দেব?

চিন্তা ছিঁড়ে গেল। পাতের দিকে তাকালেন আর্য।

শরণ্যা ফের জিজ্ঞেস করল,—দিই ঝোল? অল্প করে?

—উঁ, নাহ্ লাগবে না।

—বড্ড শুকনো শুকনো খাচ্ছেন যে?

—ঠিক আছে। আমি এরকমই তো খাই।

শরণ্যার ওই যত্নটুকু ভাল লাগল আর্যর। মেয়েটা বেশ, কথাবার্তা ভারী মিষ্টি। মুখার্জিবাড়ির...উঁহু, মুখার্জি নয়, চ্যাটার্জিবাড়ির ধারায় পড়ে এখনও তাঁকে অশ্রদ্ধা করতে শেখেনি। বাবা মা সুশিক্ষাই দিয়েছেন মেয়েটাকে। আর্যর ছোটখাটো সুখসুবিধেগুলোর ব্যাপারে এই প্রথম বুঝি কেউ নজর রাখছে। চা'টা কফিটা দিয়ে আসে ঘরে, খেতে ডাকে, একসঙ্গে খেতে বসে, অন্তত এই দুপুরবেলাটায়...আর্যর কাছে এই প্রাপ্তিটুকুও কম নয়।

মেয়েটা অন্তর থেকেই করে তো? না করলেই বা কী? করুণা করলেই বা কী যায় আসে? আর্য ভাল মতোই জানেন, তিনি এ-বাড়িতে করুণারই পাত্র। আজ বলে নয়, চিরটাকাল।

খবরের কাগজে মন ফেরানোর আগেই ফের শরণ্যার গলা শুনতে পেলেন আর্য,—আমি তো বাবা একদম শুকনো খেতে পারি না। ঝোল না হলে হয়? গলায় আটকে যাবে না? আমার মা তো বলে, বুবলির ভাত নদীতে ভাসে।

আর্যর শুনতে মজা লাগছিল। এমন ফুরফুরে সুরে এ-বাড়িতে তো কেউ কথা বলে না। কৌতুক করে বলতে ইচ্ছে হল, তাই বুঝি? আর তরকারিগুলো কি নৌকো হয়ে ঘুরে বেড়ায়?

শব্দই ফুটল না গলায়। এ-বাড়ির কারুর সঙ্গে খোলা মনে কথা বলতে গেলে কোত্থেকে যে একটা অবরোধ এসে দাঁড়ায়!

কিন্তু শরণ্যাকে কি ঠিক এ-বাড়ির কেউ বলা যায়? একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর আর শরণ্যার তো মুখার্জিবাড়িতে একই স্ট্যাটাস। উঁহু, মুখার্জিবাড়ি নয়, চ্যাটার্জিবাড়ি। একজন সোমশংকর চ্যাটার্জির নাতির বউ, অন্যজন সোমশংকরের মেয়ের বর। দুজনেই বহিরাগত। ওই সূত্র ধরেই তাঁরা কি পরস্পরের আর একটু ঘনিষ্ঠ হতে পারেন না? প্রবীণতর হিসেবে আর্যরই তো উদ্যোগটা নেওয়া উচিত।

অবশ্য ওই মেয়ে একাই একশো। একা একাই বকে যেতে পারে। সপ্তাহ দুয়েক হল ইউনেস্কোর কী এক প্রকল্পে কাজ শুরু করেছে, রোজই ফেরার সময়ে একবার ঢুঁ মারে তাঁর ঘরে, গল্প শোনায় সেদিন কতটুকু কী হল। প্রশ্নও করে খুব। কালও প্রাচীন গ্রিসে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে কত কী জানতে চাইছিল। কৌতূহলের দাবি মেটাতে মেটাতে আর্য হিমশিম। সেই কতকাল আগে হারিয়ে যাওয়া অধ্যাপক হতে চাওয়া মানুষটাকে খুঁড়ে খুঁড়ে বার করতে হয়, মন্দ লাগে না আর্যর।

শরণ্যা বকবকম করেই চলেছে,—বাবা, আপনার কিন্তু অনেকটা ভাত পড়ে রইল। আপনি কিন্তু আজ খাচ্ছেন না।

স্নেহের ধমকটুকু উপভোগ করলেন আর্য। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন,—খাচ্ছি তো। আমি তো আস্তে আস্তেই খাই।

—উঁহু। আপনি যেন কী একটা ভাবছেন? কাগজে কোনও ইন্টারেস্টিং খবর আছে নাকি?

পলকের জন্য আর্যর মনে হল চিঠিচাপাটিগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করেন শরণ্যার সঙ্গে। পরক্ষণে মন বদলালেন। যদি শরণ্যার সঙ্গে মতে না মেলে? বাচ্চাটার মৃত্যুর জন্য তিনি মাকেও অংশত দায়ী করতে চান, শরণ্যা বোধহয় এটা মানতে পারবে না। হয়তো একটা তর্ক শুরু হবে। তর্কে আর্যর তীব্র অনীহা।

আর্য বললেন,—তেমন কিছু নেই। বলেই খবরের কাগজখানা উলটে রাখলেন পাশে। জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি আজ বেরোবে না?

—কাল একগাদা বই এনেছি। বেশ কয়েকখানা রেফারেন্সও। আজ কম্পিউটার থেকে রেফারেন্স ধরে ধরে ডাটা কম্পাইল করব। একদিনে হবে না, দু-তিনদিন বাড়িতেই কাজ করতে হবে এখন।

—তোমরা নেপাল ভুটানের ডাটা পাচ্ছ কোত্থেকে? ওখানে কি সেনসাস হয় নিয়মিত?

—হ্যাঁ, হয় তো।

—আর মায়নামার? ওদের তো নাকি কোনও কিছুই বাইরে আসে না!

—এখন আসছে। কয়েকটা বেশ ভাল ভাল স্টাডি রিপোর্টও আছে। এখনও অবশ্য জোগাড় হয়নি...

বলতে বলতে ঝুপ করে থেমে গেল শরণ্যা। মুখটা যেন কেমন করে বসে রইল একটুক্ষণ। তারপর আচমকাই মুখ চেপে দৌড়ল বড় বাথরুমটায়।

আর্য শব্দ পেলেন ওয়াক ওয়াক করে বমি করছে মেয়েটা। ঘাবড়ে গেলেন খুব। এই মুহূর্তে কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছিলেন না। উঠে গিয়ে দেখবেন শরণ্যাকে? তিনি বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লে মেয়েটার অস্বস্তি হবে না তো?

মিনিট তিন চার পর ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে বেরিয়ে এল শরণ্যা। সালোয়ার কামিজের ওড়নায় মুখ মুছছে।

আর্য উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,—কী হল হঠাৎ? অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল শরণ্যা। দম নিতে নিতে বলল,—গা'টা কেমন গুলিয়ে উঠল!

এ-বাড়ির সদস্য হওয়ার সুবাদে নিজের অজান্তেই ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার প্রবৃত্তিটা হারিয়ে ফেলেছেন আর্য। তবু কেন যেন আজ এখানেই থামতে পারলেন না। হয়তো এ-বাড়ির কেউ সামনাসামনি নেই বলেই। হয়তো কন্যাপ্রতিম মেয়েটির ওপর কণামাত্র হলেও দুর্বলতা জন্মে গেছে আর্যর।

অভিভাবকের সুরে প্রশ্ন করলেন,—কেন? গা গুলোল কেন? হজমের গণ্ডগোল?

—তাই হবে।

—সকালে উলটোপালটা কিছু খেয়েছিলে?

—না তো। ওই সসেজ আর ব্রেড।

—নির্ঘাৎ তা হলে পেট গরম হয়েছে!... এখন কেমন ফিল্ করছ?

—বেটার।...একটু ভাল।

—বমি ভাবটা নেই তো আর?

—কমে গেছে অনেকটা। মনে হয় খুব অম্বল হয়েছিল।

—ওষুধ খাবে কিছু? আমার ঘরে অ্যান্টাসিড আছে।

—একটু দেখি। তেমন বুঝলে নিয়ে আসব।

আর্য আর প্রশ্নে গেলেন না। টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। ঈষৎ চিন্তিত মুখে বেসিনে মুখ ধুচ্ছেন। তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে চোখে পড়ল মেয়েটা ঘরে যায়নি, ডাইনিংটেবিলে বসে আছে ঝুম হয়ে। এখনও কি অসুস্থ বোধ করছে?

পায়ে পায়ে শরণ্যার সামনে এলেন আর্য। নরম গলায় বললেন,—এখন আর পড়াশুনো নিয়ে বোসো না। রেস্ট নাও। শোও গিয়ে। যদি মনে হয় ফের শরীর খারাপ লাগছে আমায় ডাকবে। ডক্টর মিত্র দুপুরের পর থেকে বাড়িতেই থাকেন, আমি ওঁকে একটা ফোন করে নেব।

শরণ্যা বাধ্য মেয়ের মতো ঘাড় নাড়ল,—আচ্ছা।

কথাগুলো বলতে পেরে ভেতরে ভেতরে আর্য একটা অচেনা তৃপ্তি অনুভব করছিলেন। ঘরে গিয়েও খানিকক্ষণ রয়ে গেল রেশটা। কতকাল পর বুঝি কারুর জন্য একটু উদ্বিগ্ন হতে পারলেন।

টেবিলঘড়িতে একটা দশ। ইজিচেয়ারে শরীর ছেড়ে বসে আছেন আর্য। বিশ্রাম নিচ্ছেন। বড়সড় বেঁটে ঘরখানার দুদিকে দুই দুগুণে চারখানা জানলা। চারটে জানলা দিয়েই চৈত্রের শুকনো বাতাস ঢুকে পড়ছে হঠাৎ হঠাৎ। স্ট্যান্ডফ্যানের হাওয়ায় ধাক্কা খেয়ে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। বাতাসটা বেশ গরম। হল্কার মতো লাগে। তবু উঠে জানলা বন্ধ করলেন না আর্য, চোখ রেখেছেন গরাদের ওপারে। বাড়িটা দক্ষিণমুখো। আর্য কখনও রাস্তার দিকে মুখ করে বসেন না, তাঁর প্রিয় দিক পশ্চিম। এ-পাশে বাউন্ডারি ওয়ালের আগে এক ফালি সবুজ আছে, একটা দুটো গাছ স্নিগ্ধ করে রেখেছে জায়গাটাকে। ঝাঁকড়া কামিনী গাছটায় কোত্থেকে আজ একটা পাখি ডাকছিল। পিকপিক পিকপিক। পাখিটার একটানা ডাক শুনতে শুনতে আর্য ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিলেন তন্দ্রায়।

ঘুম ভাঙল নীলাচলের ডাকে,—বাবু...?

ধড়মড়িয়ে উঠলেন আর্য। চোখ রগড়ালেন।

নীলাচল দরজায়। বলল,—কখন কফি রেখে গেছি। আপনি এখনও ওঠেননি?

—কটা বাজে?

—তিনটে। টেবিলঘড়ি নয়, নিজের সোনালি ডায়ালের রিস্টওয়াচখানা দেখল নীলাচল। বলল,—না না, তিনটে পাঁচ।

এতক্ষণ ঘুমিয়েছেন আর্য? কোনকালেই আর্যর দিবানিদ্রার অভ্যেস নেই। বড় জোর পাঁচ দশ মিনিট চোখ বুজে থেকে ভাতের আমেজটা ছাড়িয়ে নেন। দুপুরে ঘুমোন না বলে এই চৌষট্টি বছর বয়সেও তাঁর শরীর যথেষ্ট ফিট। ঘরে বসে থেকেও। সকালে হাঁটার অভ্যেসটা সুগার প্রেসারকেও বশে রেখেছে। কিন্তু আজ কেন ঘুমিয়ে পড়লেন? আবছা ভাবে মনে পড়ল তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত একটা পাখির ডাক ভেসে আসছিল কানে। পাখিটাই কি তবে ঘুম পাড়িয়ে দিল?

অলস রোমান্টিক চিন্তায় সময় কাটানো আর্যর শোভা পায় না। পুরু লেন্সের চশমাখানা চোখে লাগিয়ে ইজিচেয়ার ছেড়ে স্টাডি-টেবিলে এলেন। ফ্লাস্ক খুলে কালো কফি ঢাললেন ঢাকনা-গ্লাসে।

চিনিবিহীন তেতো কফি ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে মগজকে। কাগজ গুছিয়ে কলম খুললেন। এক্ষুনি চিঠিটার মুসাবিদা করে ফেলবেন। লেখা শুরুর আগে আর একবার পড়ে নিলেন আজকের প্রকাশিত চিঠিগুলো। দাগ মারলেন কোন কোন চিঠিকে তিনি আক্রমণ করবেন।

সংবাদপত্রে পত্রাঘাত করা আর্যর নেশা। এ-বাড়ির লোকরা বলে বাতিক। নেশা না বাতিক কোন কথাটা তাঁর জন্য সুপ্রযোজ্য হবে আর্য নিজেও বোঝেন না। তবে বিশেষ এক ধরনের সংবাদ তাঁকে প্রণোদিত করে। পারিবারিক খুনখারাপি অথবা অস্বাভাবিক মৃত্যু। মাস খানেক আগে একটি মেয়ে তার মাকে হত্যা করেছিল। প্রেমিককে বিয়ে করায় বাধা দিচ্ছিল মা, ঠাণ্ডা মাথায় পথের কাঁটা উপড়ে ফেলে মেয়েটি। ঘটনাটি নিয়ে কলকাতার সমস্ত খবরের কাগজেই কদিন কী আলোড়ন। প্রায় সব চিঠিপত্রেরই ঘুরে ফিরে এক বয়ান। আজকালকার ছেলেমেয়েরা দারুণ উন্মার্গগামী হয়ে গেছে, তাদের এতটুকু সহ্যশক্তি নেই, গুরুজনদের মতামতকে তারা সম্মান দিতে জানে না, যা চায় তা না পেলেই তারা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, সিনেমা টিভির ভায়োলেন্স এদের আরও বিগড়ে দিচ্ছে, সব চেয়ে আপনজনকে যে সন্তান খুন করে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর্য ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন মেয়ের এরকম মনোভাব গড়ে ওঠার পিছনে মায়েরও দায়িত্ব আছে। প্রকারান্তরে বলা যায় মা নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছেন। মা মেয়ের সম্পর্কে ফাঁক ছিল বলেই এমন কাজ করতে পেরেছে মেয়ে। যে-সন্তান মাকে ভালবাসতে পারে না, তাকে দণ্ড না দিয়ে সমবেদনার চোখে দেখাটা বেশি জরুরি। অনেকেই তাঁর বক্তব্য মানতে পারেননি, প্রতিবাদ করে বেশ কয়েকটা চিঠিপত্রও বেরিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থনও করেছিলেন এক আধজন। এর আগেও এক কিশোর তার বাবা-মাকে নৃশংস ভাবে খুন করেছিল, সেবারও আর্য ঢেউ-এর বিপরীতে গিয়ে কলম ধরেছিলেন। এরকম এক দুবার নয়, বারবার তিনি গড্ডলিকার বিপরীতে দাঁড়িয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর চাঁচাছোলা বক্তব্য ছাপতে রাজি হয়নি খবরের কাগজ, তবু আর্য দমেননি। তিনি বিশ্বাস করেন, সমাজ বা পরিবেশ নয়, ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকৃতির মূল কারণ নিহিত থাকে তাদের পরিবারে।

কোত্থেকে এই ধারণা জন্মাল আর্যর? নিজের পরিবার? অনিন্দ্য বা সুনন্দ কাউকেই তাঁর স্বাভাবিক মনে হয় না। একজনের মধ্যে শুধুই ঘৃণা, অন্য জন চরম উদাসীন। আর্য যদি নিজের মত নিজে মানেন, তা হলে তিনি নিজেও তো ছেলেদের অস্বাভাবিকতার জন্য দায়ী। হ্যাঁ, আর্য মনকে চোখ ঠারেন না। প্রতিটি চিঠিতে তিনি নিজেকেই চাবুক কষাতে চান। ভেতরটা তাঁর ক্ষতবিক্ষত হয়, যন্ত্রণাটা তিনি উপভোগ করেন। এ তাঁর একধরনের মর্ষকামিতা। স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের চাপে চিরকাল নুয়ে থেকেছেন তিনি, অথচ একটা অক্ষম ক্ষোভ অহর্নিশি তাঁকে তাড়া করে

বেরিয়েছে। অনুভূতিটা শুধু তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্ককেই শীতল করেনি, দুই ছেলের কাছে ঘেঁসতেও তিনি আগ্রহ হারিয়েছেন। মনে হয়েছে, ওরা আমার কে? দুজনেই তো সোমশংকরের মেয়ের ছেলে! নিবেদিতার গা-ছাড়া মনোভাব যখন ছেলেদুটোকে বদলে দিচ্ছিল, আর্য তখনও এগোতে পারে নি। অনেক দেরি হয়ে গেছে যে তখন। ছেলেদের চোখে আর্য তখন প্রায় অস্তিত্বহীন। অথবা ক্লীবমাত্র। যাকে কোনও কোনও মুহূর্তে কল্পনা করা যায়, কিন্তু মানুষ বলে গণ্য করা যায় না।

নিজের এই বিপন্নতা বড় পীড়া দেয় আর্যকে। বুঝি ওই চিঠিগুলো লিখেই তিনি একটু মুক্তি পেতে চান। নিজেকে আঘাত দিয়ে রফা করতে চান মনের সঙ্গে।

আজ চিঠিটার মুসাবিদা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না আর্যর। কখনও মনে হয় বড্ড বেশি কড়া হয়ে যাচ্ছে, কখনও বা যুক্তি খেই হারিয়ে ফেলছে। একবার কাটলেন, দুবার কাটলেন, বার কয়েক কাটাকাটির পর বেশ খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন আর্য। ছেঁড়া কাগজ দলামোচড়া করে ঢোকাচ্ছেন ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। কফি খেলেন দু'চুমুক। উঠে পায়চারি করছেন ঘরে। আর্য আর অনিন্দ্যর মুখ একই ছাঁচে ঢালা। ফর্সা ফর্সা মেয়েলি ধাঁচের মুখখানায় নানান রঙের অভিব্যক্তি ফুটে উঠছে। মাথা ঝাঁকাচ্ছেন আর্য। আপন মনে বিড় বিড় করছেন। যেন চিঠির বক্তব্য গোছাতে গিয়ে লড়াই করছেন কারুর সঙ্গে।

টেবিলে পেলোপোনেশিয়ান ওয়ার বইটা পড়ে আছে। অনেককাল পর কাল রাত্রে আর্য উল্টে পাল্টে দেখছিলেন বইখানা। অন্যমনস্কভাবে বইটা হাতে তুলেও সরিয়ে রাখলেন টেবিলের একধারে। ফের বসেছেন চিঠি নিয়ে। পৌনে পাঁচটা বাজে, লেখার জায়গাটায় আলো একটু কম কম লাগছে, টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে নিলেন আর্য। সাদা কাগজে শুরু করলেন—মাননীয় সম্পাদক মহাশয়...

তিন লাইন লিখতে না লিখতেই ভাবনা ছিঁড়ে ফরদাফাঁই। উৎকট বাজনার আওয়াজ। গোটা বাড়ি যেন কাঁপছে ঝনঝন। সুনন্দর সাঙ্গোপাঙ্গরা এসেছে! কখন এল? তারা তো নিঃশব্দে সিঁড়ি ভাঙার পাত্র নয়! আর্য যখন ঘুমোচ্ছিলেন তখনই কি...? এতক্ষণ চুপচাপ ছিল? নাকি এইমাত্র উঠল, আর্য খেয়াল করেননি?

হঠাৎ হঠাৎ এক একদিন এই অত্যাচারটা করে সুনন্দ। চলে প্রায় ঘন্টা দু'তিন। আর্যর তখন পাগল পাগল লাগে, মনে হয় বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান রাস্তায়।

বাজনার পরদা চড়ছে ক্রমশ। হঠাৎই শরণ্যার কথা মনে পড়ল আর্যর। মেয়েটার আজ শরীর খারাপ, নিশ্চয়ই বিশ্রাম নিচ্ছে। বেচারা এই উৎপাতে তো অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। ওপরে গিয়ে বারণ করে আসবেন? ধমকাবেন সুনন্দকে? বলবেন, অন্যদের সুবিধে অসুবিধের কথা একটু ভাবতে শেখো?

একটা তেতো হাসি ফুটে উঠল আর্যর ঠোঁটে। তিনি জানেন তিনি কিছুই বলতে পারবেন না। বসে বসে শুধু গুমরোনটাই তাঁর নিয়তি।

দু'হাতে কান চেপে আরামকেদারায় এসে বসলেন আর্য। শেষ সূর্যের আলো পড়েছে কামিনী গাছের মাথায়, ডগার পাতাগুলো চিকচিক করছে আলোয়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর্যর শরীর ক্রমে শিথিল হয়ে এল। বাজনার আওয়াজ অসহ্য, তবে যেন সয়ে আসছে কানে। চোখের সামনে থেকে একটা দিন মুছে যাচ্ছে। আরও একটা নিষ্ফলা দিন। একটা বিফল মানুষের আয়ু আরও কয়েক ঘন্টা কমে গেল।

আর্যর দৃষ্টি আবছায়ায় স্থির। আবছায়া? না শুধুই ছায়া? ক্রমশ ছায়া যেন গাঢ় হচ্ছে। অন্ধকারে গাঢ়তর আঁধার হয়ে ফুটে উঠছে অতীত। সারাটা জীবন কী করলেন তিনি? এম-এ-তে অসাধারণ রেজাল্ট করার সুবাদে চাকরি পেলেন, প্রথম দিনই ক্লাসে গিয়ে পা কাঁপতে লাগল, বুক ধড়াস ধড়াস। ছাত্রছাত্রীদের সরল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও গলা শুকিয়ে কাঠ। গোড়ার দিকে ভেবেছিলেন এ বুঝি প্রাথমিক জড়তা, আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়ে যাবে, কিন্তু হল কই? জানা বিষয়ও ক্লাসে গিয়ে ভুলে যান, লেকচার দিতে গিয়ে তোতলাতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু হল কলেজে, ক্লাসে ঢুকলে ছেলেমেয়েরা বিচিত্র আওয়াজ করে, করিডোরে টিটকিরি দেয়, স্টাফরুমেও তিনি সহকর্মীদের মজার খোরাক। প্রিন্সিপাল বারীন গুপ্ত একদিন ডেকে বললেন, কথা বলাটা যখন তোমার আসে না, তুমি নোট বানাতে শুরু কর। মরিয়া হয়ে আর্য রাত জেগে দিস্তে দিস্তে ইতিহাসের নোট বানালেন, তাতেও সমস্যা মিটল না। বোর্ডে লিখতে গেলে হাত কাঁপে, দেখে দেখে পড়তে গেলে গলা। শিক্ষকতার পেশাটা ছেড়েই দিলেন আর্য, মিউজিয়ামে চাকরিটা পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। এক কোণে ঘাড় গুঁজে নিজের কাজটি করে যাও, সামনে আর অনেক মুখ নেই, এই তো বেশ। টানা আঠাশটা বছর জাদুঘরে চাকরি করলেন আর্য, কোথাও এতটুকু ছাপ পড়ল না। প্রাচীন পাথরের মাঝে এক টুকরো জীবন্ত ফসিল হয়ে কাটিয়ে দিলেন দিব্যি। অফিসকলিগরা আড়ালে তাঁকে কী নামে ডাকতেন তাও তিনি জানেন। মিস্টার ডাম্ব। ডাম্বু। অফিসে কত অবিচারের শিকার হয়েছেন আর্য। প্রাপ্য প্রোমোশান পাননি, অকর্মণ্য হিসেবে তাঁকে দেগে দেওয়া হয়েছে, ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে অপ্রয়োজনীয় বিভাগের ডাস্টবিনে। সহকর্মীদের দেওয়া নামের মর্যাদা রাখতেই বুঝি টুঁ শব্দটি করেননি।

বাড়িতেই বা কী পেয়েছেন? এক আধ বার আহত কুকুরের মতো ফুঁসে ওঠা ছাড়া?

এরকম একটা মানুষের জীবন থেকে একটা দিন খসে গেলেই বা কী?

তবু যে কেন এক অচেনা ভয় আঁচড় কাটে আর্যর বুকে? মৃত্যু কি আরও এক কদম এগিয়ে এল?

আশ্চর্য, বেঁচে থাকা অর্থহীন জেনেও কেন যে মৃত্যুকে এত ভয়?

ইজিচেয়ার সামান্য নড়ে উঠল।

ঝাঁকুনি খেয়ে আর্য চমকে তাকালেন। নীলাচল।

অবাক চোখে নীলাচল দেখছে আর্যকে,—আপনার হল কী বাবু? এই ঝাঁপরঝাঁই-এর মাঝেও ফের ঘুমিয়ে পড়েছেন?

আর্য গোমড়া মুখে বললেন,—আমি জেগে আছি।

—সাড়া দিচ্ছেন না যে? কখন থেকে ডাকছি!

—কেন?

আপনার ফোন।

আর্যর কপালে প্রশ্ন চিহ্ন।

—আপনাকেই খুঁজছে। হ্যান্ডসেটটা এনে দেব?

হ্যান্ডসেট থাকে সোমশংকরের মেয়ের ঘরে। আর্য বললেন,—থাক। আমি যাচ্ছি।

দোতলায় বাজনার দাপট আরও বেশি। কিছুই প্রায় শোনা যাচ্ছে না। এক কান চেপে রিসিভার অন্য কানে নিলেন আর্য,—হ্যালো...? কে বলছেন? জোরে বলুন।

—কে? ...বড়দা? ক্ষীণ স্বর ভেসে এল,—আমি ভোম্বল।

—ও।...বল্।

—তোমার বাড়িতে কোনও ফাংশান হচ্ছে নাকি?

—অ্যাঁ?... হ্যাঁ। একটু গানবাজনা...

—বেশ আছ।

ভোম্বলের স্বরে শ্লেষ। আর্যর গলা আরও ভারী হল, দরকারটা কী বল্।

—তোমাকে একটা খবর দেওয়ার ছিল। মেজজামাইবাবু মারা গেছেন।

আবছা ভাবে মেজ বোনের বরের মুখটা মনে পড়ল আর্যর। আবছা ভাবেই। স্বরে বিশেষ আবেগ ফুটল না। বললেন,—কবে?

—পরশু। রাত্তির সাড়ে এগারোটা নাগাদ।

—ও।...কী হয়েছিল?

—সেরিব্রাল অ্যাটাক। হাসপাতাল নার্সিংহোম অব্দি নেওয়া যায়নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই...

—ও।

—মেজদি খবরটা তোমায় দিতে বলল। পারলে একবার এসো।

টেলিফোন রেখে আনমনে ঘরে ফিরলেন আর্য। চেয়ারে বসে ছোট্ট একটা শ্বাস ফেললেন। বুলুর বর মারা গেছে পরশু রাতে, খবরটা তাঁকে দেওয়া হল প্রায় দু দিন পর। ঠিকই তো আছে। ভাই বোনদের সঙ্গে আর্যর তো এখন এরকমই সম্পর্ক। যোগাযোগ যেটুকুনি আছে, সেও তো প্রায় না থাকারই মতো। এক ভোম্বলই যা আসে ন মাসে ছ মাসে। বাঁকা চোখে দেখে সোমশংকরের প্রাসাদটাকে, তবু আসে। বাকিদের সঙ্গে তো বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া দেখাই হয় না। বুলুরা তো অনিন্দ্যর বিয়েতেও আসে নি। তাঁকে যে আদৌ দুঃসংবাদটা জানানোর কথা বুলুর

মনে পড়ল এই না টের।

আর্য জানেন তাঁর ওপর ভাইবোনদের একটা উগ্র অভিমান আছে। থাকাটা অস্বাভাবিকও নয়। পরিবারের উজ্জ্বলতম রত্ন বলে যাকে মনে করা হত, সে যদি বড়লোকের ঘরজামাই হওয়ার টানে সবাইকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তাকে কি বাড়ির লোক পুজো করে! অবশ্য বিয়ের পরও আর্য বাড়ি যেতেন নিয়মিত, অন্তত যতদিন বাবা মা ছিলেন। বুলু টুলুর বিয়েতে যেচে টাকাপয়সাও দিয়েছেন। তবে টের পেতেন তাঁকে আর কেউ ও বাড়ির মানুষ বলে মনে করে না। কতদিন আর একতরফা সম্পর্ক বয়ে বেড়ানোর দায় নেওয়া যায়? আর্যও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ক্রমশ। ভেতরটা বিশ্রী ভাবে জ্বলত তখন, একসময়ে সেই জ্বালাপোড়াও মরে গেল, তার জায়গায় ভর করল এক অদ্ভুত নির্লিপ্তি। ইচ্ছে হলে খবর নিও, না হলে নিও না, এমন একটা মনোভাব। অনিন্দ্যর বিয়েতে বুলুরা এল না, বড়দিও না, তার জন্য কতটুকু আহত হয়েছেন আর্য?

বুলুর বরের মৃত্যুসংবাদেও কি তিনি মুহ্যমান? উঁহু। শুধু খবরটা দেরি করে পাওয়ার জন্যই বুঝি খচখচ করছে মনটা। একান্তই অর্থহীন, তবু কেন যে করছে?

নীলাচলকে ডেকে ফ্রিজ থেকে সোডার বোতল আনালেন আর্য। বসলেন তরল পানীয় নিয়ে। নিত্য অভ্যাসে সুরা আর তেমন ক্রিয়া করে না মস্তিষ্কে, তবু যেন একটু শিথিল হয় স্নায়ু, শান্তি শান্তি আমেজ আসে একটা। এখন তিনি বই খুলবেন, অক্ষরের অরণ্যে ডুবে থাকবেন খানিকক্ষণ। অক্ষরের জঙ্গল ঝাপসা হওয়ার আগে খেতে উঠবেন ওপরে। নেমে এসে দেখবেন দেড় তলার ঘরে সিংগল বেড খাটখানায় শোয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখে গেছে নীলাচল। টেবিলে সাজানো আছে গ্লাস, জলের জগ। আর্য জল খাবেন একটু। বাথরুমেও যাবেন, তবে তক্ষুনি তক্ষুনি শোবেন না। ইজিচেয়ারে ছড়িয়ে দেবেন শরীর, ফিকে আঁধারের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ধীরে ধীরে ভারী হয়ে আসবে চোখ, স্ট্যান্ডফ্যানের মুখ বিছানা অভিমুখে ঘুরিয়ে ঈষৎ বেসামাল পায়ে আর্য গড়িয়ে পড়বেন বিছানায়।

আজ ছন্দোপতন ঘটল। খাওয়ার পর নেমে এসে জলে চুমুক দিয়েছেন কি দেননি, ঘরে চেনা পায়ের শব্দ। সোমশংকরের মেয়ে।

আর্যর ভুরু কুঁচকে গেল। ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন,—কিছু বলবে?

নিবেদিতার পরনে নাইটি হাউসকোট। হাউসকোটের ফিতে টাইট করতে করতে বললেন,—তোমার সঙ্গে জরুরি কথা ছিল।

আর্য মনে মনে বললেন, জরুরী কথা ছাড়া কি আসো তুমি?

মুখে বললেন, —বলো।

—শুনেছ তো, আমাদের শোভাবাজারের বাড়ি এক্ষুনি বিক্রি হচ্ছে না?

আর্য মনে মনে বললেন,—আমায় বলবেটা কে? আর শুনেই বা কী করব?

মুখে বললেন, —এই শুনলাম।

—বাড়িটা বিক্রি না হয়ে খুব অসুবিধেয় পড়ে গেলাম। টাকার খুব দরকার ছিল।

আর্য মনে মনে বললেন, তো?

মুখ বললেন,—হুম্।

—তুমি আমায় কিছু ধার দাও। মাস ছয়েকের মধ্যে শোধ দিয়ে দেব।

দুটো আর্য মিশে গেল,—কত?

—এই লাখ দেড়েক মতো।

—এত টাকা! কেন?

—টাকা কিসের জন্য লাগে? নিশ্চয়ই আমি ওড়াব না। নিবেদিতা ঝেঁঝে উঠলেন। বুঝি বা আর্যর কাছে হাত পাততে অস্বস্তিও ছিল, সেটাই যেন প্রকাশ পেল অন্য সুরে,—বাড়িটা দিন দিন ঝাঁঝরা হচ্ছে, নজরে পড়ে? শুধু রঙ করালেই কি কাজ শেষ হয়ে যায়? একতলাতে তো হাতই পড়েনি। ভাড়া দিতে এসে প্রতি মাসে মাথুর শুনিয়ে যাচ্ছে, এখানে চাপড়া খসে পড়ছে, ওখানে মেঝে ফেটে যাচ্ছে......। ওদের আমি কথা দিয়েছিলাম বাথরুমগুলো রেনোভেট করে দেব.....। গাড়িটারও তো ওই কন্ডিশন! দশ দিন গ্যারেজে কাজ হল, উনিশ হাজার টাকা খরচা করলাম, তারপরও রোজ বন্ধ হচ্ছে! চলে এভাবে? নতুন না হোক, একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িও তো কিনতে হয় এবার। উটপাখির মতো মুখ গুঁজে আছ থাকো, অন্তত ঝড়ের খবরগুলো তো রাখো।

আর্য বলতে পারতেন, আমার তো এত সব জানার কথা নয়। বাড়ি তোমার, ভাড়াটে তোমার, টাকাও তোমার ব্যাগেই ঢোকে। গাড়িটাও তুমিই চড়ো।

বলতে পারলেন না। তবে অপ্রসন্ন স্বর ফুটল গলায়,—বটেই তো। বটেই তো। সব খবর তো তুমি একাই রাখো।

—রাখিই তো।

—বাড়িতে একটা বাইরের মেয়েকে এনেছ, তার দিকে খেয়াল আছে?

—কেন? নিবেদিতা থমকালেন,—কী হয়েছে শরণ্যার?

—আমাকে উটপাখি বলার আগে নিজেকে আয়নায় দ্যাখো।... মেয়েটা আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বমি করছিল।

—কখন?

—দুপুরবেলায়। আমি ওকে জোর করে বললাম, শুয়ে থাকো, রেস্ট নাও...

—সো কাইন্ড অফ ইউ। নিবেদিতার স্বরে বিদ্রূপ,—ছেলেদের খোঁজখবর তো কোনওদিন রাখলে না, তাও অন্তত ছেলের বউ-এর খবরটা রাখছ!

—তোমার ছেলেদের খবর রাখার আমি কে? তারা আমায় পোঁছে? আমি তো শুধু কলুর বলদ, তাদের জন্য শুধু ঘানিই টেনে যাচ্ছি। ভুলে যেও না, কদিন আগেও তোমার ছেলের বিয়েতে আমি দেড় লাখ টাকা দিয়েছি।

—তোমার ছেলে তোমার ছেলে করছ কেন? ছেলে আমার একার? তার বিয়েতে খরচ করা তোমার কর্তব্য নয়?

আর্য ফের দু টুকরো হয়ে গেলেন। একটা আর্য গজগজ করতে লাগলেন, হ্যাঁ, আমার তো শুধু ওইটুকুই কর্তব্য। অধিকারবিহীন দায়িত্ব পালনটাই আমার কাজ। ছেলের জন্য মেয়ে দেখলে তুমি, পাকা কথা বললে তুমি, বিয়ের দিনও তুমি স্থির করলে....আশীর্বাদের আগে হঠাৎ মনে পড়ল ছেলের একটা বাবাও তো আছে! তাকে বরকর্তা সাজিয়ে বিয়ের মণ্ডপে বসিয়ে রাখলে তো মন্দ হয় না! বউভাতের দিন যাত্রাদলের রাজার মতো ধরাচূড়ো পরিয়ে তাকে দিয়ে অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়নের কাজটাও তো চালিয়ে নেওয়া যায়! ছেলের বিয়ে নিয়ে একটা পরামর্শও তুমি করেছ আমার সঙ্গে?

মুখে বললেন,—ওই কর্তব্যটুকুই তো করছি সারাজীবন। তুমি আজীবন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়েছ, আর আমি টাকা রোজগার করে এনে হাওয়ায় ঢেলেছি।

—থাক, লেকচার মেরো না। নিবেদিতার স্বর বেঁকে গেল,—ওটাও তোমার ঠিকঠাক আসে না।

পুরনো প্রসঙ্গ নিয়ে খোঁচা দিচ্ছেন নিবেদিতা। মাঝে মাঝেই দেন ঠেসটা। এখনও। স্মরণ করিয়ে দেন আর্য একজন ব্যর্থ অধ্যাপক।

অন্য দিন মিইয়ে যান আর্য। আজ ওই দুর্বল জায়গাটায় ঘা পড়তেই আর্যর চোয়াল শক্ত হল। বরফ স্বরে বললেন,—আমি টাকা দিতে পারব না। আমার পক্ষে আর সঞ্চয় ভাঙা সম্ভব নয়।

—দেবে না তুমি? দেবে না? নিবেদিতা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। অপমানে মুখ কালো হয়ে গেছে। বললেন,—ধার...তাও দেবে না?

আর্য চুপ।

—ভেবেছ টাকা না দিয়ে আমায় জব্দ করবে? নিবেদিতা চোয়ালে চোয়াল ঘসলেন,—বুড়ো হলে, এখনও তোমার জ্বলুনি গেল না! আমার নাম, আমার খ্যাতি এখনও তোমায় পুড়িয়ে মারে, অ্যাঁ?

আর্য নীরব।

নিবেদিতা জ্বলন্ত চোখে দু এক সেকেন্ড দেখলেন আর্যকে। মেঝেয় পা ঠুকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন দরজায়। ঘুরে বললেন,—কী দেখে যে তোমার মতো একটা অপদার্থকে আমি বিয়ে করেছিলাম! কেন এখনও এক ছাদের নীচে বাস করছ ঢঙ করে? চলে যেতে পারো না কোথাও? আমি মুক্তি পাই!

হৃদয়ের ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে আর্যর। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল, বহুকাল আগেই তো বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। সব কিছু

ছেড়ে। পারলাম কই? কোন সুতোর টানে আটকে গেছি তুমি বোঝ না?

আর্য কিছুই বলতে পারলেন না। এই না পারাটাই তো তাঁর স্বভাব। না পারাটাই তাঁর যন্ত্রণা।

সাত

লাঞ্চে যাবে বলে উঠিউঠি করছিল অনিন্দ্য, পুট করে এক চিঠি এসে হাজির। চিঠি নয়, কর্তৃপক্ষের হুকুমনামা। দুর্গাপুরে ফ্লাইওভার তৈরির কাজ শুরু করছে কোম্পানি, অবিলম্বে অনিন্দ্যকে সেখানে জয়েন করতে হবে। থাকতে হবে সাইটে, দেখাশুনো করতে হবে কাজকর্মের। দুর্গাপুরে জয়েন করার সময়সীমাও নির্ধারিত করে দিয়েছে কোম্পানি। দোসরা মে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে অনিন্দ্য একটুক্ষণ থম বসে রইল। প্রাথমিক অভিঘাতটা সামলানো। তার চারপাশে অহরহ চক্রান্তের জাল বোনা হচ্ছে এ তো সে জানেই। বিশ্বসংসারে কে না তাকে কোণঠাসা করে রাখতে চায়! কিছুদিন ধরেই অফিসে কানাকানি চলছিল সদর দপ্তরে একটা রিসাফল্ হবে। কোপটা তার ঘাড়েই পড়ল তাহলে?

উঠে সোজা চিফ ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে গেল অনিন্দ্য। বাদল ভৌমিকের চেম্বার ফাঁকা নেই আজ, এক সাপ্লায়ার বসে। মুখচেনা। বেলিলিয়াস রোডের জি এম্ ফাউন্ড্রির মালিক। ঘুরনচেয়ারে হেলান দিয়ে তাকে কী সব বোঝাচ্ছেন বি বি।

অনিন্দ্যকে দেখেই থামলেন বি বি,—কিছু বলবে মুখার্জি?

খামশুদ্ধু অর্ডারটা টেবিলে ছুঁড়ে দিল অনিন্দ্য,—এটা কী?

বি বি খামটার দিকে তাকালেনই না। ঠাণ্ডা গলায় বললেন,—বোসো। আগে মিস্টার কেজরিওয়ালকে ছেড়ে দিই।

এই হিমহিম গলাই তো ষড়যন্ত্রের সংকেত! অনিন্দ্য বসে মুঠো পাকাতে শুরু করল। ভ্রূক্ষেপহীন স্বরে কেজরিওয়ালকে ধমকে চলেছেন বি বি। নমুনা মাফিক মাল পাঠায়নি জি এম ফাউন্ড্রি, তাদের একটা গোটা কন্সাইনমেন্ট বি বি বাতিল করেছেন, কী কী ত্রুটি ছিল চাঁছাছোলা ভাষায় শুনিয়ে চলেছেন। শাসালেনও। পরের বার কোয়ালাটি ফল করলে জি এম ফাউন্ড্রিকে কোম্পানী ব্ল্যাকলিস্টেড করবে।

অনিন্দ্য ধৈর্য হারাচ্ছিল। শব্দ করে চেয়ারটা টেবিলের কাছে টানল। ঘড়ি দেখছে ঘনঘন, যেন এক্ষুনি তার প্লেনট্রেন কিছু ছেড়ে যাবে।

কেজরিওয়াল শুকনো মুখে বেরিয়ে যেতেই অনিন্দ্য হাঁই হাঁই করে উঠল,—আমাকে এরকম একটা চিঠি দেওয়ার মানে কী?

বি বি-র শান্ত মুখচোখ আচমকাই শক্ত হয়ে গেছে। গলা ভারী করে বললেন ,—অর্ডারের ল্যাংগুয়েজটা কি আনক্লিয়ার?

—আমি জানতে চাইছি কেন আমাকেই দুর্গাপুর পাঠানো হচ্ছে?

—স্ট্রেঞ্জ! তুমি কি কৈফিয়ত চাইছ নাকি? অফিস ডেকোরাম জান না? তোমার লাস্ট কাজটা ভাল লেগেছিল বলে আমি তোমাকে রেকমেন্ড করলাম, আর তুমি আমাকেই এসে তড়পাচ্ছ?

ও, বি বি-ই তাহলে নাটের গুরু? খচড়ামিটা বি বি-ই করেছে?

সিদ্ধান্ত মনে মনে নেওয়াই ছিল, দুম করে অনিন্দ্য বলে দিল,—আমি দুর্গাপুর যাচ্ছি না।

—কেন জানতে পারি?

—আমি আপনাকে জবাব দিতে বাধ্য নই। অনিন্দ্যর মুখ বেঁকে গেল, —আমি চাকরি থেকে রিজাইন করছি। ফ্রম দিস ভেরি মোমেন্ট।

— তুমি.....তুমি.....! বি বি হতভম্ব,—ভেবে বলছ?

—পাওনাগণ্ডাটা রেডি রাখবেন। মাসপয়লায় এসে নিয়ে যাব। আমারও ডেটলাইন দিয়ে গেলাম। ওই দোসরা মে।

বলেই আর বসল না অনিন্দ্য। বাদল ভৌমিকের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখখানা উপেক্ষা করে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। খসখস করে লিখল পদত্যাগপত্র, ড্রয়ার খুলে খাম বার করে ভরল সদর্পে। নিজের দু একটা ব্যক্তিগত জিনিস রাখা থাকে ড্রয়ারে। সানগ্লাস, রুমাল, পেন, চাবি, টুকিটাকি কিছু ড্রয়িং অ্যাপারেটাস। ব্রিফকেসে সব পুরে ডাকল বেয়ারাকে, বাদল ভৌমিকের ঘরে পাঠিয়ে দিল খামখানা। আঃ, নিশ্চিন্ত। আরও একটা ওভার শেষ হল।

অফিসের বাইরে এসে অনিন্দ্য বুক ভরে শ্বাস টানল একটা। তাকে জব্দ করতে চেয়েছিল বি বি, মুখের ওপর জব্বর উত্তরটা দেওয়া গেছে। হাহ্, অনিন্দ্যকে প্যাঁচে ফেলতে চাস? এখন বোঝ্ কার সঙ্গে তুই লড়তে এসেছিলি!

বৈশাখের সূর্য চাঁদি ফাটাচ্ছে। চৈত্রের শেষে পরপর বেশ কয়েকদিন কালবৈশাখী এসেছিল, ঝড়বৃষ্টির পর একটু ঠাণ্ডা হয়েছিল প্রকৃতি। গত কয়েকদিনে আকাশ থেকে মেঘ যেন উবে গেছে, রোজই থার্মোমিটারের পারা চড়ছে ওপরে। বাতাস একটা আছে বটে, সেও ভারী শুকনো। ঘাম কম হচ্ছে, কিন্তু পুড়ে যাচ্ছে চামড়া।

সানগ্লাস চোখে ব্রিফকেস হাতে দুলে দুলে হাঁটছিল অনিন্দ্য। রোদ্দুর মাড়িয়ে। কোনও তাড়া নেই, কোনও লক্ষ্য নেই, এ ভারী সুখের সময়। থিয়েটার রোডের মুখে এসে দাঁড়াল একটু। সামনে একটা রেস্টুরেন্ট দারুন বিরিয়ানি বানায়, ঢুকে এক প্লেট খেয়ে নেবে কী?

দোকানে ঢুকে মনের সুখে বিরিয়ানি সাঁটাচ্ছে অনিন্দ্য, হঠাৎ পাশ থেকে ডাক,—আরে, অনিন্দ্য না?

জিন্স্‌টিশার্ট পরা পাশের টেবিলের চাঁপ-পরোটা ভোক্তাকে চিনতে অনিন্দ্যর সময় লাগল দু এক সেকেন্ড। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যাচমেট। যুধাজিৎ।

কলেজে কারুর সঙ্গেই তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না অনিন্দ্যর। সে কারুর সঙ্গে মিশলে তো! পাশ টাশ করার পর সহপাঠীদের এক আধজনের সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়। যুধাজিতের সঙ্গে এই প্রথম।

যুধাজিৎ চোখ নাচিয়ে বলল,—কী খবর? কেমন আছ?

অন্যদিন হলে অনিন্দ্য এড়ানোর ভঙ্গিতে উত্তর দিত, কিন্তু আজ তার মেজাজ শরিফ। কাঁধ নাচিয়ে বলল,—ও ফাইন।.... তোমার কী খবর?

—আমি তো এখন এল্ এ-তে। আই মিন লস এঞ্জেলেস। এম-বি-এতে চান্স পেয়েছিলাম, জামশেদপুরে গিয়ে পড়লাম.....জান তো এখানে একটা ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট আছে......

—জ্যাভেরিয়ান?

—ইয়া। ওখান থেকে ম্যানেজমেন্ট করে ব্যাংগালোরে জব পেয়েছিলাম। ওরা একটা প্রোজেক্টে আমায় ঘানায় পাঠিয়েছিল। সেখানেই এক মাল্টিন্যাশনাল ডেকে নিল। অ্যান্ড দেন আই ফ্লু ফর আলাবামা। তারপর এখন ওদেরই একটা কাজে মাস ছয়েক হল এল্-এ তে আছি।

—ও।

অনিন্দ্যর গুলিয়ে যাচ্ছিল। শিবপুর থেকে জামশেদপুর ব্যাংগালোর ঘানা আলাবামা লসএঞ্জেলেস.....মাত্র তিরিশ বছর বয়সে অনেকটা দুনিয়া তো চরে ফেলেছে যুধাজিৎ! অথচ জয়েন্টে যুধাজিতের পজিশন অনিন্দ্যর চেয়ে নীচে ছিল, অনিন্দ্যর স্পষ্ট মনে আছে। এও তো এক ধরনের চক্রান্ত! কেন যুধাজিৎরাই এই সব সুযোগগুলো পায়? কেউ যাবে লসএঞ্জেলেস, আর কারুর কপালে দুর্গাপুর?

যুক্তিগুলো যে আদৌ ঠিক নয়, তার যে পরিশ্রমেই অনীহা, এই সামান্য সত্যটুকুও সুস্থ মাথায় বিশ্লেষণ করে দেখার ক্ষমতা নেই অনিন্দ্যর। একা থেকে থেকে তার মধ্যে এক ধরনের পরশ্রীকাতরতাও জন্ম নিয়েছে। কমপ্লেক্সও।

যুধাজিৎ হাসছে,—তোমায় আগে খেয়াল করি নি, তাহলে তো এক টেবিলেই বসতে পারতাম। যাব? বলেই সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে প্লেট তুলে নিয়ে এসে বসল সামনে। হাসি চওড়া করে বলল,—পুরনো ব্যাচমেটদের দেখলে যা আনন্দ হয় না। আশিস কোথায় আছে জান?

—নাহ্।

—শুভঙ্কর? .....ও তো এম-ই করছিল?

—বলতে পারব না ঠিক।

—তুমি কী করছ?

অনিন্দ্য একটা ঢোঁক গিলল। গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল,—আমিও তো এখন বাইরে।

—তাই নাকি? কোথায়?

—ইয়োকোহামা। আই মিন জাপান। এখানে একটা কন্সট্রাকশান কোম্পানিতে কাজ করছিলাম, তাদের সঙ্গে এক জাপানি মাল্টিন্যাশনালের কোল্যাবরেশান হল.....তার পরই আমি ওদের ওখানে....! কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পেরে অনিন্দ্য বেশ আত্মপ্রসাদ

অনুভব করল। মাটনের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে বলল,—তুমি কি এখন ছুটিতে?

—ওই আর কি। বোনের বিয়ে অ্যাটেন্ড করতে এসেছিলাম, এক ঢিলে দুটো পাখি মেরে দিচ্ছি। চোখ টিপল যুধাজিৎ,—বাবা মা লম্বা লিস্ট করে রেখেছিল, ঝপাঝপ মেয়ে দেখে যাচ্ছি। পছন্দ হয়ে গেলে ডিসেম্বরে এসে বিয়েটা সেরে ফেলব।.....হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? তুমি বিয়ে করেছ?

—ও শিওর। অনিন্দ্য যুধাজিতের ভঙ্গিতেই উত্তর দিল,—ইনফ্যাক্ট, বউকে নিয়ে যেতেই তো এবার আমার ক্যালে আসা।

—ভেরি গুড। বিদেশে কি একা একা থাকা পোষায়? ইউ নিড সামওয়ান এল্‌স।

আরও খানিকক্ষণ খাজুরা চালাল যুধাজিৎ। অনর্গল প্রশ্ন হানছে অনিন্দ্যর জাপানবাস নিয়ে। কত মাইনে পায় অনিন্দ্য, কী রকম জায়গায় থাকে, গাড়ি কিনেছে কিনা, কোন মডেলের গাড়ি, কী কী অ্যাটাচমেন্ট আছে গাড়িতে, জাপানে ওয়ার্ককালচার এখন কেমন, হেন তেন। অনিন্দ্য মনের ভাবই বেশিক্ষণ গোপন রাখতে পারে না, কাঁহাতক সে গুল মারে!

যুধাজিতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল অনিন্দ্য। ক্ষণিকের জন্য মনে হল, মিথ্যেগুলো ধরা পড়ে যায়নি তো? জাপানে চাকরি করে, অথচ কলকাতার রাস্তায় ব্রিফকেস হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও তো তোতলাচ্ছিল মাঝে মাঝে, নির্ঘাৎ সন্দেহ হয়েছে যুধাজিতের। ধুস্, অনিন্দ্যর তাতে বয়েই গেল। সেও তো ধরে নিতে পারে যুধাজিৎ তাপ্পি মারছিল। লসএঞ্জেলেস থাকে, এদিকে থিয়েটার রোডের একটা থার্ড গ্রেড রেস্টুরেন্টে বসে পরোটা চিবোচ্ছে, এ'ও কি বিশ্বাসযোগ্য? সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কেউ লসএঞ্জেলেসে গেছে.....গত দশ বছরে শোনে নি অনিন্দ্য! একেই কি বলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি?

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে অনিন্দ্য নিজের মনে হেসে নিল একটুক্ষণ। সময় কেটেছে খানিকটা, কিন্তু এবার সে করবেটা কী? শরণ্যা কি বাড়ি ফিরেছে এখন? না এলেও পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এসে যাবে নিশ্চয়ই। ততক্ষণ ঘরে কম্পিউটার খুলে বসাই যায়। অনেকদিন চ্যাট রুমে ঢোকা হয়নি, দেখতে দেখতে দু তিন ঘণ্টা কেটে যাবে।

ইন্টারনেটে চ্যাট করা কিছুদিন আগেও নেশার মতো ছিল অনিন্দ্যর। সে কখনও ভয়েস চ্যাট করে না, একটা বড়সড় চ্যাট রুমে অজস্র মানুষ অক্ষরের আঁচড়ে ভাব জমাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে—সেদিকে তাকিয়ে থাকতেই ভারী ভাল লাগে তার। মনে হয় একটা ভিড়ে মিশে আছে একা হয়ে। তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সে নজর রাখছে সবার ওপর। ক্বচিৎ কখনও একটা দুটো বাক্য টাইপ করে দেয় কোথাও কোথাও, এন্টার মেরে উৎসুক চোখে দেখে কেউ তার কথার জবাব দিল কিনা। যদি কেউ দৃষ্টি ফেরায়, সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দ্য নীরব।

শরণ্যার জন্য আজকাল আর অনিন্দ্যর চ্যাটে বসা হয় না। শরণ্যার অপছন্দ বলে নয়, শরণ্যা খেলাটার মজা পেয়ে গেছে বলেই পিছিয়ে এসেছে অনিন্দ্য। এত সহজে শরণ্যা চ্যাট রুমে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে। ইচ্ছে মতো এক আধজনকে ডেকে নেয় ব্যক্তিগত আলাপে, অচেনা বন্ধুর সঙ্গে অক্ষরমিতালির নেশায় মেতে ওঠে—অসহ্য লাগে অনিন্দ্যর। পাশে অনিন্দ্য থাকতে কেন শরণ্যা অন্য কারুর সঙ্গে মজে যাবে? ধুস্ শালা, তার চেয়ে বরং খেলাটাই বন্ধ থাক।

এখন শরণ্যা বাড়ি নেই। সম্ভবত। ইন্টারনেট খুলে এখন অনিন্দ্য মাঠে নেমে পড়তেই পারে। নাকি শরণ্যার অফিসে চলে যাবে? হঠাৎ গিয়ে চমকে দেবে শরণ্যাকে? বলবে, তোমাকে নিতে এলাম?

দ্বিতীয় বাসনাটাই অনিন্দ্যর বেশি মনে ধরল। একটু আগে প্রায় এরকমই একটা কথা সে বলেছিল না যুধাজিৎকে?

শুভ্র ঘাড় গুঁজে একটা জার্নাল গিলছিল। তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। মাঝে মাঝেই তার আঙুল দুটো উঠে আসছে ঠোঁটে, নীলচে ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে চেতনার ছোট্ট ঘরখানা। ঘাড় না তুলেই সিগারেটের শেষটুকু অ্যাশট্রেতে চাপল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরিয়ে ফেলেছে পরবর্তী সিগারেট। ধূমপান ছাড়া শুভ্র পড়াশুনোয় মনঃসংযোগই করতে পারে না।

তামাকের ধোঁয়ায় কষ্ট হচ্ছিল শরণ্যার। খুকখুক কাশছে। লেখা থামিয়ে কটমট চোখে শুভ্রকে দেখল,—এটা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

শুভ্র যেন ঠিক শুনতে পেল না। বলল,—উঁ? কিছু বলছিস?

—বলছি সারা দিনে ক'প্যাকেট হল? প্যাসিভ স্মোকিং-এ এবার আমার লাঙ্‌স যে ফুটো হয়ে যাবে।

শুভ্র এক হাত জিভ কাটল,—ওহো, সরি সরি। আমি একদম খেয়াল করিনি।

—সরি বললেই বুঝি দোষ কেটে যায়?

—নাকখত দেব? কান মুলব? যা বলবি তাই করতে রাজি।

শরণ্যার হাসি পেয়ে গেল। এ কদিন ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করার সুবাদে বুঝে গেছে শুভ্রর ওপর সিরিয়াসলি রাগ করা কঠিন। সর্বক্ষণ ফাজলামি করে গেলেও শুভ্রর মধ্যে একটা অন্য ধরনের তন্ময়তাও আছে। পড়াশুনোর সময়ে শুভ্র যেন একদম অন্য মানুষ। কী বলছে, কী করছে কোনও হুঁশ নেই। এই যে এতবার করে সরি সরি বলছে অথচ হাতে সিগারেটটি জ্বলছেই এখনও।

শরণ্যা গলাটাকে ইচ্ছে করে ভারী করল,—শাস্তি তো পরে হবে। আগে অন্তত হাতেরটা তো নেবা।

—দেখেছ কাণ্ড! শুভ্র ফের জিভ কাটল। অ্যাশট্রে উপচে পড়ছে পোড়া টুকরোয়, চেপে চেপে হাতের সিগারেটখানা গুঁজে দিল ছাইদানে। মুচকি হেসে বলল,—আমার দু গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারা উচিত। এতগুলো শিওর শট কেঁচে গেল, তাও এখনও শিক্ষা হল না!

শরণ্যা ভ্রূকুটি করল,—মানে?

—সবই তো জানিস। কেন লজ্জা দিস? কোন মেয়ে কিসে পটে সেটা পরে জানলেও চলে। আগে জানা দরকার সে কী কী ডিসলাইক করে। স্রেফ এইটুকুনি পারলাম না বলেই তো আজ আমার এই দুর্গতি।

—ফের ভাট বকছিস?

—আমার কেসহিস্ট্রিগুলো জেনেও আমার ওপর তোর করুণা হয় না? দেবলীনা চলে গেল, মধুরিমা কেটে গেল, সুদক্ষিণা উড়ে গেল, সবই তো এই সিগারেটের ধোঁয়ায়।

শরণ্যাকেও কি দেবলীনা টেবলীনাদের পঙক্তিতে ফেলছে শুভ্র? উহুঁ, ছেলেটার মুখচ্ছবি তো তা বলে না। শুভ্র যে শরণ্যার প্রতি কোনও অশোভন ইঙ্গিত করছে না এ বুঝি হলফ করে বলা যায়।

শরণ্যা চোখ পাকাল,—অ্যাই, তোর ব্যর্থপ্রেমের ডাব্বাটা বন্ধ কর তো। আর এখন থেকে ঘরে নো সিগারেট। নেশা চাপলে বাইরে চলে যাবে। সোজা রাস্তায়।

—যো হুকুম ম্যাডাম। আই প্রমিস।

—এই নিয়ে ছ' বার প্রমিস হল।

—আই প্রমিস টু ব্রেক দেম। চার্চিলের উক্তিটা আউড়ে দিল শুভ্র। হ্যা হ্যা করে হাসছে। —প্রতিজ্ঞা না ভাঙলে প্রতিজ্ঞার মূল্য কী বল?

একটু রঙ্গরসিকতা করেই কাজে মনোযোগী হয়েছে শুভ্র। জার্নালের যে প্রবন্ধটা পড়ছিল এতক্ষণ, সেটা প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাচ্ছে শরণ্যাকে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, বিশেষত ভারতে, লিঙ্গ পক্ষপাতের কারণ সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন চিন্তাভাবনা আছে লেখাটায়। শরণ্যা মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছিল। মাঝে মাঝেই একটা শারীরিক অস্বস্তি এসে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে মগজটাকে, গাগুলনো ভাবটা ফিরে আসছে আবার।

শুভ্র কথা বলতে বলতে থেমে গেল,—তোর কি শরীর খারাপ লাগছে?

শরণ্যা আড়ষ্টভাবে মাথা নাড়ল,—তেমন কিছু নয়। বল্।

—উহুঁ, মুখচোখ তো ভাল নয়। গরমে কষ্ট হচ্ছে? ঘাড়ে মাথায় জল ছিটিয়ে আসবি?

—না না, ঠিক আছি।

—নাহ্, বিয়ে থা হয়েও তুই সাবালিকা হলি না। আমরা কি আর ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আছি? উই আর কলিগ্‌স নাউ, একসঙ্গে একটা কাজ করছি। তোর কোনও সমস্যা হলে আমায় বলবি, আমার কোনও প্রবলেম হলে আই উইল আস্ক ফর এ সাজেশান ফ্রম ইউ। পরশু আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমি তোর কাছ থেকে স্যারিডন চেয়ে নিইনি?

—আহা, বলছি তো তেমন কিছু নয়। শরণ্যা অপ্রতিভভাবটা কাটাতে এদিক ওদিক তাকাল,—জলের জগটা কোথায় গেল রে?

—তেষ্টা পেয়েছে? জল খাবি? বললেই তো হয়। শুভ্র ব্যস্ত ভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে,—এক সেকেন্ড। নিয়ে আসছি। মিস্টার কামুক সেই যে কখন ঠান্ডা জল ভরে আনছি বলে নিয়ে গেল....

শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্যটা ভুলে হেসে ফেলল শরণ্যা। ধীমানবাবুর একটা নামকরণ করেছে বটে শুভ্র। প্রথম দিন ধীমান ঘোষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময়ে পি-এস-বি বলেছিলেন, মীট ধীমান, ইনিই এখানকার সব। সেক্রেটারি কাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কাম অ্যাকাউন্ট্যান্ট কাম ক্যাশিয়ার কাম লিয়াজঁ অফিসার কাম ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট....। শুভ্র কানে কানে বলেছিল, ইয়েস, হি ইজ ফুল অফ কাম। মিস্টার কামুক। বেচারা ধীমানবাবু!

চেতনার অফিস একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে খুদে খুদে দুখানা ঘর, মাঝারি সাইজের হল, রান্নাঘর বাথরুম ব্যালকনি মিলিয়ে জোর সাড়ে ছ'শো স্কোয়ার ফিট। একটা ঘরে কাজ চলছে প্রোজেক্টের, অন্যটা চেতনার কর্তাব্যক্তিদের। অফিসটা হলঘরে। মাঝে মাঝে চেয়ার ভাড়া করে এনে হলে সেমিনারও হয় চেতনায়। দেশি বিদেশি অনেক জ্ঞানীগুণীজন আসেন তখন, প্রধানত আর্থসামাজিক সমস্যা নিয়েই মত বিনিময় করেন তাঁরা। ধীমানকে যে নামেই ডাকা হোক, ধীমানই চেতনার মূল সংগঠক।

রোগাসোগা নিরীহ চেহারার চশমা পরা ধীমান সারাদিন ব্যস্ত থাকে কম্পিউটার আর টেলিফোনে, তার টেবিল থেকে জলের জগ নিয়ে এল শুভ্র। সঙ্গে একটা সুসংবাদও। শুভ্র আর শরণ্যার রেমিউনারেশান বিল রেডি, কাল ফার্স্ট আওয়ারেই চেক মিলে যাবে। তবে এটা গত মাসের টাকা। প্রথমবার বলে পেতে দেরি হল, সামনের মাস থেকে প্রথম সপ্তাহেই পৌঁছে যাবে।

শরণ্যার মুখে হাসি ফুটে উঠল,—কত পাচ্ছি রে?

—তোর আঠেরো দিনের টাকা, আমার পঁচিশ দিনের। এবার ক্যালকুলেটারে ফেলে দে। .....আমার তো মনে হয় ছয় সাড়ে ছয় মতন হবে....না না, প্রায় সাত হাজার।

শরণ্যা চোখ টিপল,—নট ব্যাড, অ্যাঁ?

—হুম। নেইমামার চেয়ে তো কানামামা ভাল। অ্যাটলিস্ট মা তো খানিকটা রিলিভড হবে।

শুভ্রর পারিবারিক অবস্থার কথা শরণ্যা এখন জানে মোটামুটি। বাবা নেই শুভ্রর। মারা গেছেন শুভ্রর এম-এ ফাইনালের ঠিক আগে আগে। ব্রেন ক্যানসার। বেশিদিন আর চাকরি ছিল না শুভ্রর বাবার, অফিস থেকে যা প্রাপ্য হত তার প্রায় সবটাই চলে গিয়েছিল তাঁর চিকিৎসায়। ভাঁড়ার শূন্য বলে ইদানীং বড় টেনশানে থাকেন শুভ্রর মা। পড়াশুনো শেষ করেও ছেলে চাকরি পাচ্ছে না, তাই নিয়েও তাঁর দুশ্চিন্তা কম নয়। শুধু কয়েকটা টিউশ্যনি করত শুভ্র, তাতে আর কীই বা হয়! যাক, এতদিনে শুভ্রর কাঠবেকার দশা তো কাটল।

শরণ্যা মাথা নেড়ে বলল,—কিন্তু প্রোজেক্টের কাজ তো টেম্পোরারি রে। আজ বাদে কাল শেষ হবে। তার পর?

—দাঁড়া, সবে তো শুরু হল। এখনই শেষের চিন্তা?

—তবু কী করবি না করবি তার তো একটা প্ল্যান ছকবি।

—কী কী করব না ঠিক করে ফেলেছি। কলেজে পড়াব না, রিসার্চ করব না.... মে বি আইল্ বি সিটিং ফর আই-ই-এস্.... অর্ এনি সর্ট অফ জব.....

কথার মাঝেই কলিংবেলের শব্দ। মুহূর্ত পরেই ধীমান চেঁচিয়ে ডাকছে,—শরণ্যা, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।

অবাক হল শরণ্যা। দরজায় গিয়ে আরও অবাক। অনিন্দ্য!

অনিন্দ্য উঁকি দিচ্ছে ভেতরে,—এই তোমাদের অফিস?

—হ্যাঁ। শরণ্যা মাথা নাড়ল,—তুমি হঠাৎ?

—সারপ্রাইজ দিতে এলাম।... চেয়ার টেবিল লোকজন কিছু দেখছি না তো?

—আমাদের খুব ছোট্ট ব্যাপার। অত কিছু না হলেও চলে। শরণ্যা টানল অনিন্দ্যকে, —এসো না, ভেতরে এসো।

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখছে অনিন্দ্য। শরণ্যা ধীমানের সঙ্গে অনিন্দ্যর আলাপ করিয়ে দিল। তারপর নিয়ে এসেছে ছোট ঘরটায়, —এই দ্যাখো, এই হচ্ছে শুভ্র। শুভ্র দাশগুপ্ত। আমার কলিগ।

শুভ্র উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল, —আপনার পরিচয় দিতে হবে না। আপনি নিশ্চয়ই দেবাদিদেব মহাদেব? আই মিন মিস্টার শরণ্যা?

রসিকতাটা বুঝল না অনিন্দ্য। বলল, —না, আমি অনিন্দ্য মুখার্জি। শরণ্যা আমার ওয়াইফ।

—আমিও তো তাই বলছি। মহাদেব তো শরণ্যা অ্যালিয়াস মাদুর্গার হাজব্যান্ড।

—ও।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। প্লিজ।

—নো থ্যাংকস। বলেই অনিন্দ্য শরণ্যার দিকে ফিরেছে, —চলো, আজ একসঙ্গে বাড়ি ফিরব।

—এক্ষুনি? শরণ্যা অপ্রস্তুত, —দাঁড়াও তাহলে। কম্পিউটারে কয়েকটা ডাটা দিয়েছি, সেভ করে নিই।

—কতক্ষণ লাগবে?

শুভ্র পাশ থেকে বলে উঠল, —বসুন না একটু। চা টা খান। ইউ আর আওয়ার অনারড গেস্ট।

—নো থ্যাংকস। ...শরণ্যা, তুমি তাড়াতাড়ি সারো।

শরণ্যা কম্পিউটারের মাউসে আঙুল রাখল। কী-বোর্ড টিপছে, মাউস নাড়ছে, কাজ করছে দ্রুত। শুভ্র আলাপ জমানোর চেষ্টা করছে অনিন্দ্যর সঙ্গে, হুঁ হাঁ করে দায়সারা গোছের উত্তর দিচ্ছে অনিন্দ্য। শরণ্যার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। শুভ্রর গল্প খুব একটা করেনি অনিন্দ্যর কাছে, মনে মনে অনিন্দ্য কিছু ভেবে নিচ্ছে না তো? শুভ্রই বা কী ভাবছে অনিন্দ্যকে? রামগরুড়? হুঁকোমুখো?

শুভ্র বুদ্ধিমান ছেলে। বুঝে নিয়েছে অনিন্দ্য মোটেই মিশুকে নয়। মানেমানে কেটে পড়ল ঘর থেকে। সম্ভবত সিগারেট খেতে গেল, ব্যালকনিতে।

শরণ্যাও কম্পিউটার অফ করে বেরিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। অনিন্দ্যর পাশে পাশে হাঁটছে। অনিন্দ্যকে চুপচাপ দেখে নিজেই কথা শুরু করল,—তুমি আজ অফিস থেকে এত আগে বেরিয়ে পড়েছ যে?

অনিন্দ্য টেরচা চোখে তাকাল, —তোমার কলিগটা খুব বাচাল তো?

শুভ্র তো চিরকালের ফাজিল, বলতে গিয়েও সামলে নিল শরণ্যা। আগে থেকেই সে শুভ্রকে চেনে, বলার কী দরকার!

গলায় মেকি বিরক্তির প্রলেপ মাখিয়ে শরণ্যা বলল, —হ্যাঁ, বড্ড বকে। মাথা ধরিয়ে দেয়।

—তুমি ওর সঙ্গে কাজ করো কী করে?

—পৃথিবীতে কত কিসিমেরই তো মানুষ থাকে, একটু মানিয়ে গুনিয়ে নিতে হয় আর কি।

জবাবটায় অনিন্দ্য বেজায় খুশি। বলল, —একটা ট্যাক্সি ধরি?

—তাহলে তো ভালই হয়। আমার শরীরটা আজ ঠিক নেই।

—কেন?

—বলছি না ক'দিন ধরে, বমি বমি লাগছে, মাথা ঘুরছে...

অনিন্দ্য ভাল করে শুনলই না। পাশ দিয়ে একটা হলুদকালো যাচ্ছিল, দৌড়ে গিয়ে পাকড়েছে ড্রাইভারকে। ডাকল, —অ্যাই, চলে এসো।

ট্যাক্সিতে বসে ঘাড় পিছনে এলিয়ে দিল শরণ্যা। চোখ বুজেছে। বেশ কিছুদিন ধরে যে আলোড়নটা উঠছে শরীরে, তার কারণ এখন শরণ্যার কাছে মোটামুটি পরিষ্কার। মাসের দু তারিখে পিরিয়ড হওয়ার কথা ছিল, চব্বিশ তারিখ হয়ে গেল...। নির্ঘাৎ আসছে কেউ। আসছে। ভাবতে কেমন লাগছে শরণ্যার? সে কি চিন্তিত? উদ্বিগ্ন? নাকি আহ্লাদিত? মা হওয়ার অনুভূতি এখনও সেভাবে জাগেনি ভেতরে; শুধু একটা অস্বস্তি... এমনটাই কি হয় প্রথম প্রথম? তারপর ধীরে ধীরে গোটা বুকে ছেয়ে যায় সেই অচেনা প্রাণ? খবরটা বাবা মাকেও জানানো হয় নি। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। এমনটাও কি হয়?

জ্যামে ঠোক্কর খেতে খেতে এগোচ্ছে ট্যাক্সি। ত্রিকোণ পার্কের কাছে এসে একদম দাঁড়িয়ে গেল। নট নড়ন চড়ন। সামনে বাস মিনিবাস ট্যাক্সি প্রাইভেটকারে জট পাকিয়ে গেছে, ফাঁক দিয়ে ইঁদুরের মতো গলে গলে যাচ্ছে অটো আর দ্বিচক্রযান।

অনিন্দ্য বিরস মুখে বলল, —ধুস্, এইটুকু পথ হাঁটলেই হত।

শরণ্যা সাড়া দিল না।

অনিন্দ্য ঠেলল, —অ্যাই, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

শরণ্যা চোখ খুলল, —না তো।

—তোমায় একটা খবর দেওয়ার ছিল। আজ চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।

শরণ্যা ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হল,—যাহ্!

—ইয়েস। পোষাচ্ছিল না। দোজ বাগারস ভেবে নিয়েছিল অনিন্দ্য মুখার্জি ওদের কেনা গোলাম, দিয়েছি আজ মুখের উপর রেজিগনেশান ছুঁড়ে।

শরণ্যা হাঁ। খানিক পরে কথা ফুটল, —এখন কী হবে?

— কী আবার হবে? অন্য একটা চাকরি খুঁজব।

—কিন্তু...

—অত ভাবছ কেন? আরে বাবা, আমি তো টাকা ওড়াই না, ব্যাংকে আছে কিছু। অনিন্দ্য আলগা ভাবে হাত চড়িয়ে দিল শরণ্যার কাঁধে। গদগদ মুখে বলল, —তাছাড়া আমার বউ-এর তো এখন একটা ইন্‌কাম আছে, না কী?

অনিন্দ্যর এমন মনোভাবে শরণ্যার তো গর্বিত হওয়া উচিত। কটা বর হুট করে বেকার হয়ে গিয়েও বউ-এর রোজগার আছে বলে এমন প্রফুল্ল থাকতে পারে? এতটুকু কমপ্লেক্স আসছে না অনিন্দ্যর, এটা নিশ্চয়ই একটা বড় গুণ। আর শরণ্যা তো এখন অনিন্দ্যর গুণগুলোকেই খুঁজছে।

তবু মনটা খচখচ করছে। সামান্য ইতস্তত করে শরণ্যা বলেই ফেলল, —কিন্তু আমার টাকা তো এখন একটু আনসার্টেন হয়ে যাবে।

—কেন?

—রেগুলার কি যেতে পারব বেশিদিন? চেতনা হয়তো তখন...

—কেন যেতে পারবে না?

—আহা, বুঝছ না? শরণ্যা মুখ টিপে হাসল,—বললাম যে গা গুলোচ্ছে, মুখে রুচি নেই, মাথা ঘুরছে..

—তো?

—সত্যিই তুমি বুঝতে পারছ না? মেয়েদের কখন এসব হয় জান না?

—কখন হয়?

—ওরে আমার বোকারাম হাঁদারাম...। শরণ্যা খিলখিল হেসে উঠল। ট্যাক্সিড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে ফিসফিস করে বলল, —আমি প্রেগন্যান্ট, বুঝেছেন স্যার? তুমি বাবা হতে চলেছ।

অনিন্দ্য যেন মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। পরক্ষণে তার মুখ থেকে যেন রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ।

শরণ্যা বিস্মিত মুখে বলল, —কী হল? তুমি খুশি হও নি?

অনিন্দ্য বিড়বিড় করে বলল, —কী করে হল?

—নেকু। জান না কী ভাবে হয়?

—তুমি প্রিকশান নাও নি?

—নেওয়া হয় নি। একদিক থেকে তো ভালই হয়েছে। মা বলে, কম বয়েসেই এসব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট চুকে যাওয়া ভাল।

অনিন্দ্য গুম হয়ে গেল। সারাটা পথ টুঁ শব্দটি নেই। বাড়ি এসেও মুখ কালো করে শুয়ে আছে বিছানায়। শরণ্যার শত ডাকাডাকিতেও উঠে চা জলখাবার ছুঁল না। রাতের খাবারও না।

অনিন্দ্যর অদ্ভুত আচরণের মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছিল না শরণ্যা। চাকরি ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান-আগমনের সংবাদ পেয়ে অনিন্দ্য কি খুব বেশি বিচলিত হয়ে পড়ল? হয়তো ভাবছে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো চাকরি ছাড়াটা তার মুর্খামি হয়ে গেছে! নাকি অনিন্দ্য এখন বাচ্চা চায় না? এখন চায় না, নাকি কোনওদিনই চায় না? বাবা মার ছেঁড়াছেঁড়া সম্পর্কের মাঝে পড়ে ছোটবেলাটা বড় যন্ত্রণায় কেটেছে অনিন্দ্যর। এ কি তারই কোনও বিকৃত প্রতিক্রিয়া? হতেই পারে। অনিন্দ্যদের বাড়ির সবাইই তো একটু অদ্ভুত ধরনের।

শরণ্যা আর বেশি খোঁচাখুঁচি করল না। নিজের কাজ নিয়ে বসল কিছুক্ষণ, তারপর শুয়েও পড়ল তাড়াতাড়ি। ক্লান্ত লাগছিল।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। রাতবাতির মৃদু আলোয় শরণ্যা দেখল অনিন্দ্য পায়চারি করছে ঘরে। মাঝেমাঝে এসে বসছে খাটে, উঠছে, আবার হাঁটছে।

শরণ্যার চোখ বড় বড়, —একী? তুমি শোও নি?

শরণ্যার গলা পেয়ে ঝট করে ঘুরেছে অনিন্দ্য। দু-এক সেকেন্ড। হঠাৎই ঝাঁপিয়ে এসেছে বিছানায়। শরণ্যার মুখের ওপর ঝুঁকে বলল,—শোনো, অ্যারবশন করো বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দাও।

—যাহ্। শরণ্যা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, —কেন করব অমন কাজ? আমাদের প্রথম বাচ্চা...! অসম্ভব। তা হয় না।

—কেন হয় না? কেন হয় না? অনিন্দ্যর মুখচোখ হিংস্র সহসা। ক্রুর গলায় বলল, —আমাদের মাঝখানে আর কেউ আসবে না। কেউ না।

আট

সরকারি দপ্তরটিতে আজ সাজো সাজো রব। দেশীয় এক কম্পিউটার কোম্পানি থেকে জনা তিনেক ঝকঝকে তরুণ এসেছে, যন্ত্রগণক বসাচ্ছে ডিরেক্টর ডেপুটি ডিরেক্টরদের ঘরে। অত্যুৎসাহী কর্মচারীরা উঁকিঝুঁকি মেরে আসছে ঘন ঘন, বেসরকারি কর্মকাণ্ড দেখতে সরকারি কাজ আজ শিকেয়। উচ্চৈস্বরে আলাপচারিতা চলছে গোটা দপ্তরে। সর্বত্র একটিই আলোচ্য বিষয়— কম্পিউটার। যাক, অ্যাদ্দিনে তবে ঘুম ভাঙছে সরকারের! সরকারি অফিস আধুনিক হচ্ছে!

নিবেদিতা রীতিমতো অধৈর্য বোধ করছিলেন। বিশ মিনিটের ওপর ঠায় বসে আছেন, বড়বাবুর টিকিটি নেই। সেই যে তিনি আসছি বলে সেঁধিয়ে গেলেন ডেপুটি ডিরেক্টরের ঘরে...! কতক্ষণ আর তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করবেন নিবেদিতা?

এমনিতেই নিবেদিতার মনটা আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। পরশু থেকে বাড়ি ফিরছে না সুনন্দ। পর পর দু রাত। এমন নয় যে সুনন্দ অতি সুবোধ বালক। প্রতিদিন সে নির্দিষ্ট সময়ে গৃহ হইতে নির্গত হয় এবং যথাসময়ে প্রত্যাগমন করে। সে তো মাঝেমাঝেই ফেরে না। হয় কোনও বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটায়, নয় ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ে যায় কলকাতার বাইরে। কদিন আগেই তো গানের দল নিয়ে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ঘুরে এল। তবে সর্বদাই যাওয়ার আগে একটা অন্তত খবর ছুঁইয়ে যায়। এবার যাওয়াটা অন্য রকম। মেজাজ দেখিয়ে বাবু এবার বিলকুল হাওয়া। পরশুর আগের দিন হুট করে দশ হাজার টাকা চেয়ে বসল নিবেদিতার কাছে। ভীষণ দরকার। দিতেই হবে। আশ্চর্য, অত টাকা কোথ্‌থেকে দেবেন নিবেদিতা? দেবেনই বা কেন? পঁচিশ বছরের ধাড়ি ছেলে, এখনও বাপ-মার হোটেলে বসে খাচ্ছিস আর প্রাণের সুখে খঞ্জনী বাজিয়ে বেড়াচ্ছিস...! অপ্রিয় সত্যি শুনে উলটো আক্রমণ, তুমি কার পয়সায় ড্রেস মেরে বেড়াও? কটা পয়সা রোজগার করেছ জীবনে? উফ্ কী সব মুখের ভাষা! কোথ্‌থেকে যে নিবেদিতার ছেলেরা এত খারাপ করে কথা বলতে শিখল? কেন জন্মেছিলি তোরা? কেন আঁতুড়েই মরে যাসনি?

চিন্তায় ছেদ পড়ল। বড়বাবু ফিরেছেন। এক খালি-গা কিশোর কেটলি হাতে টেবিলে টেবিলে চা দিচ্ছে, হয়তো বা তার টানেই। চেয়ারে বসে কাপে চুমুক দিয়ে অপ্রসন্ন গলায় বললেন, —এখনও বসে আছেন?

নিবেদিতার গলাতেও বিরক্তি ফুটল, —আপনিই তো বলে গেলেন ওয়েট করতে।

—কিন্তু আজ তো কোনও কাজ হবে না।

—কেন?

—দেখছেন না, সবাই কেমন বিজি? কম্পিউটার বসছে।

কম্পিউটার বসার সঙ্গে কাজ বন্ধ হওয়ার কী সম্পর্ক মাথায় ঢুকল না নিবেদিতার। তবে ফস করে কোনও মন্তব্যও করলেন না। বড়বাবু লোকটিকে দরকারে অদরকারে কাজে লাগে। তিনি চটে গেলে সুহাসিনী অসুবিধেয় পড়তে পারে। কোথায় পুট করে কী নোট দিয়ে দেবে, সুহাসিনীর টাকাটাই হয়তো আটকে গেল। আগের ডিরেক্টরের কাছে সোজাসুজি গিয়ে কথা বলতেন নিবেদিতা, বর্তমান যিনি আছেন তিনি বিশেষ আমল দিতে চান না, এই বড়বাবুর কাছেই ঠেলে দেন।

কোষ্ঠকাঠিন্যের রুগীর মতো মুখঅলা বছর পঞ্চান্নর বড়বাবুকে আলগা জরিপ করে নিলেন নিবেদিতা। নরম গলাতেই বললেন, —আমার ছোট্ট কাজ। রুটিন জব। অ্যানুয়াল গ্রান্টের অ্যাপ্লিকেশন আর এস্টিমেটটা খালি জমা করব।

—অ। তা দিয়ে দিন রিসিভিং-এ।

— কিন্তু আপনার সঙ্গেও যে একটু কথা ছিল।

আমাদের মাঝখানে আর কেউ আসবে না। কেউ না

—বলুন। চটপট।

—লাস্ট ইয়ার আমাদের গ্রান্ট একটু কম স্যাংশান হয়েছে...মানে তার আগের বছরের থেকে হাজার পঁচিশেক বাড়াতে বলেছিলাম...ডিরেক্টর সাহেব আমায় কথাও দিয়েছিলেন হয়ে যাবে, কিন্তু...

—আমরা আর পেরে উঠছি না, বুঝলেন। চারদিকে এখন শুধু সমাজসেবার হিড়িক, ব্যাঙের ছাতার মতো অরগ্যানাইজেশান গজিয়ে উঠছে। সকলেরই বিরাট বিরাট বুলি, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা...। কত দেব, অ্যাঁ?

বড়বাবুর কথার ভঙ্গিটি যথেষ্ট অমার্জিত। মনে হয় যেন নিজের মাসমাইনে থেকে পুজোর চাঁদা দিচ্ছেন। নিবেদিতা তবু রাগলেন না। ঠাণ্ডা মাথাতেই বললেন, —আমাদের অরগ্যানাইজেশান তো ভুঁইফোড় নয়। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে চলছে। তাছাড়া লাস্ট ইয়ার যিনি ইন্সপেকশানে গেছিলেন, তিনি কিন্তু টাকা বাড়ানোর ফেভারেই নোট দিয়েছিলেন।

—নোট দিলেই তো হবে না, আমাদের অনেক হিসেবপত্র করে চলতে হয়। আপনাদের নাম কুড়োনর দৌলতে আমাদের যে দেউলিয়া হওয়ার দশা। বড়বাবুর মুখে বাঁকা হাসি, —আপনারা আর একটা কী যেন শুরু করতে চলেছেন না?

—হ্যাঁ। বৃদ্ধাশ্রম।

—তার জন্যও তো গ্রান্টের অ্যাপ্লিকেশান করেছেন?

—হুঁ।

—প্রাইভেট ডোনেশানের ওপরই বেশি নজর দিন, বুঝলেন। আমাদের ওপর আর বেশি ভরসা করবেন না।

—আমরা যত দূর সম্ভব তাই করি। বৃদ্ধাশ্রমের জমি আমরা ডোনেশানের টাকাতেই কিনেছি। বাড়ি করার খরচ তো হিউজ, তাই গভর্নমেন্টের কাছে পারশিয়াল হেলপ চেয়েছি একটা। তাও এক্ষুনি নয়। প্ল্যান স্যাংশান হওয়ার পর আমরা নিজেরাই কাজ শুরু করব। আমাদের অগ্রগতি দেখে গভর্নমেন্ট যেটুকু দেওয়া উচিত মনে করবে আমরা সেটুকুতেই কাজ চালিয়ে নেব। সরকারকে ফতুর করা সুহাসিনীর মটো নয়।

শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে উচ্চারিত নিবেদিতার কথাগুলো এতক্ষণে যেন থমকে দিয়েছে বড়বাবুকে। ঈষৎ অপ্রস্তুত গলায় ভদ্রলোক বললেন, —না না, আপনারা তো ভাল কাজই করেন। তবে বোঝেনই তো, ফিনান্স এখন খুব ঝামেলা করছে। দু পয়সার জন্য দু হাজার ফ্যাকড়া তোলে।

—আমি জানি। তবে আপনারা যদি স্পেশালি আমাদের কেস্টা রেকমেন্ড করেন, সুহাসিনীর একটু সুবিধে হয়, নিবেদিতার স্বর আরও ঋজু হল, —ব্যাপারটা কী জানেন? একটা ওয়েলফেয়ার স্টেটে রাষ্ট্রের যে কাজগুলো করা উচিত, আমরা সেই কাজগুলোই করি। আর সেই জন্যই আমরা মনে করি আমাদের জন্য অর্থ ঢালাটা রাষ্ট্রের অপচয় নয়।

বড়বাবু কথাটা যেন ঠিক বুঝলেন না। কিংবা হয়তো বোঝার তাগিদ অনুভব করলেন না। বুঝি বা ভাবলেন মহিলা গায়ে পড়ে তাঁকে কথা শোনাচ্ছেন, জ্ঞান দিচ্ছেন অনর্থক।

নিবেদিতার বাড়িয়ে দেওয়া কাগজগুলো পচা ইঁদুর ধরার ভঙ্গিতে হাতে নিলেন বড়বাবু। তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, —ঠিক আছে, শুনলাম তো সব। দেখি কী করতে পারি।

—আমি কি সামনের মাসে এসে জেনে যাব?

—আসতে পারেন। তবে অ্যালটমেন্ট পেতে পেতে জুলাই। বড়বাবু চোখ সরু করলেন, —এবার যেন কত বাড়াতে বলেছেন?

—ওই পঁচিশ হাজারই। মানে যেটা পাইনি...

—ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট দেওয়া আছে?

—সব আছে। ওই তো অ্যাপ্লিকেশানটা তুলুন, ওর ঠিক নীচেই...

—দেখে নেবখন। ধরে করে ইন্সপেকশানটা আগে করিয়ে নিন। ওই

রিপোর্টটাও লাগবে।

নিবেদিতার মেজাজটা তেতো হয়ে গেল। কী বাদশাহী চালের কথাবার্তা! সরকারি পরিদর্শন তো রুটিন কাজ, তার জন্য নিবেদিতার ধরা করা করতে হবে কেন? অথচ করতে হয়, এটাই দস্তুর। দয়া করে তিনি পদধূলি দেবেন, খোশগল্প করে পছন্দ মতো বাড়িটা আচারটা নিয়ে চলে যাবেন, ধন্য হবে সুহাসিনী! সরকারি প্রতিনিধির তো মাসে অন্তত একটা মিটিং-এ উপস্থিত থাকার কথা, সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে নিয়ম করে চিঠিও পাঠানো হয়, কিন্তু ঠিকঠাক তাঁর দর্শন মেলে কি? সারা বছরে একবারই তিনি আবির্ভূত হন। সেই বার্ষিক সাধারণ সভায়। এমন সব সরকারি কর্মচারিদের ওপর নির্ভর করে তবেই না নিবেদিতাদের সমাজসেবার ব্রত উদ্‌যাপন! দপ্তরের এক নগণ্য কর্মচারিও বুঝিয়ে দেয় নিবেদিতা তার দয়ার পাত্র। ভাল লাগে?

ধীর পায়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন নিবেদিতা। লিফ্ট খারাপ, নামতে হল সিঁড়ি বেয়ে। বড্ড গরম আজ, এইটুকুতেই নিবেদিতা ঘেমে নেয়ে একসা। গাড়িতে বসেও রেহাই নেই, সিটটি আগুন হয়ে আছে তাপে। জৈষ্ঠ্যের সূর্য নিষ্ঠুর তেজে ঝলসাচ্ছে শহরটাকে। খোলা জানলা দিয়ে ঝাপটে আসছে লু।

নিবেদিতার তেষ্টা পাচ্ছিল। অন্যমনস্ক হাত ঘোরাফেরা করল সিটে। ইশ, ভুল হয়ে গেছে, জলের বোতলটা আজ নেওয়া হয়নি। সুরেনের কাছে নিশ্চয়ই জল আছে। চাইবেন? ড্রাইভারের জল খেতে নিবেদিতার কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু সুরেন অস্বস্তিতে পড়ে যাবে না তো?

সামান্য ইতস্তত করে চেয়েই ফেললেন, —তোমার জলের বোতলটা একটু দাও তো।

গরমে সুরেনও বেশ কাহিল। শার্টের কলার ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে পিঠের ওপর, বাঁ হাতের তোয়ালে-রুমালে ঘন ঘন মুখ মুছছে। স্টিয়ারিং থেকে অল্প ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, —আমার জল কি খেতে পারবেন? হেববি গরম হয়ে আছে।

—দাও একটু। গলা ভিজিয়ে নিই। সুহাসিনীতে গিয়ে নয় একটা বোতল কিনে নেব। ঠাণ্ডা জলের। এখন পথে আর দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না।

লাল শালুতে মোড়া নিজের বোতলখানা সন্তর্পণে বাড়িয়ে দিল সুরেন। দু ঢোক খেয়ে বোতলটা পাশেই রাখলেন নিবেদিতা। ফস করে প্রশ্ন করলেন, —তোমাদের পাড়ায় সুনন্দর এক বন্ধু থাকে না? ঝাঁকড়া চুল? ফর্সা মতন?

সুরেনের চোখ পলকে রেয়ারভিউ মিররে। বুঝি বা পড়ে নিতে চাইল প্রশ্নটাকে। আয়নায় চোখ রেখেই বলল, —ছোড়দা ওখানে যায়নি মাসিমা।

—কী করে জানলে?

—কাল সন্ধেবেলা ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললাম ছোড়দা বাড়ি ফেরেনি, শুনে কাঁধ উলটে চলে গেল।

কী সব বন্ধুবান্ধব! বন্ধু বাড়ি ফেরেনি জেনেও ভ্রূক্ষেপ নেই? নাকি এটাই এখনকার ধারা? যে যার তালে ঘোরে, সঙ্গে থাকার সময়টুকু ছাড়া কেউ কারওর খোঁজ রাখে না!

বেজার মুখে নিবেদিতা বললেন, —ছোড়দার আর কোনও বন্ধুটন্ধুকে চেনো?

—পথেঘাটে অনেককেই তো দেখি ছোড়দার সঙ্গে। কিন্তু তাদের বাড়িটাড়ি তো...

—হুম।

নিবেদিতা আর কিছু প্রশ্ন করলেন না। ক্ষণিকের জন্য মনে হল মা হিসেবে সুনন্দর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর আর একটু অবহিত থাকা উচিত ছিল। হয়তো তিনি বৃথাই দুশ্চিন্তা করছেন, সুনন্দ হয়তো গানের দলের সঙ্গে কোথাও প্রোগ্রাম করতে গেছে। মাকে জব্দ করার জন্যই বলে যায়নি। সুনন্দটা বরাবরই খামখেয়ালি। রগচটা। তার পক্ষে সবই সম্ভব।

পুরনো স্মৃতি আবছা দোলা দিয়ে গেল নিবেদিতাকে। স্কুল থেকে মাঝে মাঝেই রাত করে বাড়ি ফিরত সুনন্দ। নির্মলার বাড়ি চলে যেত ছেলে। নির্মলা, মানে সুনন্দর ছোটবেলার আয়া। সাত-আট বছর বয়স পর্যন্ত সুনন্দর দেখাশুনোর ভার ছিল ওই নির্মলার হাতেই। ক্লাস এইট-নাইনে পড়ার সময়েও নির্মলার বাড়ি গিয়ে নাকি সটান শুয়ে পড়ত ছেলে, আর উঠতেই চাইত না। নির্মলাই এসে গপ্প করেছে। একদিন সুনন্দ হল ফোটানোর মতো করে শুনিয়েও দিয়েছিল, নির্মলাকে তার নাকি অনেক বেশি মা মা মনে হয়।

একটা তপ্ত শ্বাস পড়ল নিবেদিতার। বাইরের উষ্ণতর বাতাসে মিশে গেল নিঃশ্বাসটা। তাঁর ছেলেরা বুঝল না আর পাঁচটা নেটিপেটি সংসার করা মহিলাদের সঙ্গে তাদের মাকে এক করে দেখা ঠিক নয়। নিবেদিতা আলাদা। ঘরগেরস্থালি ছেলেপুলে মানুষ করার বাইরেও এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষের আরও অনেক কাজ থাকে। অনেক বড় কাজ। নিবেদিতা সেই বৃহত্তর কাজে উৎসর্গ করেছেন নিজেকে। তিনি খেলেও বেড়াচ্ছেন না, ফুর্তিও করছেন না। মানুষের কথাই ভাবছেন, মানুষের জন্য কাজ করছেন। দৈনন্দিন সংসারের তুচ্ছতায় ডুবে যাননি বলে কেন তাঁর ওপর অভিমান করবে তাঁর আপনজনেরা? তাও তো নয় নয় করে সংসারের অনেক চিন্তাই তিনি করেছেন। সুনন্দকেই তো বার বার তিনি চার্টার্ড পড়ার জন্য বলেছিলেন, সে যদি বিদঘুটে গানের জগতে ঢুকে সুখ পায় নিবেদিতা কী করবেন? ধুস্, যে চুলোয় গেছে যাক। নিবেদিতা আর ভাবতে পারছেন না। কোথাও কি এতটুকু শান্তি নেই? এক এক ছেলে এক এক চিজ। অনিন্দ্যর বিয়ে দিয়ে ভাবলেন এবার হয়তো ছেলের মাথা ঠাণ্ডা হবে, শান্ত ভাবে ঘরসংসার করবে। কোথায় চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি এখন শুয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছেন! কী মিষ্টি একটা বউ এল ঘরে। কথায় কথায় চোটপাট করে তার ওপর! মেয়েটার বাচ্চাকাচ্চা হবে, কোথায় তার একটু যত্নআত্তি করবি, দরকার হলে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবি, কোনও দায়িত্ব নেওয়ারই দায় নেই। ছেলে যেন বাপেরও এক কাঠি বাড়া। আর্যও এত নিষ্ঠুর ছিল না, বাচ্চা হওয়ার আগে নিবেদিতার খেয়ালটুকু অন্তত রাখত। বেচারা শরণ্যা সারাক্ষণ এখন মুখ শুকনো করে ঘুরছে। মাকে ছেড়ে কেন যে এখন বউ-এর ওপর মেজাজ করা শুরু হল অনিন্দ্যর? চাকরি নেই বলে?

শরণ্যার মুখ মনে পড়তেই নিবেদিতার হৃদয়টা দ্রব হয়ে এল। বাড়িতে একমাত্র শরণ্যাই যা সম্মান করে নিবেদিতাকে, চেষ্টা করে বোঝার। মেয়েটার মনটাও ভাল। প্রোজেক্টের কাজে কি-ই বা আহামরি পায়, অথচ প্রথম মাসের টাকা থেকে বাড়ির সকলের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে এসেছিল। শাশুড়ির জন্য তাঁত কলাক্ষেত্রম, শ্বশুরের জন্য পাঞ্জাবি...। মধ্যবিত্ত মনোভাব, তবু বেশ লেগেছিল নিবেদিতার। এ মাসে তো আর এক কাণ্ড, জোর করে দু হাজার টাকা গুঁজে দিল নিবেদিতার হাতে, নরম করে বলল, আপনার ছেলের তো এখন কাজকর্ম নেই মামনি, ধরুন আমি ওর হয়েই এই টাকাটা...। বেচারা জানেও না তার স্বামীটি কস্মিনকালে সংসারে ফুটো পয়সাটি ঠেকায় না। কিংবা হয়তো জেনেও না জানার ভান করে টাকা দিল যাতে পরিবারে তার বেকার বরের সম্মানটা থাকে। রোজগার থাকলে টাকা না দিয়েও হাতের গুলি ফোলানো যায়, কিন্তু চাকরি বাকরি না থাকলে সেটা তো হয় না। শরণ্যা নিশ্চয়ই এই সত্যিটা বোঝে। মেয়েটার এই আত্মমর্যাদাবোধ যদি নিবেদিতার একটা ছেলের মধ্যেও থাকত।

গলাটা আবার শুকিয়ে গেছে। বোতলের ছিপি খুলে ফের একটু কণ্ঠনালী ভেজালেন নিবেদিতা। সুহাসিনীর গেটে পৌঁছোন পর্যন্ত চোখ বুজে হেলান দিয়ে রইলেন সিটে। নেমে অফিসঘরে ঢোকার আগে থমকালেন সামান্য। ভেতরে দময়ন্তীর গলা পাওয়া যাচ্ছে না?

একা দময়ন্তী নয়, আরও কয়েকজন এসেছে আজ। অর্চনার টেবিল ঘিরে রীতিমতো চাঁদের হাট। দময়ন্তীই একা বকে যাচ্ছে, বাকিরা সবাই মুগ্ধ শ্রোতা।

নিবেদিতাকে দেখেই দময়ন্তী বলে উঠল, —এসে গেছেন নিবেদিতাদি? আপনার জন্য আমরা কতক্ষণ ধরে ওয়েট করছি।

রুমালে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে অর্চনার পাশের চেয়ারটিতে বসলেন নিবেদিতা, —কেন, আমায় কী দরকার পড়ল?

—বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে আমি একটা প্রস্তাব রাখছিলাম। রিগার্ডিং ফান্ড তোলা।

—কী প্রস্তাব?

—লোকের দরজায় দরজায় আর কত হাত পাতব?

—হাত পাতাই তো আমাদের কাজ ভাই। নিবেদিতা মৃদু হাসলেন। —আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।

—এটা ওল্ড কনসেপ্ট নিবেদিতাদি। সমাজসেবার কাজটাও

আজকাল প্রফেশনালি করতে হয়। আই মিন, কাউকে বেশি বিরক্ত না করে...বোঝেনই তো যারা টাকা দেয়, সবাই তো আর উচ্ছ্বসিত হয়ে দেয় না... ধরুন যদি একটা গ্যালা এন্টারটেনমেন্ট প্রোগ্রাম করা যায়... লোকেও এনজয় করল, এক লপ্তে সুহাসিনীর ফান্ডেও মোটা টাকা এসে গেল!

দীপালি বলে উঠল, —দময়ন্তীর আইডিয়াটা কিন্তু মন্দ নয় নিবেদিতাদি। বহু প্রতিষ্ঠানই তো আজকাল ফাংশান করে টাকা রেজ করছে।

নিবেদিতার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল, —খুব লাভ হবে কি? ফাংশান তো আমরা করেছি কয়েকবার। নতুন বিল্ডিং তোলার আগে রবীন্দ্রসদনে গানের প্রোগ্রাম করলাম না? সুচিত্রা মিত্র এলেন, সুবিনয় রায় এলেন... আলটিমেটলি কত টাকা লাভ হল, বল? দু মাস ধরে টিকিট বিক্রি করলাম, খরচখরচা বাদ দিয়ে হাতে এল সাকুল্যে হাজার আঠেরো উনিশ। ওই টাকায় তো বৃদ্ধাশ্রমের ভিতও হবে না।

—আমরা ওরকম ছোটখাটো ফাংশানের কথা ভাবছি না নিবেদিতাদি। বড় করে কিছু করার কথা বলছি।

—কী রকম?

—যদি মুম্বাই থেকে আর্টিস্ট এনে প্রোগ্রাম করি? বড় কোনও জায়গায়? যেমন ধরুন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে?

—হিন্দি নাচগান? নিবেদিতা নাক কুঁচকোলেন, —বৃদ্ধাশ্রমের জন্যে?

—দোষের কী আছে? নাচ গান ইজ নাচ গান, তার আবার হিন্দি বাংলা কী? দময়ন্তী নড়ে চড়ে বসল। এই গরমেও সিলকের শাড়ি পরেছে দময়ন্তী। বয়স তার চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, দেখে অবশ্য আরও কম মনে হয়। মোমে মাজা মসৃণ ত্বক, তীক্ষ্ণ নাক, টানা টানা চোখ, তুলিতে আঁকা ভুরু— রূপসী দময়ন্তী ভিড়ের মাঝেও আলাদা করে চোখ টানে। নিজের রূপ সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতনও। মরালীর মতো গ্রীবা হেলিয়ে দময়ন্তী বলল, —বাঙালি উন্নাসিকতাগুলো ছাড়ুন নিবেদিতাদি। মহৎ উদ্দেশ্যে যে কোনও ধরণের অনুষ্ঠানই আমরা করতে পারি।

দময়ন্তীর বাগভঙ্গিটা পছন্দ হল না নিবেদিতার। মতটাও মানতে পারলেন না পুরোপুরি। ক্যানসার হসপিটালের সাহায্যার্থে ক্যাবারে নাচ কি বিধেয়? মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে কী রুচিবোধের কোনও সম্পর্কই নেই?

অর্চনা ফস করে মন্তব্য করলেন, —ফাংশনে সব রকমের গানই থাকতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, হিন্দি গান... সব ধরনের দর্শকই এনজয় করবে।

দময়ন্তী বলল, —মুম্বাই আর্টিস্ট বলতে বাঙালি শিল্পীই থাকবে। কুমার রবীন, পল্লবী সেন...

সুপ্রিয়া বললেন, —কুমার রবীন তো নজরুলগীতিও ভাল গায়।

অর্চনা বললেন, —কুমার রবীনের তো দারুণ ক্রেজ এখন! তার তো রেটও অনেক।

—বললাম যে ওগুলো কোনও ফ্যাক্টরই নয়। দময়ন্তী গর্বিত মোরগের মতো নিবেদিতাকে দেখল এক ঝলক, —এগজিকিউটিভ কমিটি শুধু ব্যাপারটা অ্যাপ্রুভ করে আমার ওপর ছেড়ে দিক, কুমার রবীনকে আনার দায়িত্ব আমার। এই তো মাস তিনেক আগে আমার কর্তা কুমার রবীনের বাবার গল ব্লাডার অপারেশান করেছে। আপনারা কুমার রবীনের ফ্যান, আর কুমার রবীন আমার বরের ফ্যান। কলকাতায় এলে ফোন করবেই। ও একবার মুখ ফুটে বললে কুমার রবীন শত ব্যস্ততার মাঝেও এসে প্রোগ্রাম করে যাবে। আর সে এলে পল্লবী সেন তো কোনও ব্যাপারই নয়।

দীপালি বলল, —তাহলে তো আমাদের এখন থেকেই নেতাজি ইনডোরের জন্য চেষ্টা চালাতে হয়। নিশ্চয়ই শীতকালে হচ্ছে ফাংশানটা?

—হ্যাঁ, ডিসেম্বর জানুয়ারিই বেস্ট টাইম। ক্রাউড পাওয়া যায়। ওই সময়ে বৃদ্ধাশ্রমের কাজও শুরু হবে, হাতে টাকাও...

—টিকিট কত করে করা যায়?

—মিনিমাম একশো। অবশ্য অল্প কিছু পঞ্চাশ রাখলেও ভাল হয়।

সকলেই উৎসাহী মতামত দিয়ে চলেছে। নিবেদিতার মনে হল তিনি যেন ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর উপস্থিতি কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না। যেন সব কিছুই স্থির হয়ে গেছে, তাঁর মতামত এখন নেহাতই মূল্যহীন। বৃদ্ধাশ্রমের জমির জন্য শেষের দিকে প্রায় লাখ দেড়েক টাকা কম পড়েছিল, ধূর্জটি পাইন টাকাটা দিয়ে দিয়েছিল, তাই কি ধরাকে সরা জ্ঞান করার অধিকার জন্মে গেছে দময়ন্তীর?

নিবেদিতা আর নীরব থাকতে পারলেন না। স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, —থামো, থামো। সুহাসিনীতে একটা কন্সটিটিউশান আছে। এখানে কাজকর্মের একটা ধারা আছে। এমন একটা অনুষ্ঠান করার আগে সমস্ত সদস্যের মতামত নেওয়া উচিত।

—আপনি কি অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং-এর কথা বলছেন? ওখানে পাশ হয়ে যাবে।

—আগে হোক। তারপর নয় আলোচনা কোরো।

সবাই চুপ। ঘর অস্বাভাবিক রকমের থমথমে। কেউই যেন তাঁর বিরুদ্ধাচারণ পছন্দ করছে না। হঠাৎ স্বাগতা বলে উঠলেন, — নিবেদিতাদি কিন্তু ঠিকই বলেছেন। সুহাসিনীর ভাল কিছু হলে নিবেদিতাদিই তো সব থেকে খুশি হবেন। তবে ডেকোরামগুলোও তো মানতে হবে। কেউ একটা প্রস্তাব দিল, সঙ্গে সঙ্গে সবাই নাচতে শুরু করল...

সুপ্রিয়া বললেন, —জেনারেল মিটিং মানে কিন্তু সেপ্টেম্বর। তারপর ফাংশান অরগ্যানাইজ করা কিন্তু মুশকিল হবে।

—হলে হবে। একটা ফাংশান না হলে বৃদ্ধাশ্রম বন্ধ হবে না।

—এ তো ব্যাগড়া দেওয়া পলিসি।

—ল্যাঙ্গুয়েজটা ঠিক কর স্বাগতা।

উত্তেজনা আর বেশি বাড়াবার আগে দময়ন্তীই দু হাত তুলে থামাল। মুখে একটা স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়ে বলল, —ও কে। ও কে। তিন-চার মাস পরেই নয় প্ল্যান হবে। একবার যখন করব বলে ঠিক করেছি, কিছু একটা তো করবই। যতই হোক এর সঙ্গে আমাদের বৃদ্ধাশ্রমের ইন্টারেস্ট জড়িত।

নিবেদিতার আর ভাল লাগছিল না। কেন যেন মনে হচ্ছে সুহাসিনীর ওপর তাঁর কর্তৃত্বের রাশ আলগা হয়ে আসছে ক্রমশ। এই কাকলি স্বাগতারা একসময়ে কী অসম্ভব অনুগত ছিল তাঁর। অর্চনাকে তো তিনি প্রায় হাতে ধরে সেক্রেটারির চেয়ারে বসিয়েছেন। আজ তারাও কেন অন্য সুরে গায়?

নিবেদিতা কি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না? পিছিয়ে পড়ছেন? সঙ্গীসাথীরা কি তাঁকে পুরনোপন্থি ভাবছে?

বাড়ি ফেরার পথেও সুহাসিনীর চিন্তাতেই ডুবে রইলেন নিবেদিতা। নাহ্, দময়ন্তীর কাছে হেরে যাওয়া চলবে না, নতুন করে জমি তৈরি করতে হবে সুহাসিনীতে। প্রত্যেকটি সদস্যের সঙ্গে তিনি নিজে যোগাযোগ করবেন। বোঝাবেন, দময়ন্তী সত্যিই সুহাসিনীর ভাল চায় না, ক্ষমতা গ্রাসই তার একমাত্র লক্ষ্য। কীসে সুহাসিনীর ভাল হতে পারে, কীসে বা মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা তাও তিনি সমঝাবেন সবাইকে। দময়ন্তীকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার সুহাসিনী এখনও নিবেদিতারই।

ঘরে এসে শাড়ি বদলে একটুক্ষণ বিছানায় ঝুম হয়ে বসে রইলেন নিবেদিতা। সন্ধে নামছে। বাইরে আলো এখনও মরেনি পুরোপুরি, তবে অন্দরে আবছা আঁধার। নিবেদিতার মনেও দুলছে আলোছায়া। হিসেব কষছেন কাকে কাকে পুরো জপিয়ে ফেলেছে দময়ন্তী, কী ভাবে তাদের নতুন করে হাতে আনা যায়। কিছুটা টাকার জোর থাকলেও মেয়েটার সঙ্গে পাঞ্জা কষা সহজ হয়। কবে যে শোভাবাজারের বাড়িটা বিক্রি হবে? মিনু যদি এসে যায়, সেপ্টেম্বরে টাকাটা হাতে এসে যাবে। তেমন বুঝলে ওখান থেকেই লাখ খানেক সুহাসিনীতে ডোনেট করে সাধারণ সদস্যদের ওপর এক ধরনের চাপ তৈরি করা যায়। জোর গলায় তখন বলতে পারেন, আসুন আমরা নিজেরাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওল্ডহোমটা গড়ে তুলি, ওসব চটুল ধ্যাতাং ধ্যাতাং নাচাগানা করে সুহাসিনীর ঐতিহ্যে কালি ছেটানোর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু মিনু ফিরছে তো। যদি ফের ঝুল দেয়? একবার সোনাদাকে কি ফোন করবেন নিবেদিতা? সেদিন মুখের ওপর নগ্ন সত্যিটা শুনিয়ে দেওয়ায় সোনাদা রীতিমত চটিতং, আর যোগাযোগই করছে না। অবশ্য নিবেদিতার তাতে বয়েই গেল। তিনি করবেন কেজো ফোন, অন্যের মান অভিমান নিয়ে ভাবার তাঁর দায় নেই।

দরজায় ছায়া। পরদার ওপারে ভারী গলা, —আসব?

নিবেদিতা চমকে তাকালেন। হঠাৎ আর্য এ ঘরে?

নিরাবেগ গলায় নিবেদিতা ডাকলেন, —এসো।

ভেতরে ঢুকে টিউবলাইটটা জ্বালিয়েছেন আর্য। ফ্যাটফেটে আলোয় ঘরটা ভরে গেল। গলা ঝেড়ে আর্য বললেন, —একটা কথা ছিল।

—বল।

—তোমার ছোট ছেলের সন্ধান কিছু পেলে?

বুকটা ধক করে উঠল নিবেদিতার। ছি ছি, সুনন্দর কথা তিনি ভুলেই গেছিলেন! নিজের ওপর ক্ষোভটা উলটো ভাবে ফুটে বেরোল। হৃদয়ের গহনে লুকিয়ে থাকা উদ্বেগটা ঠিকরে এল ব্যঙ্গ হয়ে, —তুমি তাহলে ছোট পুত্রের না ফেরার খবরও রাখ? স্ট্রেঞ্জ!

আর্য থমকালেন সামান্য। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, —কী করব, ইন্দ্রিয়গুলোকে তো অচল করতে পারিনি। কান আছে শুনতে পাই, চোখ আছে দেখতে পাই।

—তারপর ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাক, তাই তো?

—উপায় কী? হাত-পা ছুঁড়লেই কি তোমার ছেলেদের নাগাল পাব?

—তাহলে আর ভাবছ কেন? গর্তে ঢুকে বসে থাক। মনের দুঃখে বোতল খোল।

—তাই তো করি। আমার তো সবই সয়ে গেছে। নেহাত মেয়েটা বার বার এসে বলছে...

—কে মেয়েটা?

—শরণ্যা। এ বাড়ির ধারা এখনও রপ্ত করতে পারেনি, তাই টেনশান করছে। বলছিল, মামনির সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল... দিনকাল বড় খারাপ... আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না বাবা।

মা ছেলের কাজিয়াই যে সুনন্দর গৃহত্যাগের কারণ এ তো নিবেদিতাও জানেন। কিন্তু শরণ্যার মতো একটা নবাগত মেয়ে কেন এ ব্যাপারে নাক গলাবে? তাও আবার আলোচনা করছে কার সঙ্গে? না আর্যর সঙ্গে! এতে কি নিবেদিতার অহং-এ লাগে না?

চড়াং করে মাথা গরম হয়ে গেল নিবেদিতার। বিকৃত স্বরে বলে ফেললেন, —দুদিন এসেই এত দরদ? আশ্চর্য!

—ওভাবে বলছ কেন? সেও তো এখন বাড়ির একজন। ভাবনা তো তার হতেই পারে।

—বেশি আহ্লাদিপনা কোরো না তো। নিবেদিতা ফের ঝামরে উঠলেন, —শাশুড়ি দেওর নিয়ে ও মেয়ের এখন না ভাবলেও চলবে। নিজেরটা আগে নিজে সামলাক।

কথাটা কি একটু বেশি জোরে বললেন নিবেদিতা? পরদার ওপাশ থেকে একটা ছায়া সরে গেল না? শরণ্যা নয় তো? মেয়েটা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল তবে?

নিবেদিতা স্থির হয়ে গেলেন।

নয়

দুপুরবেলা একা ঘরে শুয়ে ছিল শরণ্যা। শরীর আজ বেশ খারাপ। নাক সুড়সুড়, মাথা টিপটিপ, জ্বর জ্বর ভাব। কাল চেতনা থেকে ফেরার পথে ঝড়বৃষ্টি নেমেছিল জোর, ছাতা খুলেও সামাল দেওয়া যায়নি। ট্রামরাস্তা থেকে এ বাড়ি আর কতটুকু, তার মধ্যেই শরণ্যা ভিজে মিজে একসা। সকালে তো আজ ঘুম থেকে উঠতেই পারছিল না, মাথা যেন তখন ইটের মতো ভারী।

একটু আগে বেরোল অনিন্দ্য। সারা সকাল টেপরেকর্ডার নিয়ে খুটুর খুটুর করছিল। ভাল মতোই বিগড়েছে বোধহয়, সঙ্গে করে নিয়ে গেল সারাতে। কদিন ধরে খুব গান শোনার ঝোঁক চেপেছে অনিন্দ্যর। ঘরে থাকলেই ক্যাসেট বাজছে। ইংরিজি গান। পপ, তা শুনুক, নিমপাতা খাওয়া ভাবটা তো অনেক কেটেছে। মাঝে যা আরম্ভ করেছিল। বাচ্চা নষ্ট করো, বাচ্চা নষ্ট করো...! শরণ্যা প্রায় অতিষ্ঠ হওয়ার জোগাড়। কোনও কথাই অনিন্দ্য শুনতে রাজি নয়। সারাক্ষণ হয় হাউহাউ চেঁচাচ্ছে, নয় একেবারে স্পিকটি নট। রীতিমতো অত্যাচারও শুরু করেছিল। বিচ্ছিরি মাইগ্রেনে ছটফট করছে শরণ্যা, ক'হাত দূরেই গাঁক গাঁক টিভি চালিয়ে অনিন্দ্য হরর মুভি দেখছে। অতি কুৎসিত ছবি। বদখত কয়েকটা প্রাণী কিলবিল করছে পরদায়, সারাক্ষণ শুধু রক্ত আর রক্ত...।

অনিন্দ্য ভাল মতোই জানে ওরকম ছবি দেখলে শরণ্যার সর্বাঙ্গ গুলিয়ে ওঠে, তবু ওটাই সে চালাবে। তুমি আমার ইচ্ছেটা মানোনি, আমিও তোমার সুবিধে অসুবিধের পরোয়া করব না, এমন একটা ভাব। তাতে তুমি মরে যাও, হেজে যাও, পচে যাও, যা খুশি হোক। একেবারে যুক্তিবুদ্ধিহীন শিশুদের মতো আচরণ। নিদের চাওয়াটুকুই শুধু জানে, না দিলে তোমায় জ্বালিয়ে মারবে— বাচ্চারাই তো এমন নিষ্ঠুর হয়, না কী? শরণ্যা যদি কখনও রাগ করে বলে তোমার সঙ্গে থাকব না, কালই মানিকতলা চলে যাব, তাহলেও বাবুর মুখ আষাঢ়ে মেঘের মতো কালো। শরণ্যা যতক্ষণ না বলবে, ঠিক আছে বাবা, যাব না, আই উইথড্র, ততক্ষণ বাবু অন্নজল ত্যাগ করে ভোম হয়ে বসে। এটাকে ছেলেমানুষি ছাড়া আর কী বলবে শরণ্যা?

জামাইষষ্ঠীর পরদিন থেকে ছবিটা যেন বদলেছে সামান্য। সেদিন ও বাড়িতে গিয়েও বিশেষ কথা বলছিল না অনিন্দ্য, বাবা মাও যেন খানিকটা সিঁটিয়ে ছিল, হঠাৎ ঠাম্মাই জিজ্ঞেস করে বসল, —বুবলিকে তোমরা তাহলে এখানে কবে পাঠাচ্ছ বাবা?

অনিন্দ্য চোখ পিটপিট করল, —মানে?

—বা রে, প্রথম বাচ্চা তো বাপের বাড়ি থেকেই হয়।

—ও।

—পুজোর আগে আগেই তাহলে চলে আসুক বুবলি? তখন তো সাত মাস পুরে যাবে। তুমিও নয় তখন মাঝে মাঝে রাতে এসে থেকে যেও ভাই।

অনিন্দ্য জবাব দেয়নি, কেমন যেন ধন্দ মেরে গিয়েছিল।

সেদিন অনিন্দ্যর মুখখানা দেখে ভারী মায়া হয়েছিল শরণ্যার। ফেরার পথে নরম করে বুঝিয়েছিল, বাচ্চা হলে স্বামীর ওপর টান কমে না মেয়েদের, বরং ওই শিশুই এক নতুন বন্ধন গড়ে তোলে। আর মানিকতলায় গিয়ে থাকা? সে তো মাত্র ক'মাসের জন্য। তারপর তো শরণ্যা আবার অনিন্দ্যর অনিন্দ্যর অনিন্দ্যর।

কী বুঝল অনিন্দ্য কে জানে, সে রাত্রে গুম হয়ে থাকলেও পরদিন থেকে তার হাঁকডাক কমে গেল অনেকটা। ড্রিঙ্ক একটু বেশিই করছে, তবে অসভ্যতাটা আর নেই। সারাক্ষণ কী যেন একটা ভাবে। বোধহয় মনের সঙ্গে বোঝাপড়া চলছে। তা চলুক, শরণ্যা আর ঘাঁটায় না অনিন্দ্যকে। এর মধ্যে তো আবার আর একটা কাণ্ডও ঘটে গেল। মার সঙ্গে রাগারাগি করে ছোট ভাই পাঁচ দিনের জন্য নো ট্রেস। ভয়ঙ্কর না হলেও কটা দিনের জন্য একটা আবর্ত তো তৈরি হয়েছিল বাড়িতে। তালেগোলেই বোধহয় আনিন্দ্যর পাগলামিটা থিতিয়ে গেল আরও।

আর একটা সুলক্ষণ। শরণ্যার শরীরের খবর এখন অল্পস্বল্প রাখছে অনিন্দ্য। এই তো সকালেও নীলাচলকে বলছিল, বউদির চায়ে ভাল করে আদা দিয়ে দে, তোর বউদির আরাম লাগবে। বেরনোর সময়েও জিজ্ঞেস করল শরণ্যার জন্য পেইন বাম কিনে আনবে কিনা।

এটুকুই কি কম? কচু কাটতে কাটতেই তো ডাকাত হয়।

বিটকেল উপমাটা মাথায় আসতেই হেসে ফেলল শরণ্যা। ডাকাতই তো। ডাকাতটা যা উদ্দাম হয়ে হামলায় এক একটা দিন!

শরণ্যা পাশ ফিরল। বিছানায় আধখোলা গল্পের বই। হাত বাড়িয়ে ফের টানল বাংলা উপন্যাসখানাকে আধপাতাও পড়তে পারল না, চোখে লাগছে। পরদা ভেদ করে বেশ তো আলো আসছিল ঘরে, হঠাৎ কমে গেছে যেন? আকাশে মেঘ করল? আজও? হ্যাঁ, তাই তো! গুড়গুড় আওয়াজ হচ্ছে বাইরে। হঠাৎই শরণ্যার মনে পড়ে গেল ছাদে বেশ কয়েকটা কাপড়চোপড় মেলা আছে। দু-তিনটে সালোয়ার কামিজ, নীল রঙের নাইটিটা, অনিন্দ্যর শার্ট প্যান্ট...। এ বাড়ির ওয়াশিংমেশিন সেমি অটোমেটিক, কাচার পরে ভিজে জামাকাপড় শুকোতে দিতে হয়। নীলাচল কি বৃষ্টি এলে নামাবে মনে করে? সে নিশ্চয়ই এখন বাড়িতে নেই। এ পাড়ার ঠাকুর চাকররা দুপুরবেলা ফুটপাথে বসে জমিয়ে টোয়েন্টিনাইন খেলে। নীলাচলও তাসের পোকা। নাহ্, নিজেই গিয়ে তুলে আনা ভাল। শুকনো জামাকাপড় ফের ভিজলে বিশ্রী একটা গন্ধ হয়।

বিছানা ছেড়ে উঠল শরণ্যা। পা দুটো টলছে অল্প অল্প। মাথাটাও। দুপুরের দোতলা রোজকার মতোই নিঝুম। ছায়া মাখা। আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভাঙছে শরণ্যা। ছাদে এসে তার থেকে কাপড়-জামা নামাচ্ছে এক এক করে।

সহসা চোখ চিলেকোঠায়। সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। রঙচটা কাঠের দরজাটা হাট করে খোলা। মনে হয় যেন ভেতরে কেউ আছে।

সুনন্দ কি তালা লাগিয়ে যায়নি? শরণ্যা রোজই তো একবার করে ছাদে ওঠে, দরজা যে খোলা আছে নজরে পড়েনি তো! শিকল টানা থাকত কি?

পায়ে পায়ে ঘরটায় ঢুকল শরণ্যা। চাপা কৌতূহল নিয়ে। চিলেকোঠার তুলনায় ঘরটার আয়তন বেশ বড়ই। মেঝেয় তেমন ধুলো নেই, আজই বোধহয় ঝাঁট পড়েছে। আসবাব নেই বিশেষ। একটা শুধু সিংগলবেড খাট, একখানা পরিত্যক্ত সোফা, আর একটা নড়বড়ে টেবিল। নিজের ঘরের চেয়েও এই ঘরের নির্জনতাতেই থাকতে বেশি ভালবাসত সুনন্দ। বন্ধুবান্ধবদেরও নিয়ে আসত এখানেই। ছেলেটা কী সত্যিই সত্যি গৃহত্যাগী হল?

সুনন্দর খোঁজ অবশ্য একটা পাওয়া গেছে। নীলাচলই ঘুরে ঘুরে তার সন্ধান এনেছে। হাওড়ার কোন এক তন্ময় নামের বন্ধুর বাড়িতে সে অধিষ্ঠান করছে এখন। অজ্ঞাতবাসের ঠিকানাটা জোগাড় করে তার কাছে গিয়েওছিল নীলাচল, সে নাকি সটান জানিয়ে দিয়েছে ফার্ন রোডের বাড়িতে সে আর ফিরবে না।

আধভাঙা সোফাটার ওপর একটা ডায়েরি পড়ে আছে। ডায়েরিটা তুলতে গিয়েও শরণ্যা থমকাল একটু। অন্যের ডায়েরি কি পড়া উচিত? তুৎ, জানছেটা কে? যার ডায়েরি সে তো এখন গঙ্গার ওপারে।

পাতা উল্টোচ্ছে শরণ্যা। তেমন কিছুই নেই, শুধু টাকার হিসেব, হিজিবিজি, কাটাকুটি...। মাঝে মাঝে এক একটা পাতায় উদ্ভট উদ্ভট সেন্টেন্স। দেঁতো হাসি বেতো ঘোড়া, রোল খায় থোড়া থোড়া! শ্মশানেই সব শেষ, শশা নেই সব শেষ! রাম আর আল্লাহ্, ভারী ভারী পাল্লা! সুনন্দটা ধাঁধা ফাঁদা বানাত নাকি? পিছনের পাতায় আস্ত একটা গানও রয়েছে। তলায় তিন-চার ভাবে নাম সই করা। এস এম। কী বিটকেল গান রে বাবা! ইউরিয়া মুড়ি, অঙ্কের রুই/ সারের পালং, মার্কিনি কই/ ধন্য হউক ধন্য হউক ধন্য হউক হে ভগবান/ বাংরেজি ভাষা, ফাস্টফুড জাংক/ বিদেশে উড়ান, পাতাখেকো প্যাংক/ পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান...

শরণ্যা হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। যে ছেলের মধ্যে এত সুন্দর রসবোধ আছে সে অমন জঘন্য ভাষায় মার সঙ্গে ঝগড়া করে কী করে? মা'ই বা কেমন, কোনও ছেলের কাছ থেকে এতটুকু শ্রদ্ধা আদায় করতে পারেনি? নীলাচল বলছিল দশ হাজার টাকা দিয়ে নাকি একটা সেকেন্ডহ্যান্ড স্প্যানিশ গিটার কেনার ইচ্ছে হয়েছিল সুনন্দর। আশ্চর্য, এইটুকু বাসনার কথাও মাকে খুলে বলতে পারে না ছেলে? মা-বাবার সঙ্গে ছেলেদের কী অদ্ভুত সম্পর্ক! মা যেই শুনলেন ছেলে বেঁচেবর্তে আছে, ওমনি কেমন নিশ্চিন্ত। ফিরল তো ফিরল, না ফিরলে কী আর করা এমন একটা হাবভাব! বাবারই বা কী এমন ভাঙচুর হল? সেই মুখে কুলুপ, সেই চোখে মোটা বই! শুধু একটু যেন বেশি গোমড়া, ব্যস।

আর অনিন্দ্য? সে তো কাঁধ ঝাঁকিয়ে অবলীলায় বলে দেয়, পোষায়নি তাই কেটে গেছে! ঝগড়া করেছে মা, ফেরাতে হলে মা ফেরাবে, আমি কেন নাক গলাতে যাব!

শরণ্যার সংশয় হয়, অনিন্দ্য সুনন্দ এক মায়ের পেটের ভাই তো? যতই বাইরে বাইরে মানুষ হোক, ছোট ভাইকে ঘিরে দাদার কি শৈশবের কোনও স্মৃতিই নেই? নাকি অনিন্দ্যর সেই তন্ত্রীটাই নেই, যা রক্তের টানে বেজে ওঠে? ভায়ে ভায়ে বিবাদ থাকলেও এই নির্লিপ্তিটাকে নয় চেনা যেত...

জামাকাপড় কাঁধে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল শরণ্যা। দক্ষিণের আকাশ ঘন হয়ে এসেছে। বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে হঠাৎ হঠাৎ। ঠাণ্ডা একটা বাতাস দৌড়ে এল। কাছেপিঠে নির্ঘাৎ কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। অনেক উঁচু থেকে দুটো চিল নেমে আসছে নীচে। এরকম সব মুহূর্তে মনটা যেন কেমন হু হু করে ওঠে। কান্না পায়। কেন যে পায়?

কোথায় যেন টেলিফোন বাজছে। দোতলায় নয় তো? নীচে ফোন তোলার কেউ নেই, শ্বশুরমশাই এখন কিছুতেই ওপরে উঠবেন না। শুভ্রর ফোন কি?

মনে হতেই ছুটল শরণ্যা। হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙছে। ফ্রেঞ্চ লিভ নিয়েছে আজ, শুভ্র ফোন করতেই পারে। শরীর বেগতিক বলে শরণ্যাকে খুব সাহায্য করছে শুভ্র. পি-এস-বি ক্যানিং ব্লকে সার্ভের কাজ অ্যালট করেছিলেন, শরণ্যা যেতে পারল না, শুভ্র একা একাই ঘুরে এসে কাজটা দুজনের নামে ভাগ করে দেখিয়ে দিল। আজ শরণ্যারই ওকে একটা ফোন করে দেওয়া উচিত ছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রিসিভার তুলল শরণ্যা, —হ্যালো?

—কী রে, তুই আজ কাজে যাসনি কেন? শরীর খারাপ?

শুভ্র নয়। মা।

শরণ্যা দম নিয়ে থিতু করল নিজেকে। তারপর হালকা ভাবেই বলল, —তেমন কিছু নয়। এমনিই ইচ্ছে করছিল না।

—বললেই হবে? গলা তো ভারী ভারী লাগছে!

এই না হলে মা? ঠিক ধরে ফেলেছে। পলকের জন্য শরণ্যার মনে হল সে যখন ডাইনিংটেবিলে ভাত ঘাঁটছিল, শাশুড়ি বেরোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে তার সঙ্গে কথা বললেন। সন্ধেবেলা বাবুয়া বলে কে যেন আসবে শাশুড়ির কাছে, শরণ্যা যেন তাকে বসিয়ে রাখে। কই, একবারের জন্যও তো শাশুড়ির চোখে পড়ল না শরণ্যার শরীরটা ঠিক নেই? এটাই কী মার সঙ্গে শাশুড়ির তফাত? নাকি শরণ্যার শাশুড়িই এরকম?

গলা ঝেড়ে শরণ্যা বলল, —তোমার টেনশান করার মতো কিছু হয়নি মা। জাস্ট একটু সর্দি...কাল এমন আলটপকা ভিজে গেলাম...

—তোমার এখন সাবধানে থাকা উচিত বুবলি। এমনিই এসময়ে শরীর নড়বড়ে থাকে। —

—আমি সাবধানেই থাকি মা। মিনিবাসে ওঠা ছেড়ে দিয়েছি, ট্রামে চেপে কাজে যাই, দুদ্দাড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙি না। বলেই একটু মুচকি হাসল শরণ্যা,—তা হঠাৎ তোমার দুপুরে ফোন? তোমাদের টাইম তো রাত্তিরবেলা!

—দরকার আছে। তাইতো তোর অফিসে ফোন করেছিলাম। ...শোন, আমি ডক্টর মন্দিরা সেনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করছি। এই গোটা পিরিয়ডটা তুই ওঁর আন্ডারেই থাকবি। ডক্টর সেনের নিজের নার্সিংহোম আছে। চমৎকার অ্যারেঞ্জমেন্ট, ডেলিভারির সময়ে কোনও প্রবলেম হবে না। আরও সুবিধে, ওঁর হাজব্যান্ড চাইল্ড স্পেশালিস্ট। বুঝলি?

—হুঁ। বুঝলাম। ঘরের পয়সা ঘরেই থাকে।

—ফাজলামি করিস না। আজই ভাবছি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে যাব। কোন দিনটা তোর সুবিধে হবে? উনি নিজের নার্সিংহোমে বসেন সোম বুধ শুক্কুর সন্ধেবেলা।

—তা সেটা কদ্দূর?

—সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ আর বিডন স্ট্রিট ক্রসিং-এ। মহাশ্বেতা একটু থেমে থেমে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললেন, —আমাদের ওখান থেকে জায়গাটা খুব দূর নয়।

—হুঁ।

মহাশ্বেতা আবার একটু থেমে থেকে বললেন, —অনিন্দ্যর সঙ্গে ভাল করে কথা বলে নিয়েছিস তো?

—কী নিয়ে?

—এই... তুই আমাদের কাছেই থাকবি...

দুর্ভাবনাটা এখনও ঘোচেনি। শরণ্যা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কথা তো সেদিন হয়েই গেল। যা কাস্টম তাই হবে।

—দেখিস বাবা, অশান্তি যেন না হয়।

শরণ্যার বুকটা চিনচিন করে উঠল। তাকে নিয়ে বাবা মার উদ্বেগটা কিছুতেই আর কমছে না। রোজ টেলিফোন করেও স্বস্তি নেই, প্রায় সপ্তাহেই দুজনে ছুটে আসে ফার্ন রোডে। সরেজমিনে বুঝে নিতে চায় মেয়ের হাল।

জোর করে হেসে উঠল শরণ্যা,—তোমরা সারাক্ষণ এত টেনশান করো কেন বলো তো? .অনিন্দ্য কোনও প্রবলেম করবে না।

মহাশ্বেতা চুপ।

শরণ্যা আর একটু গলা ওঠাল,—অনিন্দ্যকে নিয়ে তোমরা মিছিমিছি ভয় পাও মা। ও একটু অন্য রকম ঠিকই ছোটবেলা থেকে ছাড়া ছাড়া ভাবে মানুষ হয়েছে, কারুর সঙ্গে তেমন মেশেনি... ওর এক্সপ্রেশানগুলোই একটু আলাদা ধরনের।

—হুঁ। ওপাশ থেকে তবু যেন ছোট্ট শ্বাস ভেসে এল,—

অ্যাপয়েন্টমেন্টটা তাহলে করে ফেলি?

—করতে পারো। তবে...

—কী তবে?

—রেগুলার অদ্দুর গিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে এখন? উনি কি এদিকে কোথাও বসেন না?

—বসেন বোধহয়। এল্‌গিন রোড না কোথায় যেন। জেনে নিতে হবে।

—তো সেখানেই তো ভাল।

—ঠিক আছে, দেখছি। ...ও হ্যাঁ, ভাল কথা। আমার ছাই কিছুতেই মাথায় থাকে না...

—কী?

—একদিনও তো গিয়ে নিবেদিতাদির সঙ্গে দেখা হচ্ছে না... তাঁর সঙ্গেও তো আলোচনা করা দরকার।

—কী ব্যাপারে?

—ওঁর যদি কোনও স্পেশাল ডাক্তারের ব্যাপারে ফ্যাসিনেশান থাকে...

শরণ্যার হাসি পেয়ে গেল। বাচ্চা হবে জানতে পারার পর শাশুড়ি একদিনই বুঝি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ডাক্তার দেখিয়েছ? তারপর বোধহয় আর স্মরণেই নেই ঘটনাটা। নাহ্, ভুল হল। আরও এক দু'বার প্রশ্ন করেছেন বটে। শরীর কেমন? ঠিক আছ তো?

স্বর সহজ রেখে শরণ্যা বলল,— তুমি তোমার মতন অ্যারেঞ্জমেন্ট করো মা। মামণি কিচ্ছু মনে করবেন না।

—তবু একবার ওঁর মতামত তো নেওয়া উচিত।

—সে নয় ফোনে কথা বলে নিও।

—ওঁকে তো যেতেও বলতে হবে।

—কোথায়? ডাক্তারের কাছে? মামণির বোধহয় সময় হবে না মা।

—তা ঠিক। উনি যা ব্যস্ত মানুষ। ...এমনই বাড়ির সব খবর কী? ভাল?

—চলছে। অ্যাজ ইউজুয়াল।

—সুনন্দ?

—ওই। অ্যাজ ইউজুয়াল।

—ফোন টোনও করেনি?

—উঁহু।

—নিবেদিতাদি কী বলছেন?

—কিছুই না।

—নিবেদিতাদি নিজে একবার গিয়ে দাঁড়ালে বোধহয় ছেলের অভিমানটা চলে যেত।

হয়তো। কিন্তু তেমনটি কী ঘটবে? এ বাড়িতে সবাই-ই তো যে যার মান নিয়ে মটমট করছে। অভিমান এখানে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়।

মহাশ্বেতা ফের বললেন,—যাই বলিস, ছোট পুত্তুরটিও বেশ ট্যাঁটা আছেন। এত্ত কীসের তেজ? বাবা মার মনে কষ্ট দিয়ে কী সুখ যে পায় এরা!

সুনন্দর প্রসঙ্গ আর ভাল লাগছিল না শরণ্যার। কচলে কচলে তেতো হয়ে যাচ্ছে যেন। তাছাড়া সুনন্দকে নিয়ে সে রোজ আলোচনা করবেই বা কেন? কে সুনন্দ? নেহাত এ বাড়িতে শরণ্যার বিয়ে হয়েছে বলে আইন মোতাবেক একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ব্রাদার-ইন-ল। কিন্তু ব্রাদার-ইন-ল-টি সিস্টার-ইন-ল-কে কতটা পুঁছেছে? প্রথম মাইনে পেয়ে শরণ্যা অত সুন্দর একটা টিশার্ট কিনে আনল, খুলে একবার দেখল না পর্যন্ত! প্যাকেটখানা হাতে নিয়ে শুধু এক টুকরো শুকনো থ্যাংক্স্। দেওর বউদির মধ্যে কত সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়, এ বাড়িতে সুনন্দ তার ভাল বন্ধু হতে পারত... কোনওদিন কাছেই ঘেঁসল না। শরণ্যা একটি আস্ত গাড়োল বলেই না ভেবেছিল এ বাড়ির বউ হিসেবে সুনন্দর জন্যে তার উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত? গাল বাড়িয়ে কেমন চড়খানা খেলো? লাভ হল একটাই। নিবেদিতা দেবীর একটা অন্তত মনের কথা জানা গেল। অন্য একটা চেহারাও। বাইরে যতই মহৎ সাজুক, ভেতরে ভেতরে তিনিও একজন টিপিকাল শাশুড়ি। নইলে ওইরকম একটা মন্তব্য কেউ করে। ছি।

অবশ্য মাকে এসব মরে গেলেও বলবে না শরণ্যা। নাক টেনে বলল, —ছাড়ো তো ওর কথা। ফিরলে ফিরবে, না ফিরলে না ফিরবে।

কথাটা উচ্চারণ করেই শরণ্যা সচকিত। নিজের কানেই ঠং করে বেজেছে কথাটা। তার গায়েও কী তবে এ বাড়ির হাওয়া লেগে গেল? সঙ্গদোষ?

শরণ্যা আলগা ভাবে প্রসঙ্গ ঘোরাল,—মা, কাকাদের বাড়ির টেলিফোনটা খারাপ নাকি? সকালে কত বার ডায়াল করলাম, খালি রিং হয়ে যাচ্ছিল?

—না তো। তবে ওদের লাইন তো মাঝে মাঝেই প্রবলেম করে। আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল্, সারাক্ষণ রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে...। কেন, কাকাকে তোর কী দরকার পড়ল?

—উঁহু, কাকাকে নয়। ঝিমলিকে। ওকে একটু ঝাড়তাম।। বজ্জাত মেয়ে, গড়িয়াহাটে কলেজ করতে আসে, একদিন এখানে আসতে পারে না?

—তুই বাড়ি থাকলে তো যাবে।

—আমার অফিসটাও তো দূরে নয় মা। ইচ্ছে হলে ওখানেও...কদ্দিন ওর সঙ্গে দেখা হয় না। ওকে তুমি বোলো, আমি খুব রাগ করেছি।

—বলব। ...হ্যাঁ রে, অনিন্দ্যর কাল একটা ইন্টারভিউ আছে না?

—হ্যাঁ।

—যাবে তো?

—বলছিল তো যাবে।

—এবার একটা কিছু হওয়া দরকার। অনেকদিন তো হল...

—হুঁ।

শুধু মা বাবা নয়, অনিন্দ্যর চাকরি নিয়ে শরণ্যাও যথেষ্ট ভাবিত এখন। কাল যেখানে ইন্টারভিউ, তারা শিলিগুড়ি অফিসের জন্য ইঞ্জিনিয়ার চাইছে। জেনেও অ্যাপ্লাই করেছে অনিন্দ্য। কলকাতা ছেড়ে নড়তে মনে মনে রাজি হয়েছে বোধহয়। বাইরে কোথাও চলে গেলে মন্দ হয় না। মা বাবাকে ছেড়ে দূরে যেতে শরণ্যার একটু খারাপ লাগবে, তবে এ বাড়ির দমবন্ধ করা স্বাধীন পরিবেশটা থেকে তো মুক্তি। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে অনিন্দ্যও হয়তো অনেক স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

—কী রে, চুপ করে গেলি কেন? কী ভাবছিস?

শরণ্যার চিন্তাটা ছিঁড়ে গেল। হেসে বলল,—আর কী, এবার রাখো। অফিসে কোনও কাজকর্ম নেই? এতক্ষণ কথা বলছ কী করে?

—আজ আমাদের অফিসে বেশ ছুটি ছুটি ভাব। আমাদের এক কলিগের ছেলে মাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করেছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে জোর। সাবির থেকে মাটন্ রেজালা আসছে, তন্দুরি রুটি...

—আছো ভাল। সাধে কি গভর্নমেন্টের এই দশা!

—পাকামো করিস না। প্রাইভেটেরা কত কাজ করে জানা আছে। কথায় কথায় গণেশ উল্টোয় কেন, অ্যাঁ?

—হুঁউ?

—সাবধানে থাকিস। রাখছি।

মার সঙ্গে বকবক করে শরীর অনেকটা ঝরঝরে লাগছে। সোফার ওপর ফেলে রাখা জামাকাপড়গুলো তুলে নিয়ে শরণ্যা ঘরে ফিরল। নেমে গেছে বৃষ্টি। বড় বড় দানায়। হাওয়াও চলছে। যাক, মোক্ষম সময়ে ছাদে গিয়েছিল শরণ্যা।

জানলার পরদা সরিয়ে শরণ্যা বৃষ্টি দেখছিল। ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে চরাচর। বর্ষা তাহলে পুরো দমে এসে গেল? নীলাচল বলছিল এসময়ে সে নাকি একবার করে দেশে যায়। দিন সাত দশেকের জন্য। জমিজমা আছে দেশে, দাদা ভাইদের সঙ্গে চাষের কাজে হাত লাগায়। নীলাচল নিজেও নিশ্চয়ই জমি টমি কিনছে দেশে? যা গোছানো ছেলে। নীলাচল চলে গেলে এ বাড়ির বাবু বিবিদের কী হাল হয়? বদলি লোক দিয়ে যায় বটে নীলাচল, তবে সে কি আর নীলাচল হবে?

ছাঁট আসছে। ভিজে যাচ্ছে বিছানা। শরণ্যা জানলা বন্ধ করল। এইবার? এখন? উফ্, কাজে না বেরোলে দিনগুলো এত লম্বা হয়ে যায়! জামাকাপড়গুলো ইস্ত্রি করে ফেলবে? ইচ্ছে করছে না। বই? ভাল লাগছে না। এমনিই শুয়ে গড়াবে একটু? উঁহু, গা ম্যাজম্যাজ ভাব বেড়ে যেতে পারে। বেশ কিছু ডাটা কম্পাইল করা আছে, বসবে কাগজকলম নিয়ে? স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যানালিসিসের কাজ শুরু করে দিলে হয়। থাক, আজ আর ব্রেনকে ট্যাক্স করে লাভ নেই। আজ কাম্ বন্ধ্, তো কাম

কষ্ট। ইশ, অনিন্দ্যটা ঘরে থাকলেও নয় সময় কাটত। কথা বলে। কথা না বলে। কখন যে অনিন্দ্য ফিরবে?

অনিন্দ্য ফিরল সন্ধের পর। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। আকাশ তখন প্রায় নির্মেঘ। শরণ্যা তখন টিভি দেখছিল।

ওই সন্ধেটা বুঝি মৃত্যু পর্যন্ত স্মরণে থাকবে শরণ্যার।

অনিন্দ্যর হাতে ছিল চিকেন পকোড়ার প্যাকেট। এসেই চায়ের জন্য হুকুম ছুঁড়ল নীলাচলকে। হাসি হাসি মুখে শরণ্যাকে বলল, —গরম গরম খেয়ে নাও। তোমার এখন ঝাল ঝাল ভাল লাগবে বলে নিয়ে এলাম।

শরণ্যার অল্প অল্প খিদে পাচ্ছিল। তবু বলল, —বাইরের ভাজাভুজি খাবো? আমার আজকাল যা অম্বল হচ্ছে!

—কিচ্ছু হবে না। খেয়ে ফ্যালো তো। অম্বল হলে ওষুধ আছে।

অনিন্দ্যর জোর করাটা ভাল লাগল শরণ্যার। পকোড়ায় সস মাখিয়ে চিবোচ্ছে। আলগা ভাবে জিজ্ঞেস করল, —তোমার টেপের কী হল? দিল না সারিয়ে আজ?

অনিন্দ্য পোশাক বদলাচ্ছিল। শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, —ভাল মেকানিকটা নেই। কাল আসবে। কাল সন্ধে নাগাদ পেয়ে যাব।

—তোমার ক্যাসেটরা তো আজ কাঁদবে তাহলে!

—হুম্।

টুকটাক আলাপচারিতা চলছিল। টেপরেকর্ডার নিয়ে। অনিন্দ্যর আগামী ইন্টারভিউ নিয়ে। টিভির পরদায় চলমান প্রোগ্রামটা নিয়ে। তার মধ্যেই চা শেষ করল অনিন্দ্য। কাপে চুমুক দিতে দিতে আয়নার সামনে চুল বাঁধতে বসল শরণ্যা। খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলও নিজেকে। চোখের নীচে হাল্কা কালির ছোপ, গোটা মুখটা কেমন ফোলা ফোলা লাগে। রক্তশূন্যতা?

আনমনে বলে ফেলল, —জানো, মা গাইনির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করছে।

—কার সঙ্গে?

—গাইনি। ডাক্তার। মন্দিরা সেন। নাম শুনেছ?

উঠে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল অনিন্দ্য। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে বলল, —হঠাৎ ডাক্তার? এখনই?

—বা রে, এখন থেকেই তো চেক-আপ করাতে হয়। বাচ্চাটার টাইম টু টাইম কী পজিশান, গ্রোথ ঠিক মতো হচ্ছে কিনা...

—ও।

—তুমি যাবে সঙ্গে? এলগিন রোডে চেম্বার... বোধহয় এই শনিবারেই মা...

অনিন্দ্য চুপ।

—চলো না। প্লিজ।

—দেখা যাক। শনিবার তো আসুক।

আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনিন্দ্য ঢুকে গেল বাথরুমে। গরমকালে মাঝেমধ্যে সে সন্ধেবেলা স্নান করে। তোয়ালেতে মাথা মুছতে মুছতে মিনিট কুড়ি পর বেরিয়ে এসেছে।

শরণ্যা রিমোট টিপে টিভির চ্যানেল পাল্টাচ্ছিল। ঠাট্টা করে বলল, —শীতকাতুরে ছেলের আজ হঠাৎ এত গরম লাগল যে?

সামান্য চোয়াল ফাঁক করে হাসল অনিন্দ্য। তারপর হঠাৎ এসে শরণ্যার কাঁধে হাত রেখেছে, —একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—হুঁউ।

—তোমার বাচ্চাটার নড়াচড়া টের পাও তুমি?

—তোমার নয়, বলো আমাদের। শরণ্যা হাত ছোঁয়াল অনিন্দ্যর হাতে।

—যা জিজ্ঞেস করছি বলো না। টের পাও?

শরণ্যার বেশ মজা লাগল। এত দিনে তাহলে বাবুর একটু একটু টান জন্মাচ্ছে?

ঠোঁট টিপে বলল, —এখনই কী? সবে তো তিন মাস।

—কিচ্ছু বোঝা যায় না? তোমার শরীরের মধ্যে একটা ক্রিচার...

—এখন ক্রিচারই থাকে। পাঁচ মাসের আগে মানুষের ফর্মে আসে না।

—মানে এখনও তাহলে মানুষ নয়?

—মানুষ কি এক ধাপে হয়? স্টেজ বাই স্টেজ। সেই এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে... এখন ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে আছে।

অনিন্দ্য মাথা নাড়ছে আপন মনে। হঠাৎই শরণ্যার হাতে তোয়ালেটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, —এটা বাথরুমে রেখে দিয়ে এসো না, প্লিজ।

অনিন্দ্যর গালটা আলতো টিপে দিয়ে শরণ্যা বাথরুমে ঢুকল। মুহূর্ত পরেই তীক্ষ্ণ এক আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বাড়িতে। বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গেছে শরণ্যা।

নীলাচল দৌড়ে এল। আর্য পর্যন্ত ছুটে এসেছেন ঘর থেকে।

দশ

চাপা গলায় নবেন্দু জিজ্ঞেস করলেন, —বুবলি কোথায়?

—ওই তো। ব্যালকনিতে।

—কী করছে?

—বসে আছে চুপচাপ।

—আজ খাওয়া দাওয়া করেছে ঠিক মতো?

—মা তো বলছিলেন করেছে। এই তো একটু আগে দুধমুড়িও খেল।

—দুধমুড়ি কেন? একটু ভাল খাবার দাবার বানাতে পারছ না?

—খেলে তো বানাব। ওই একটু ভাতই যা জোর করে... দেখলে না, পরশু চাইনিজ ফ্রায়েড রাইস বানালাম... খেতে কী ভালই না বাসত... দু চামচ খেয়েই...

—হুম্। প্রবলেম।

চিন্তিত মুখে সোফায় বসলেন নবেন্দু। জুতো ছাড়ছেন। ঝুঁকে ফিতে খুলতে খুলতে শ্বাস ফেললেন একটা। পনেরো দিন হয়ে গেল, এখনও মেয়েটা কেমন হয়ে আছে। ভাল করে খায় না, নিজে থেকে দুটো কথা বলে না, কী ভীষণ আনমনা হয়ে থাকে সর্বক্ষণ। বাচ্চা নষ্ট হওয়ার ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারল না। কবে যে পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে?

মহাশ্বেতা সামনে দাঁড়িয়ে। দেখছিলেন স্বামীকে। জিজ্ঞেস করলেন, —তোমার আজ এত দেরি হল?

—আর বোলো না। কী বিচ্ছিরি একটা মিছিল বেরিয়েছিল। এস্প্ল্যানেড থেকে পার্ক স্ট্রিট গোটাটা জ্যাম। তুমি আটকাওনি?

—আমি তো এখন রোজই তাড়াতাড়িই চলে আসছি। তখন তো নরমালই ছিল।... চা খাবে তো?

—করো।

চলে যেতে গিয়েও মহাশ্বেতা ঘুরে এলেন। প্রায় ফিসফিস করে বললেন,—আজও নাকি আবার ফোন করেছিল!

নবেন্দু সোজা হলেন, —কখন?

—দুপুরবেলা। মা ধরেছিলেন। বুবলি নাকি আজও কথা বলেনি।

—হুম্। প্রবলেম।

জুতো জোড়া সরিয়ে রেখে নবেন্দু হেলান দিলেন সোফায়। দু হাত ডানার মতো ছড়িয়ে দিয়েছেন। গলা নীচু রেখেই বললেন,—ব্যাপারখানা কী বলো তো? মেয়ে এমন জেদ ধরে আছে কেন?

—কী করে বুঝব বলো? বুবলি তো কিছু বলছেই না।

—জিজ্ঞেস করো। চাপ দিও না। ভাল ভাবেই জানতে চাও। তুমি মা, তোমাকে হয়তো খুলে বলতে পারে।

—তোমারই তো মেয়ের সঙ্গে বেশি মনের প্রাণের কথা হত। তুমিই জিজ্ঞেস করতে পারো।

এ যেন একে অন্যের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া নয়, যেন দু'জন মানুষ থমকে আছেন, দু'জনেই শঙ্কিত যেন এমন কিছু তাঁদের শুনতে হবে যার জন্য তাঁরা প্রস্তুত নন।

নবেন্দু বললেন,—থাক। আর একটা দুটো দিন যাক।

মহাশ্বেতা বললেন,—হ্যাঁ। সময় তো পালাচ্ছে না। বুবলি হয়তো নিজে থেকেই বলবে। খোঁচাখুঁচি করলে যদি হিতে বিপরীত হয়?

কথাটা বলে দুজনেই যেন একটু স্বস্তি অনুভব করলেন। যেন সময়ের আড়াল দিয়ে ভারমুক্ত হলেন খানিকটা।

মহাশ্বেতা রান্নাঘরে চলে গেলেন। ঘরে গিয়ে পোশাক বদলানোর আগে একবার ব্যালকনিতে উঁকি দিলেন নবেন্দু। গলা যথাসম্ভব সহজ রেখে বললেন,—কী রে, এখানে বসে কেন?

—এমনিই। রাস্তা দেখছি।

শরণ্যার স্বরও সহজ। তবু কেমন যেন কৃত্রিম ঠেকল নবেন্দুর কানে। যেন মেয়ের স্বর প্রবোধ দিতে চাইছে বাবাকে, বলছে সে ঠিক আছে।

নবেন্দু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন,—অন্ধকারে বসে আছিস, মশা কামড়াচ্ছে না? বৃষ্টির পর তো খুব বেড়েছে মশা।

—হুঁউ।

—তো বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছিস কেন? ভেতরে আয়। টিভি দেখ।

—দুৎ, টিভি আমার ভাল্লাগে না।

—তো বই টই পড়। ওরকম অন্ধকারে বসে থাকিস না।

বলে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন নবেন্দু। শরণ্যার সামান্য নড়াচড়া দেখে সরে এলেন ঘরে। পোশাক বদলে বাথরুম। আজ বৃষ্টি হয়নি বলে একটা ভ্যাপসা গরম আছে, তার ওপর বাসে দীর্ঘক্ষণ ঠায় বসে থাকা। ঘামে গা চিটপিট করছে, ঘাড়ে গলায় জল ছিটোলেন ভাল করে। আজকাল আর রোজ ফিরে স্নান করতে সাহস হয় না। শরীরটা যেন হঠাৎ কমজোরি হয়ে গেছে, অল্পেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। বুবলিই যেন এই ক'মাসে বয়সটা বাড়িয়ে দিল।

বুবলির কী দোষ? বুবলি তো ছেলে পছন্দ করে নি। দায়ই হোক, আর ভুলই হোক, সে তো সবটাই নবেন্দু আর মহাশ্বেতার। মেয়ে খোলাখুলি না বললেও তাঁরা কি টের পান না বিয়েটা আদৌ সুখের হয় নি? দেবু রবিবার এসেছিল, একটা দামি কথা বলে গেল। দাদা, আমাদের মুশকিলটা কি জানো? মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময়ে আমরা ভাল পাত্র খুঁজি, ভাল ছেলে খুঁজি না। বুবলির বেলায় তো পাত্রর গুণাগুণ বিচারেও ভুল হয়েছিল। শুধু পরিবারটা দেখেই নবেন্দুরা গলে গিয়েছিলেন। আহা, কী বনেদি বাড়ি, ছেলের বাবা কত পণ্ডিত, মার কত খ্যাতি, ফার্ন রোডে অত বড় একটা বাড়ি আছে, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, আর কী চাই! মহাশ্বেতা তো নিবেদিতাকে দেখেই গদগদ। নবেন্দু মুগ্ধ হয়েছিলেন পেডিগ্রি দেখে। এটা বোঝেননি, রেসের মাঠ আর ডগ্‌-শো ছাড়া অন্য কোথাও পেডিগ্রি ব্যাপারটা মূল্যহীন। একমাত্র অন্নপূর্ণাই যা একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন।টাকাপয়সা যতই থাক, যে বাড়ির কর্তাই ঘরজামাই, সে বাড়ি কি খুব যুতের হবে রে! নবেন্দুর মা তাঁর পুরনো আমলের চোখটা দিয়েই দিব্যি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন ফ্যামিলিটাকে। ফক্কা, এক্কেবারে ফক্কা পরিবার। সাত মাস ধরে বুবলিকে শুধু কাটাপোনা খাইয়ে রাখল! ভাবলে নবেন্দুর নিজের গালেই ঠাস ঠাস চড় কষাতে ইচ্ছে করে। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র মেয়েকে এভাবে জলে ভাসিয়ে দিলেন?

বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে কটমট চোখে তাকালেন নবেন্দু। তিনি একা কেন, দোষী তো মহাশ্বেতাও। একদিন তুলোধুনা করতে হবে মহাশ্বেতাকে। ওই নিবেদিতা দেবী নাকি সমাজসেবিকা! কথায় বলে চ্যারিটি বিগিন্‌স্ অ্যাট হোম, ঘরে তিনি কী গড়েছেন?

দুটি ছেলে দুটি স্যাম্পল্। একটি পাগল, একটি গোঁয়ার। গোঁয়ার তো কোন্ জাহান্নমে গিয়ে পড়ে আছে তার ঠিক নেই। তাতে অবশ্য নবেন্দুর কাঁচকলা। কিন্তু পাগলটি তো এই ক'মাসে নবেন্দুর হাড়ে ঘুণ ধরিয়ে দিল। কী একলষেঁড়ে ছেলে! ভদ্রতা সভ্যতা বোধ নেই, সহবত জ্ঞান নেই, শ্বশুর শাশুড়িকে সম্মান করতে জানে না...। শুধু বুবলির মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে সব হজম করে যাচ্ছেন নবেন্দু। বুবলির মতো একটা সেন্সেটিভ শান্ত মার্জিত মেয়ের পক্ষে ওইরকম একটা অসভ্য ছেলেকে সহ্য করা নিশ্চয়ই খুব সহজ হয়নি। এবং ওই ছেলে নিশ্চয়ই এমন আচরণ করেছে যার জন্য বুবলি তার গলার স্বর পর্যন্ত শুনতে চাইছে না।

কী হয়েছিল বুবলির সঙ্গে? ছোকরা কি সন্দেহপ্রবণ? বুবলির চাকরি করায় আপত্তি ছিল? নাকি নিজে চাকরি খুইয়ে খেঁকি কুকুর হয়ে গিয়েছিল? নিজের রোজগার নেই, বউ কাজ করছে, তাই নিয়ে খুঁচিয়েছে বুবলিকে? কী চাপা মেয়ে, বাবা মার কাছে সব গোপন করেছে? হয়তো ওই ভয়ংকর দিনটাতেই দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল! সাংঘাতিক অপমানজনক কিছু বলেছিল বুবলিকে! হয়তো মাথার ঠিক ছিল না বলেই বুবলি অসাবধানী হয়ে আছাড় খেয়েছিল বাথরুমে!

সবই সম্ভব। সব হতে পারে।

হে ঈশ্বর, তার চেয়ে বেশি যেন কিছু না হয়। অন্তত নবেন্দুকে যেন শুনতে না হয়। তাহলে হয়তো তিনি ওই ছেলেকে...

ক্রোধ ছাপিয়েও হঠাৎ একটা বিষণ্ণতা চারিয়ে গেল নবেন্দুর বুকে। আহা গো, বুবলির মতো মেয়ের কি একটা সুস্থ বিবাহিত জীবন প্রাপ্য ছিল না? বিয়ের বোধহয় আট মাসও পেরোয়নি, তার মধ্যেই বাচ্চা নষ্ট হওয়ার মতো আঘাতও বেচারিকে সইতে হল? ভগবান যে কার কপালে কী লিখে রাখেন!

উফ্, সেই রাতটা! মনে পড়লে এখনও নবেন্দুর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। নিবেদিতার টেলিফোন পেয়ে সেদিন কী ভয় যে পেয়েছিলেন। মহাশ্বেতা আর অন্নপূর্ণারও নাড়ি ছেড়ে যাওয়ার দশা। তিনজনেরই প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বুবলি বুঝি মরে গেল! বউকে আর মাকে জোর করে বাড়িতে রেখে নবেন্দু উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটেছিলেন নার্সিংহোমে। ওটিতে নিয়ে গিয়ে তখন ওয়াশ করা হচ্ছে শরণ্যাকে। বাইরে দাঁড়িয়ে ঠকঠক কাঁপছিলেন নবেন্দু। ও বাড়ির লোকজনও ছিল। নিবেদিতা আর্য নীলাচল... অনিন্দ্যও। তবু মনে হয় কেউ নেই পাশে। একদম একা। মাঝে মাঝে নিবেদিতা এসে নবেন্দুর হাতটা ধরছিলেন। বি স্টেডি! ডাক্তারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। শরণ্যার কোনও বিপদ নেই। তবু যতক্ষণ না ডাক্তার বেরিয়ে এসে আশ্বস্ত করলেন, নবেন্দু কি এতটুকু শান্ত হতে পেরেছিলেন? মাত্র আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো সময়, অথচ মনে হচ্ছিল যেন হাজার ঘণ্টা!

ওই রাতের ছবিটাই চোখে নিয়ে নবেন্দু বেরিয়ে এলেন বাথরুম থেকে। দেখলেন ডাইনিং টেবিলে চা ঢাকা রয়েছে, সঙ্গে বিস্কুট। ওপাশে মহাশ্বেতা কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন টেলিফোনে। টিভি বন্ধ, শরণ্যা আসেনি বসার জায়গায়। নিজের ঘরে গিয়ে আবার কি শুয়ে পড়ল? সারাক্ষণ দেওয়ালের দিকে ফিরে কী ভাবে? কী দেখে? শূন্যতা?

চা শেষ না হতেই পাশে মহাশ্বেতা। মুখ ঈষৎ ভাবিত,—আজ তো রাতে ডিমের ডালনা... মেয়েটার জন্য একটু স্টু বানিয়ে ফেলি? ফ্রিজে তো চিকেন রয়েছেই।

—শবজি টবজি আছে তো?

—আছে। বিন গাজর...

—করো।... কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

—কণাদি। বুবলি এখন কেমন আছে জিজ্ঞেস করছিল।

নবেন্দুর কপাল কুঁচকে গেল,—উনি জানেন বুবলির কথা?

—জানে তো। আগেও তো ফোন করেছিল। বুবলি এখনও মনমরা হয়ে আছে শুনে দুঃখ করছিল খুব।

—এখন আর দুঃখ করে কী হবে? শুনিয়ে দিতে পারলে না, সম্বন্ধটা মোটেই ভাল দেননি? ছেলে মোটেই সুবিধের নয়?

—সে আমি মিষ্টি মিষ্টি করে আগের দিনই শুনিয়েছি।

—বলেছ, এমন ব্যবহার করেছে মেয়ে আর তার সঙ্গে কথা বলতেও চায় না?

—ঘরের সব কথা সবাইকে বলার দরকার কী? তাছাড়া সত্যি তো আমরা জানিও না বুবলি অনিন্দ্যর মধ্যে কী হয়েছে। তবে বলেছি, ওই ছেলে নরমাল নয়।

—বেশি বেশি করে বললে পারতে। নবেন্দু উঠে পড়লেন,—মাকে দেখছি না কেন? গাঙ্গুলিদের ফ্ল্যাটে গেছে নাকি?

—মা ঘরে। সন্ধে থেকেই বেশ চুপচাপ। কী যেন একটা হয়েছে!

—কী হল?

—বলতে পারব না। আমি নিজে মরছি নিজের জ্বালায়...

নবেন্দুর কপালে আবার ভাঁজ। চুপ করে কী যেন ভাবলেন একটু। তারপর গেছেন অন্নপূর্ণার ঘরে। ডাকলেন, —মা?

অন্নপূর্ণা চোখ ঢেকে শুয়েছিলেন। হাত সরালেন, —ও। তুই?

—সন্ধেবেলা শুয়ে কেন? হাঁটুর ব্যথা?

—না। এমনিই।

—তুমি তো এমনি এমনি শুয়ে থাকার মানুষ নও মা। নবেন্দু পাশে গিয়ে বসলেন, —হয় তুমি এখন মেগায় বসবে, নয় গুটি গুটি পায়ে এ ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাট করবে।

—আমার ভাল্লাগছে না রে নবু।

—কেন? কী হল?

দু হাতে ভর দিয়ে চেপে চেপে উঠে বসলেন অন্নপূর্ণা। অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, —আমার কিন্তু বুবলির ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। ছেলেটা রোজ এত করে ফোন করে, বুবলি একটি বারের জন্য কথা বলে না।

—নিশ্চয়ই কারণ আছে। তুমি তো জানো সব।

—যে কারণই থাক, ছেলেটার ওর ওপর টানটা তো আছে। হ্যাঁ, সে একটু অন্য ধারার...তা বলে শুধু বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে বলে বরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবে? তারও তো কত খারাপ লাগছে। ঝগড়াঝাঁটিও যদি হয়ে থাকে, তার সঙ্গে দুটো কথা বললে কী বুবলির মান ক্ষয়ে যাবে?

—ছাড়ো না মা। বুবলির ব্যাপার বুবলিকেই ভাবতে দাও। এমনিই মেয়েটা এত আপসেট হয়ে আছে...

—বুবলির কষ্ট কি আমার বাজছে না? কিন্তু তা বলে...আমি আজ বুবলিকে খুব বকেছি।

—ও। তাই নিজেই মনখারাপ করে শুয়ে আছ? নবেন্দু মৃদু হাসলেন, —ওঠো, ওঠো। নাতনিকে ডেকে নিয়ে বসে টিভি দেখো। বাড়িটাকে শোকপুরী করে তুলো না।

অন্নপূর্ণার কাঁধে আলতো চাপ দিয়ে বেরিয়ে এলেন নবেন্দু। ব্যালকনিতে এসে একটা সিগারেট ধরালেন। একবার দেখলেন প্যাকেটটাকে। দুটো আর পড়ে আছে। আজ এই দ্বিতীয় প্যাকেট। মাঝে সিগারেট খাওয়াটা একদম কমিয়ে দিয়েছিলেন, দিনে চার পাঁচটার বেশি খেতেন না, আবার বেড়ে গেছে। এত ধরণের ভাবনাচিন্তা...কখন যে খাওয়া হয়ে যাচ্ছে সিগারেটগুলো! অন্নপূর্ণার কথাগুলো টোকা মারল মাথায়। একটু নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার চেষ্টা করলেন নবেন্দু। এই মুহূর্তে বাবা হিসেবে তাঁর কী চাওয়া উচিত? বুবলির বিয়েটা ভাল হয়নি, এ তো প্রায় প্রথম থেকেই বোঝা গেছে। তা সত্ত্বেও তো নবেন্দু মহাশ্বেতা দু'জনেই চেয়েছেন মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে ঠিকঠাক থাকুক। অনিন্দ্য রাগ করে চলে গিয়েছিল বলে নিজেরা গিয়ে বুবলিকে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। বুক ভেঙে গেছে, তবু অনিন্দ্য চায় না বলে মেয়েকে নিজেদের কাছে এনে রাখার বাসনা নিয়ন্ত্রিত করেছেন। নিবেদিতা আর্যর সম্পর্কেও তো মহৎ ধারণাগুলো ভেঙে গেছে অনেক আগেই, তবু গত রবিবার নিবেদিতা যখন শরণ্যাকে দেখতে এ বাড়িতে এলেন, তাঁকে তো যথেষ্ট আপ্যায়ন করলেন তাঁরা। কেন করলেন? একটা ভাবনাই তো ক্রিয়া করেছে, বাবা মা হিসেবে তাঁরা এমন কিছু করবেন না যাতে বুবলির বিবাহিত জীবনে বিঘ্ন আসে। সেই ভাবনারই পরিপূরক হিসেবে এখন তাঁর কী কর্তব্য? বুবলিকে বোঝানো? অনিন্দ্যর সঙ্গে তেমন কোনও গন্ডগোল হয়ে থাকলে তার মিটমাট করে দেওয়া? অন্নপূর্ণা তো ঠিকই বলেছেন, নার্সিংহোমে সেদিন ওই ট্যাঁটা ছেলেটাও তো মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়েছিল।

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। এক আধটা তারা দেখা যায় আবছাভাবে। সামান্য বাতাস বইছে এখন। হাওয়াটা তেমন গায়ে লাগছে না। নীচে এক প্রাণচঞ্চল শহর। বাস মিনিবাস প্রাইভেট কার ট্যাক্সি লরি টেম্পোর ভেঁপু শোনা যাচ্ছে ঘন ঘন। মানুষের কোলাহল রাগী মৌমাছিদের গুঞ্জন হয়ে ধেয়ে আসছে ওপরে। মাথার মধ্যে বিনবিন করছে।

সিগারেট নিবিয়ে পায়ে পায়ে মেয়ের ঘরে এলেন নবেন্দু। টিউবলাইট জ্বলছে। শরণ্যার বুকের ওপর খোলা পড়ে আছে একটা ম্যাগাজিন, চোখ আলোতে স্থির।

নবেন্দু কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলেন,— বুবলি?

শরণ্যা ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। কিংবা ঠিক হাসি নয়, হাসির মতো কিছু। দু হাঁটু মুড়ে গুটিসুটি হয়ে বসল।

নবেন্দু অপলক দেখছিলেন মেয়েকে। সেই তাঁর ছোট্ট বুবলি যে টলমল পায়ে হাঁটতে, বাবার কোলে এলে আর কারুর কাছে যেতে চাইত না, কথায় কথায় অভিমান, বায়না আবদার... এই তো সেদিনও বিয়ের কথা যেদিন পাকা হয়ে গেল, হঠাৎ বাবার গলা জড়িয়ে ধরে ফোঁচ ফোঁচ করে কেঁদেছিল,...! মুখ তো একই আছে, অথচ ভেতরে ভেতরে কত ভূমিকম্প হয়ে গেছে মেয়েটার। সেই মেয়ে, কিন্তু এ যেন সে নয়। কত বড় বড় লাগে!

মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই আজকাল গলার কাছে কেন যে একটা ডেলা আটকে যায়? নবেন্দু গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, —তোকে বললাম একটু বসে টিভি দেখ, সেই ঘরে এসে একা একা শুয়ে থাকলি?

—এই তো, এই ম্যাগাজিনটা পড়ছিলাম।

—কোথায়? ড্যাব ড্যাব করে তো নিয়ন গ্যাস জ্বলা দেখছিলি।

শরণ্যা ফের হাসল, — দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো না।

খাটে নয়, চেয়ার টেনে বসলেন নবেন্দু। বললেন, —শরীরে এখন একটু স্ট্রেংথ্ পাচ্ছিস?

—হ্যাঁ। ভালই তো আছি এখন। ভাবছিলাম সামনের সোমবার থেকে কাজে জয়েন করব।

—পারবি? এখান থেকে অতটা পথ...?

—পারতেই হবে। শুনলে না, শুভ্র কাল কী বলে গেল? পি-এস-বি খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন। আমার ইরেগুলারিটি নিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন।

শুভ্র ছেলেটিকে মন্দ লাগেনি নবেন্দুর। শুধু কাল নয়, আগেও একদিন এসেছিল। বুবলি নার্সিংহোম থেকে ফেরার পর পরই। মজার মজার কথা বলে সাংঘাতিক ভারী আবহাওয়াকেও লঘু করে দিতে পারে। কালই তো বলছিল ওর এক মামা নাকি বেজায় ঘুমোয়, ঘুমোতে ঘুমোতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেই ক্লান্তি কাটাতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে বুবলিকে বলছিল, তুইও সেভাবে দিন কাটাবি নাকি?

নবেন্দু মাথা দুলিয়ে বললেন, —তা শুভ্রই তো পি-এস-বিকে বলেছে সব?

—তা বলেছে। তবে আমার নিজেরও খারাপ লাগছে।

—দেখ। যা ভাল বুঝিস। বললেন, প্রথম দিন আমি তোর সঙ্গেও যেতে পারি।

—মাঝে তো আরও তিন দিন আছে। চিন্তা করছ কেন, একদম ফিট হয়ে যাব। সামান্য ইতস্তত করে নবেন্দু আসল কথায় ঢুকতে চাইলেন। বললেন, —হ্যাঁ, এখান থেকেই যা যাতায়াতের অসুবিধে। ও বাড়ি থেকে তো কাছেই।

শরণ্যার মুখ সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাসে। মাথা নাড়ছে দু দিকে। অস্ফুটে বলল, —আমি আর ওখানে যাব না বাবা।

—সে কি? কেন? নবেন্দু মুখটা হাসি হাসি রাখতে চাইলেন।

শরণ্যা কোনও উত্তর দিল না। মাথা দুলিয়েই চলেছে।

নবেন্দু ফস করে আর একটা সিগারেট ধরালেন। মেয়ের চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করলেন, —তোর তো ও বাড়ি পছন্দই হয়েছিল। অবাধ স্বাধীনতা, কেউ গার্জেনি করার নেই...? নিবেদিতাদি আর্যবাবু সবাই তোকে কত ভালবাসেন...

—তোমরা কষ্ট পাবে বলে বলিনি বাবা। ও বাড়িতে কেউ কাউকে ভালবাসে না। নিজেকে ছাড়া। তোমাদের নিবেদিতাদি একটা কাঠের মানুষ। হৃদয় বলে কিচ্ছু নেই।

—অনিন্দ্য তো তোকে ভালবাসে।

শরণ্যা চুপ।

—তুই তো বলিস, তোকে ছাড়া সে থাকতে পারে না!

শরণ্যা এবারও চুপ।

নবেন্দু একটুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন মেয়েকে। প্রশ্নটা আজ করবেনই না ঠিক করেছিলেন, তবু করে ফেললেন। টেরচা চোখে বললেন, —সত্যি করে বল তো বুবলি, অনিন্দ্য কি তোর সঙ্গে কোনও মিস্ বিহেভ করেছে?

এবারও রা নেই।

নবেন্দু সামান্য অসহিষ্ণু বোধ করলেন, —চুপ করে থাকলে চলবে কেন বুবলি? আমাদের তো বুঝতে হবে কী হয়েছে! মিসক্যারেজ হয়ে যাওয়াটা খুবই শকিং। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। একটা বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে তো কী হয়েছে? আবার হবে বাচ্চা।

—হবে না। হবে না। শরণ্যা হঠাৎ ডুকরে উঠল। দু হাত মুখ ঢেকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে পাগলের মতো, —অনিন্দ্য কিছুতেই হতে দেবে না।

এগারো

অনেকদিন পর ফুলিয়া থেকে তাঁতী এসেছে। চেনা লোক। বছরে বার দু তিন আসে নিবেদিতার কাছে। বিশেষ করে জুলাই অগাস্ট

মাসটা রাজেনের বাঁধা সময়। পুজোর আগে এই সময়টাতেই নতুন নতুন ডিজাইন বেরোনো শুরু হয়। নিজের জন্য বাছাই করে দু'চারখানা শাড়ি রাখেন নিবেদিতা। তবে রাজেনের মূল লক্ষ্য থাকে সুহাসিনী। পুজোর সময়ে সুহাসিনীর মেয়েরা শাড়ি পায়। কম দামি হলেও এক লপ্তে অনেকগুলো কাপড় বিক্রি হয় রাজেনের। নিবেদিতাই সুহাসিনীর ব্যবসাটা ধরিয়ে দিয়েছেন, রাজেনের কাছে তাই নিবেদিতার খুব খাতির।

অনিন্দ্যর বিয়ের আগেও এসেছিল রাজেন। নমস্কারি শাড়ি, একে তাকে দেওয়ার শাড়ি সবই প্রায় রাজেনের কাছ থেকে রেখেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর ধারণা তিনি রাজেনের কাছে কম ঠকেন।

গাঁটরি খুলে ড্রয়িংরুমের কার্পেটে বসেছে রাজেন। খুলে খুলে দেখাচ্ছে শাড়ি। একখানা কাঁচা হলুদের ওপর সিল্ভার জরি বার করে বলল, —বউদিরে ডাকেন মাসিমা। বউদির জন্য এখানা এস্পেশাল বানায়ে আনছিলাম। কম্পুটারের ডিজাইন।

নিবেদিতা সোফায় পা গুটিয়ে বসেছেন। হেসে বললেন, —সে তো এখন নেই। বাপের বাড়ি গেছে।

—রঙখানা কেমন খুলছে?

—মন্দ নয়। তবে তোমার ওই সিলভার জরি আমার ভাল লাগে না।

—এটাই তো এখন ফেশান মাসিমা। গোল্ডেন পুরাতন হয়ে গেছে। নতুন বউদির জন্য রাখেন। খুব মানাবে।

—তুমি তো তাকে দেখোইনি। নিবেদিতা হেসে ফেললেন, —রাখো। পাশে রাখো। ওই মাখন রঙটা বার করো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ঢাকাইটা।

শাড়ি দেখার ফাঁকে ফাঁকে গল্প চলছে রাজেনের সঙ্গে। বছর তিনেক আগে একবার ফুলিয়া গিয়েছিলেন নিবেদিতা, এই রাজেনের আমন্ত্রণেই। ঘুরে ঘুরে দেখেছেন তাঁতঘর। রঙিন সুতোর টানাপোড়েন নকশা বোনা। রাজেনের বাড়ির মেয়ে বউদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। এখনও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সকলের কথা মনে আছে। নাম ধরে ধরে নিবেদিতা প্রত্যেকের খবর নিচ্ছিলেন। গত বছর বন্যায় তাঁতীদের খুব ক্ষতি হয়েছিল। মেরামতির কাজ পুরোপুরি হল কিনা, লোকসান সামাল দেওয়া গেছে কিনা, সব শুনছিলেন মন দিয়ে।

নীলাচল চা এনেছে। পরশুই দেশ থেকে ফিরেছে নীলাচল। এবার অবশ্য বেশি দিন ছুটি দেননি নিবেদিতা। মাত্র সাতদিন। তবে অঘ্রানে সে আবার যাবে। বিয়ের ঠিক হচ্ছে।

লাজুক লাজুক মুখে নীলাচল বলল, —আমার জন্যও একটা ভাল শাড়ি রাখুন মা।

নিবেদিতা হাসতে হাসতে বললেন, —তোর এখন কী? তোর বউ-এর শাড়ি তো পরে কিনব।

—আপনি তো বেনারসি দেবেন।... আমি একটা দুটো নিজে কিনব না?

শুধু শাড়ি নয়, নীলাচলের বউকে একটা গয়নাও দিতে হবে। নিবেদিতা কথা দিয়েছেন। নিজের একজোড়া দুল-টুল নয় পালিশ করে দিয়ে দেবেন। ওয়ার্ড্রোবে পড়ে থাকা সাদা বেনারসিটাও কি চালান করে দেওয়া যায় না? যাহ্, তা কী করে হয়? নতুন বউকে সাদা শাড়ি?

নীলাচল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম ছুঁড়ছে, —মাকে দেখান না, তিন-চারটে বেছে দেবেন। আমি দাম দিয়ে দেব।

—বুঝেছি। তোর অনেক টাকা হয়েছে।

শাড়ি কেনাবেচার পর্ব চলল আরও খানিকক্ষণ। রাজেন উঠল প্রায় এগারোটায়। আজ রবিবার, নিবেদিতার বিশেষ তাড়া নেই, ধীরেসুস্থে শাড়ি গোছাচ্ছেন ওয়ার্ড্রোবে। শরণ্যার জন্য রাখা শাড়িখানা আলাদা করে হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন আর একবার। রঙটা সত্যিই খুব উজ্জ্বল। শরণ্যাকে মানাবে।

এবার নিবেদিতা স্নানে যাবেন। এমনি দিনে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে হয়, ছুটির দিনের স্নান তাঁর কাছে একটা বিলাস। অনেকটা সময় নিয়ে চুলে শ্যাম্পু করবেন, জলে সুগন্ধ ছড়িয়ে শুয়ে থাকবেন বাথটবে। রবিবারের স্নানের এই সময়টুকুতেই তিনি সোমশংকরের মেয়ে হয়ে যান।

আজ সাপ্তাহিক বিলাসে বাধা পড়ল। বাথরুমে ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ জ্যোতিশংকর আর স্বরূপা হাজির। জ্যোতিশংকরের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কটা এখনও বেশ নরমে গরমে চলছে। কয়েকদিন আগেও টেলিফোনে যথেষ্ট বরফ ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে।

তবে জ্যোতিশংকর আজ বাড়িতে অতিথি। সোমশংকরের মেয়ের অতিথি অভ্যাগতদের প্রতি সৌজন্যবোধ অতি প্রবল। দারুণ আন্তরিকভাবে নিবেদিতা বললেন, —আরে, তোমরা হঠাৎ? কী সৌভাগ্য!

জ্যোতিশংকরও সোমশংকরের ভাইপো। তাঁরও মুখে অমায়িক হাসি, —তোর বউদির এক কাকা মারা গেছেন। আজ শ্রাদ্ধ। পূর্ণদাস রোডে। ভাবলাম শ্রাদ্ধবাড়ি ঢোকার আগে তোর বাড়ি একবার ঘুরে যাই।

—খুব ভাল করেছ। ক'দ্দিন পর এলে। বলেই মুখটা করুণ করে নিবেদিতা স্বরূপার দিকে ফিরেছেন, —তোমার কোন কাকা গো?

—বড়কাকা। সেই যে, যিনি জার্মানিতে ছিলেন।

—ও। খুব ভুগছিলেন বুঝি?

—বয়স হয়েছিল। জ্যোতিশংকর বললেন, —পঁচানব্বই।

—না গো। প্রায় সাতানব্বই। স্বরূপা বলে উঠলেন, —অসম্ভব ফিট ছিলেন। চাকরের সঙ্গে রোজ সকালবেলা লেকে যেতেন। আমরা তো ভেবেছিলাম একশোই পূর্ণ করবেন। হল না।

সম্পূর্ণ অচেনা সেই কাকাটিকে নিয়ে পরিমিত কৌতূহল দেখালেন নিবেদিতা। বললেন, —কী খাবে বলো? সরবৎ? না চা কফি?

—সরবৎই বল্। জ্যোতিশংকর সোফায় ছড়িয়ে বসেছেন, —তোর সঙ্গে আমার একটা কথাও আছে।

নিবেদিতা জানেন জ্যোতিশংকর অকারণে আসার বান্দা নন। বললেন, —বলো।

স্বরূপা তাড়াতাড়ি বললেন, —তোমরা ততক্ষণ কথা সেরে নাও। আমি বরং আর্যদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

স্বরূপা চলে গেলেন ম্যাজেনাইন ফ্লোরে। নীলাচলকে সরবৎ বানাতে বসে এসে বসলেন নিবেদিতা। বললেন, —মিনু তো এসে গেছে।

—তুই খবর পেয়েছিস?

—হ্যাঁ এসেই মিনু ফোন করেছিল।... তুমি তাহলে এবার রেজিস্ট্রির ডেট্‌টা ফাইনাল করে ফেলো।

—সেই কথাই তো বলতে আসা। লাখোটিয়া তো এখন আবার একটু বেগড়বাই করছে।

—কেন? ওর সঙ্গে তো কথা হয়েই আছে!

—ও একটু টাইম চাইছে। গড়িয়ায় কী একটা হাউজিং কমপ্লেক্স করেছে, সেখানে নাকি করপোরেশানের সঙ্গে কী সব ঝামেলা চলছে। জলের কানেকশান পাচ্ছে না, কাউকে পজেশানও তাই দিতে পারছে না। বলছিল প্রচুর টাকা নাকি আটকে গেছে।

—ওসব গল্প শুনে আমাদের লাভ নেই। লাখোটিয়ার সঙ্গে যা এগ্রিমেন্ট আছে, তাতে আমরা রেজিস্ট্রির দিন ঠিক করলে সে টাকা দিতে বাধ্য।

—আহা, লাখোটিয়া তো সে কথা অস্বীকার করছে না। শুধু আরও মাসখানেক সময়...

—তা কী করে হয়? আমরা কেন ওয়েট করব? সে মারবে দাঁও, তারপরও সব কিছু তার ইচ্ছে মতো হবে...

—আমিও লাখোটিয়ার ওপর কাল খুব চেঁচামিচি করেছি।

—জানি না কী করেছ। পুরো ব্যাপারটা তোমার ওপর ছেড়ে দিয়েছি, তুমি যা বলবে তাই মানতে হবে।

—তুই বারবার আমার দিকে আঙুল তুলিস কেন বল তো খুকু? আমি তো সবসময়ে তোর সুবিধেই দেখার চেষ্টা করছি। মিনুর তো আসার কথা ছিল পুজোর মুখে মুখে, আমিই তো ওকে তোর কথা বলে আগে আগে আনালাম।

—তাই কি? মিনু যে বলল ভিসার টাইম শেষ হয়ে গিয়েছিল? আর এক্সটেনশান পায়নি?

—ও। তা হবে। জ্যোতিশংকর যেন সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, —তা তুই এখন কী করতে চাস?

—তুমিই বলো।

—এক কাজ কর না, লাখোটিয়াকে ছেড়ে দিই। তোর এত জানাশুনো, তুই একটা অন্য প্রোমোটার দেখ। অবশ্য তাকেও অন্তত লাখোটিয়ার প্রাইসটা দিতে হবে।

—বাহ সোনাদা, উলটো কোর্টে বল ঠেলে দিচ্ছ? ভাল করেই জান এসব নেগোসিয়েশান হুট বললেই হয় না।

—তাহলে একটু ধৈর্য ধর। এক দেড় মাসে কী এমন পৃথিবী উলটে যাবে?

পৃথিবী নয়, সুহাসিনী তো উলটে যেতে পারে। অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং-এর জন্য এখন থেকেই উঠে পড়ে লেগেছে দময়ন্তীরা। একদিন দীপালির বাড়িতে নাকি একটা গ্যাদারিং-ও হয়ে গেছে। এবার এক্সিকিউটিভ বডির খোলনলচেটা ওদের বদলে দেওয়ার প্ল্যান। নিবেদিতা টের পাচ্ছেন। অর্চনাকে হয়তো সরাবে না, অর্চনার বরের উঁচুমহলে দহরম মহরম... তাছাড়া অর্চনা ওদেরই তালে তাল দেয়। বাকি ভাইটাল পোস্টগুলোতে ওরা...

নিবেদিতা মনে মনে হিসেব কষলেন। সামনের মাসের শেষেও টাকাটা হাতে এলে হপ্তা দুয়েক টাইম থাকে। চোদ্দো পনেরো দিনের ক্যাম্পেনে হাওয়া ঘোরাতে পারবেন না?

চোখ সরু হল নিবেদিতার, —ঝেড়ে কাশো তো সোনাদা। এক মাস? না দেড় মাস?

—লাখোটিয়া বলছে এক। আমি ধরছি দেড়।

—যদি লাখোটিয়া কথা না রাখে? লাস্ট মোমেন্টে ডোবায়?

—আমি তো ওপেন অফার দিলাম। তুই পারলে অন্য প্রোমোটার ফিট কর।

ওফ, খেলোয়াড় বটে। ভেতরে ভেতরে চিড়বিড় করে উঠলেন নিবেদিতা। তবে ঠোঁটের হাসিটি নিবল না। নীলাচলের রেখে যাওয়া সরবতের গ্লাস এগিয়ে দিলেন খুড়তুতো দাদাটিকে। কমলা পানীয়ে চুমুক দিচ্ছেন জ্যোতিশংকর, নির্বিকার মুখে।

স্বরূপা ফিরেছেন। কৌতূহলী মুখে বললেন, —অনিন্দ্য, সুনন্দ কাউকে দেখছি না কেন? বাড়ি নেই?

—ছুটির দিন তো। কথাটা আলগাভাবে ভাসিয়ে দিলেন নিবেদিতা, —বেরিয়েছে সবাই যে যার মতো।

—দেখো কাণ্ড, কী সব উলটোপালটা কথা রটে!

—কী রটেছে?

—সুনন্দ নাকি রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে...

—কে বলল?

—কে যেন বলছিল। ননীদি, না শ্যামাদা...

এসব সংবাদ কি হাওয়ায় ওড়ে? কত সতর্কভাবে কেলেঙ্কারিটা গোপন রেখেছেন নিবেদিতা, সেই ছড়িয়ে গেল আত্মীয়মহলে?

উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে নিবেদিতা বললেন, —তুৎ, বাজে কথা। সুনন্দ গেছে এক বন্ধুর বাড়িতে। হাওড়ায়। ওদের ক্যাসেট বেরোবে তো, এখন দিনরাত ওখানে রিহার্সাল চলছে।

জ্যোতিশংকর গ্লাস শেষ করে পাশে রাখলেন, —তবে যে তুই বললি ছুটির দিন বলে এধার ওধার বেরিয়েছে?

—ওমা, তাই বললাম নাকি? নিবেদিতা রাজনীতিকদের মতো হাসলেন, —আমি অনিন্দ্যর কথা বলছিলাম।

—ও। তাই বল।... হ্যাঁ রে, সুনন্দদের দলটার যে কী নাম?

—কী যেন একটা। উদানী ব্যাণ্ড, না কী যেন।

—খাসা নাম! তোর উদাসি ছেলের উদানী ব্যাণ্ড!

হুঁহ, উদাসি ছেলে! হাড়ে সেয়ানা। এই তো সেদিন হাতচিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিল বন্ধুকে, ছেলেটা এসে সুনন্দর জামাপ্যান্ট নিয়ে গেল। এখনও তেজে মটমট করছে ছেলে। থাক গিয়ে যেখানে খুশি, দেখি বন্ধুরা ক'দ্দিন খাওয়ায়! পেটে টান পড়লে তো ফিরতেই হবে।

মনে মনে ভাবলেন, বটে নিবেদিতা, তবে চিন্তাটায় তেমন জোর পেলেন না। অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ছেলে দুটো তাঁর একটুও মাথা নোয়াতে শেখেনি।

ভেতরটা একটু খচখচও করছিল নিবেদিতার। নির্জলা মিথ্যেটা বলে দিলেন বটে, ধরা পড়ে যাননি তো? কিন্তু বিশ্বাস নেই, আর্যর কাছেই হয়তো সুনন্দ-সমাচার শুনে এসেছে স্বরূপা, নিবেদিতার সঙ্গে একটু খেলে নিল, বাড়ি গিয়ে স্বামী-স্ত্রী হয়তো তুমুল হাসাহাসি করবে।

সুনন্দটা যে কেন এমন বেকায়দায় ফেলল?

জ্যোতিশংকরদের উপস্থিতি আর মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না নিবেদিতার। কাজের কাজ কিছু করে না, বাড়ি এসে ঘোঁট পাকায়। মাঝখান থেকে নিবেদিতার স্নানটা মাথায় উঠল। নিবেদিতা ইচ্ছে করেই দেওয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন, যদি ইঙ্গিতটা বোঝে।

জ্যোতিশংকরও কবজি উলটোচ্ছেন। স্বরূপাকে বললেন, —এবার তো উঠতে হয় গো। তা তোমার কী বলার ছিল বললে না খুকুকে?

—হ্যাঁ কথাটা বলব কিনা ভাবছিলাম। স্বরূপা নড়েচড়ে বসেছেন, কণা হঠাৎ পরশুদিন আমার কাছে এসেছিল।

—কোন কণা?

—শরণ্যার মাসি। একগাদা কথা শুনিয়ে গেল। আমার একদম ভাল লাগল না।

—কী বলেছে?

—শরণ্যার বাবা মার নাকি তোমাদের ওপর খুব প্রিভাঙ্গ। শরণ্যার মিসক্যারেজের জন্য ওরা তোমাদেরই দায়ী করছে।

—আমাদের? নিবেদিতা অবাক, —কেন?

—তোমরা মানে... মেইনলি অনিন্দ্যকেই।

—স্ট্রেঞ্জ! অনিন্দ্য কী করবে? অ্যাক্সিডেন্ট হয় না?

—সে আমি কী করে বলব ভাই? তোমাদের ইন্টারনাল ব্যাপার... ওরা বলছে, জানিয়ে দিয়ে গেলাম। কণা আমাকেও তো খুব অ্যাকিউজ করে গেল। আমি নাকি অনেক কিছু চেপে গেছি, অনিন্দ্যর নেচারের কথা আগে ওদের বলিনি, শুনলে হয়তো ওরা আদৌ এ বিয়েতে এগোত না...

—অনিন্দ্যর নেচার? মানে?

স্বরূপা ঠোঁট উলটোলেন। ভঙ্গিটা এমন, সে আমি আর মুখে কী বলব!

মাথা দুলিয়ে বললেন, —যাক গে, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এবার কিন্তু তুমি ট্যাক্টফুলি ব্যাপারটা সামলে দাও। তোমারও তো সমাজে একটা মানসম্মানের ব্যাপার আছে। সর্বত্র গিয়ে যদি এরকম কুৎসা করে বেড়ায়...!

স্বরূপা, জ্যোতিশংকর চলে যাওয়ার পর নিবেদিতা গুম হয়ে বসে রইলেন। ভাবছেন। স্বরূপার কথা শুনে এখন যেন কেন মনে হচ্ছে অনিন্দ্য কিছু একটা গণ্ডগোল বোধহয় করেছে। নইলে ছেলে এমন গুমসুম মেরে থাকে কেন? নীলাচলের ওপর হাঁকডাক নেই, গজগজ নেই, মার মুখোমুখি হলে ক্যাটোস ক্যাটোস ঝগড়াও নেই...! বাড়িতেও নাকি থাকে না সারাদিন। নীলাচল বলছিল মদের মাত্রাও নাকি বেড়েছে। নিবেদিতা ভাবছিলেন ছেলে বুঝি মনোকষ্টে আছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন... নার্সিংহোমেও অনিন্দ্য সেদিন কেমন চোরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল না?

ক্ষীণভাবে একটা ছবি মনে পড়ল নিবেদিতার। দু'মাসের সুনন্দকে শুইয়ে রেখে নিবেদিতা বাথরুমে ঢুকেছেন, হঠাৎ নির্মলার আর্ত চিৎকার, ওরে বাবা রে, কী খুনে ছেলে রে, বাচ্চাটাকে মেরে ফেলল রে...! কী হয়েছে? না পাঁচ বছরের অনিন্দ্য ভায়ের বুকে চড়ে বসে খিমচোচ্ছে ভাইকে! হিংসে। তার প্রতি মনোযোগে ঘাটতি পড়েছে বলে।

সাম্প্রতিক ছবিটাও ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল নিবেদিতার কাছে। নীলাচলের কাছে শুনেছেন বাথরুম সেদিন ভীষণ পিছল হয়েছিল! অনিন্দ্যই কি তবে ইচ্ছে করে সাবানজল...?

নিজের অনাগত বাচ্চাকেও হিংসে করতে শুরু করেছিল অনিন্দ্য?

বিশ্বাস করতে মন চায় না। তবে সব মায়ের হৃদয়েই গান্ধারী না থাক একজন ধৃতরাষ্ট্র তো থাকেই, নিবেদিতার মতো মহিলাও তার ব্যতিক্রম নন। ক্রমশ নিবেদিতার মনে হতে থাকল তার ছেলের নামে মিথ্যে অভিযোগও তো আনা হতে পারে। সাবানজল যদি অনিন্দ্য ফেলেও থাকে, শরণ্যা খেয়াল করেনি কেন? পেটের বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তো তারই! আহা রে, অনিন্দ্যটার কী চেহারা হয়েছে! রুক্ষ চুল, চোখমুখ বসে গেছে, গাল চুপসে এতটুকু। অন্যায় যদি কিছু করেও থাকে, মনে মনে পুড়ছেও তো ছেলেটা!

নাহ, একটা কিছু করা দরকার। শরণ্যা এ বাড়িতে না ফিরলে আজেবাজে কথা রটতেই থাকবে। আত্মীয়স্বজনদের তো শুনে নুন দিতে নেই, তারাও ঘোঁট পাকাবে নানানরকম। আড়ালে যথেচ্ছ নিন্দামন্দ করবে অনিন্দ্যর। এবং নিবেদিতারও। তা করুক, নিবেদিতা কেয়ার করেন না। আড়ালে তো রাজার মাকেও লোকে ডাইনি বলে। কিন্তু এক কান থেকে পাঁচ কান, পাঁচ কান থেকে সাত কান চললে তো মুশকিল। সুহাসিনী অবধি গুজবটা পৌঁছে গেলে নিবেদিতা মুখ দেখাবেন কী করে?

সাত-পাঁচ ভেবে কর্ডলেসটা হাতে নিলেন নিবেদিতা। মানিকতলার নম্বর টিপলেন টকটক।

মহাশ্বেতা ফোন ধরেছেন, —হ্যালো?

—আমি নিবেদিতাদি বলছি।

—ও।...বলুন?

—কেমন আছো তোমরা?

—চলছে একরকম। আপনি ভাল?

মহাশ্বেতার স্বরটা বেশ আড়ষ্ট ঠেকল নিবেদিতার। জোর করে উচ্ছ্বসিত হলেন, —আর বোলো না। কাজের চাপে দম বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। তোমাদের একটা ফোন পর্যন্ত করে উঠতে পারছি না।

—ও।

—এই তো সকাল থেকে যতবার ভাবি, বাধা পড়ে যায়। দুম করে আমার তাঁতী এসে গেল। ওর কাছ থেকে প্রতি বছর সুহাসিনীর মেয়েদের জন্য শাড়ি রাখি তো। আজ শরণ্যার জন্যও একটা রাখলাম। ও কাঁচা হলুদ রঙ ভালবাসে তো?

—আপনার ছেলের বউ-এর পছন্দ অপছন্দ আপনারও তো জানা উচিত নিবেদিতাদি। নয় কি? বুবলিকে তো আমরা আপনার জিম্মাতেই দিয়েছিলাম।

নিবেদিতা ঠোক্কর খেলেন। নরম করে বললেও মহাশ্বেতার সুরটি বক্র।

তবু নিবেদিতা আপসের স্বরেই বললেন, —না না, আমিও জানি। ওকে তো ইয়েলো পরতেও দেখেছি...। শরণ্যা কোথায়? দাও তো একটু, ওর সঙ্গে কথা বলি।

কয়েক সেকেন্ড ও প্রান্তে শব্দ নেই। তারপর ফের স্বর বেজেছে, —বুবলি এখন শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে।

—এখনও উইকনেস কাটল না?

—না, এখন সুস্থই। কাজে জয়েন করে গেছে। এমনিই ঘুমোচ্ছে।

—বাহ, ভাল খবর। কাজকর্মে থাকলে মনটাও তাড়াতাড়ি চাঙা হয়ে যাবে।

—হুঁ।

—তা কবে গাড়ি পাঠাব? শরণ্যা আসছে কবে?

—বুবলি এখন যাবে না নিবেদিতাদি।

—সে কি? কী হল? ও তো এখন...?

নিবেদিতার প্রশ্ন শেষ হল না, হঠাৎই এক পুরুষকণ্ঠ ঠিকরে এসেছে রিসিভারে। নবেন্দুর কর্কশ স্বর ঝনঝন করে উঠল, —আমার মেয়ে আর আপনাদের বাড়ি কোনওদিনই যাবে না। শুনতে পেয়েছেন? শী হেট্স টু গো দেয়ার।

নিবেদিতা পলকের জন্য বিমূঢ়। গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল, —কিন্তু কেন?

—কেন জিজ্ঞেস করছেন? যান, আপনার শয়তান ছেলেটাকে গিয়ে প্রশ্ন করুন। সে তো আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। হি ইজ আ মার্ডারার। খুনী।

আঘাতের তীব্রতা সহ্য করতে নিবেদিতার মতো পোড় খাওয়া মানুষেরও সময় লেগে গেল। খানিকটা আত্মরক্ষার সুরে বলে উঠলেন, —আপনি কী বলছেন কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। এত উত্তেজিত হয়ে গেলেন কেন? যদি ভুলভ্রান্তি কিছু ঘটেই থাকে, সেটা তো শুধরে

নেওয়া যায়। উই ক্যান সিট অ্যান্ড টক। আফটার অল আমরা ভদ্রলোক...

—কায়দা মারা কথা বলবেন না। নবেন্দুর গলা আছড়ে পড়ল, —আপনাদের ভদ্র চেহারা দেখা হয়ে গেছে। নিজেদের মুখটা আয়নায় দেখুন।... হুঁহ, ঘরে একটা ক্রিমিনাল পুষে সমাজসেবা হচ্ছে!

আর কত সহ্য হয়? নিবেদিতারও গলা চড়ে গেল, —আপনি কিন্তু লিমিট ক্রস করে যাচ্ছেন নবেন্দুবাবু। আপনি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন না।

—গায়ে বিঁধছে, অ্যাঁ? শুনুন, আপনার কপাল ভাল আমরা থানা পুলিশ করিনি। আপনার ওই ছেলেকে হাজতে পোরা উচিত ছিল। আপনিও বেঁচে গেলেন, কোমরে দড়ি পড়ল না। এখনও যদি ভাল চান, ছেলেকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। অ্যান্ড ডোন্ট ট্রাই টু ডিসটার্ব মাই ডটার এগেন। ছেলেকেও বলে দেবেন, যদি আর কোনওভাবে বুবলিকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করে, আমি ওকে জুতোপেটা করব।

নিবেদিতার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। অপমানে জ্বলছে সর্ব শরীর। সোমশংকরের মেয়েকে এভাবে চড় মারল? একটা পেটি মিডলক্লাস লোক? কী স্পর্ধা!

বারো

পার্থসারথি আজ দুপুরে এসেছিলেন চেতনায়। ছিলেন অনেকক্ষণ। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন কাজের অগ্রগতি। প্রশ্ন করছিলেন ঘন ঘন, জেরার ভঙ্গিতে। তবে কাজকর্মের খতিয়ান দেখে তিনি সন্তুষ্ট না বিরক্ত তা পরিষ্কার বোঝা গেল না। আবার তাঁর ডাক এসেছে আমেরিকা থেকে। বেশ কয়েকটা সিমপোসিয়ামে যোগ দিতে হবে, ভিজিটিং প্রফেসার হিসেবে কিছু ক্লাসও নেবেন এদিক সেদিক। এ মাসের শেষে তিনি পাড়ি দিচ্ছে ও দেশে, ফিরতে ফিরতে সেই ক্রিসমাস। ইতিমধ্যে শুভ্র আর শরণ্যা কী কাজ করবে তার একটা খসড়াও বানালেন বসে বসে। আরও একজনকে প্রোজেক্টের কাজে নিয়োগ করছেন পার্থসারথি। তাঁরই ছাত্র, তবে এখন এক কলেজের অধ্যাপক। তাঁর কাজের পরিধিটাও শরণ্যাদের বুঝিয়ে দিলেন। শরণ্যাকে ই-মেল করতে বললেন নিয়মিত, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যাওয়ার উপদেশ দিলেন। শুভ্রকে বললেন কাজে এতটুকু অসুবিধে হলে কোথায় কখন কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আরও একটা নির্দেশ। এতদিন যা হয়েছে, চটপট তার একটা সিনপসিস বানিয়ে দাও। সাতদিনের মধ্যে। ডিটেলেও নয়, আবার খুব শর্টেও নয়, যেন চোখ বুলোলেই গোটা ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যায়। আমেরিকার ইউনেস্কোর দপ্তরে যাবেন তিনি, সংক্ষিপ্তসারটা অবশ্যই সেখানে জমা করা দরকার।

প্রায় ছ'টা নাগাদ বিদায় নিলেন পার্থসারথি। শুভ্র আর শরণ্যা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এতক্ষণ যেন নিঃশ্বাস ফেলা যাচ্ছিল না। শুভ্র তো টেবিল ধরে ওঠবোস করে নিল একটু, সামনে হেলে পিছনে হেলে কোমর ছাড়াচ্ছে।

শরণ্যা ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল। বলল, —স্যার আর একজনকে গুঁজে দিলেন কেন বল তো?

—বুঝলি না, খোঁচর ফিট করে দিয়ে গেলেন। ও তোমাদের এই কাজ দেখবে, ওই ডাটা কমপাইল করবে, ওই রিপোর্ট প্রসেস করবে... এসব কথার তো একটাই মানে। একটা ওয়াচডগ বসে গেল।

—চিনিস ভদ্রলোককে? কী যেন নাম বললেন... জয়ন্ত সিনহা না কে...?

—বিলক্ষণ চিনি। ডিপার্টমেন্টে তো ভদ্রলোকের খুব যাতায়াত। দেখিসনি? মোটা মতন কালো মতন, হাতে সবসময়ে ইয়া বড় ফোলিও ব্যাগ...? দেখে মনে হয় বিছানাপত্র পুরে নিয়ে ঘুরছে...! হি ইজ আ মাদুরে।

—মানে?

—বুঝলি না? প্রাইভেট টিউশন যারা করে, তাদের দুটো টাইপ আছে। একটা ভাদুরে, আর একটা হল মাদুরে। যারা ধর টাকার দরকার পড়ল বলে কিছুদিন প্রাইভেট পড়াল, তারপর ছেড়ে দিল, তারা হচ্ছে ভাদুরে টাইপ। সিজনাল। আর যারা সারা বছর ধরে সকাল সন্ধে...। জয়ন্ত সিনহা পড়ায় সেন্ট্রাল ক্যালকাটার একটা কলেজে, তবে ওর মাদুর ছড়ানো আছে সেই সুন্দরবন পর্যন্ত। দুটো চারটে বাঘও নাকি পড়তে আসে। এখন টিউশনি নিয়ে হুড়কো চলছে তো, তাই ওদিকটা কমিয়ে এদিকে ধান্দা করছে।

—যাহ্। কোথ্ থেকে এসব খবর পাস বল তো?

কাঁধ ঝাঁকাল শুভ্র। উত্তর না দিয়ে বলল, —চ চ। আমার আবার বাড়ি গিয়ে মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

সন্ধে এখনও তেমন গাঢ় হয়নি। স্ট্রিট লাইট জ্বলে গেছে, মিহি আলোকে ঢেকে দিয়েছে নিয়নবাতি। আকাশে মেঘ আছে থোকা থোকা। ভারী ভারী। বৃষ্টি ক'দিন হচ্ছে না, সারাদিনই একটা চিটপিটে গরম। বাতাস প্রায় নেইই। ঘাম যেন শুকোতেই চায় না।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মার কথাই বলছিল শুভ্র, —মার পেটের পেইনটা কিছুতেই যাচ্ছে না, বুঝলি?

—ডাক্তার কী বলছে?

—ডাক্তাররা তো কিছু বলে না। করে। কিংবা বলতে পারিস করায়। একের পর এক টেস্ট করিয়েই চলেছে। ব্লাড স্টুল ইউরিন এক্সরে আলট্রাসোনো বেরিয়াম...। আজ সাড়ে আটটায়, স্পেশালিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। দেখি, তিনি আবার কী কী লিস্ট ধরান।

—এনডোস্কোপি হয়েছে?

—নাহ্। বললে করাব। আমি তো লাস্ট ডাক্তারকে স্ক্যানের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বললেন এক্ষুনি দরকার নেই। কী বিচ্ছিরি লাগে বল তো, কিচ্ছু মুখে তুলতে চায় না। ঠাণ্ডা দুধ খেলেও নাকি পেটে ব্যথা হয়। তাও তো আমি জোরজার করে ইনটেক করাচ্ছি। গলা ভাত, নয় খিচুড়ি... লিকুইড নিক, সেমিসলিড নিক...

শরণ্যা কিছু শুনছিল, কিছু শুনছিল না। তার চোখ ঘুরছে এদিক ওদিক। নাহ, নেই। সেদিনের ডোজটায় কাজ হল তাহলে?

বিচ্ছিরি ধরণের উৎপাত শুরু করেছিল অনিন্দ্য। বাড়িতে ফোন করে কলকে না পেয়ে শেষে অফিসে ফোন। কী নাকি কথা আছে বলতে চায়! শোনার এতটুকু প্রবৃত্তি হয়নি শরণ্যার, ঘটাং করে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই অফিসে হাজির। ভেতরে ঢুকতেই দেয়নি শরণ্যা, দরজা থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাতেও কি নিস্তার আছে? ক'দিন পর থেকেই শুরু হল নতুন উপদ্রব। শরণ্যার অফিসের আশে পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনওদিন দেশপ্রিয় পার্কের রেলিঙে হেলান দিয়ে, কখনও পানের দোকান, কখনও বাসস্টপে। শরণ্যা তার অস্তিত্বকে আমলই দিতে চায়নি, অনিন্দ্যকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেশি উচ্ছল হয়ে গল্প করত শুভ্রর সঙ্গে। একটু অস্বচ্ছন্দও লাগত, ওই ছেলেটার দৃষ্টি যেন গায়ে লেগে থাকত বিষ্ঠার মতো।

দুম করে গত শুক্রবার শরণ্যা মুখোমুখি হয়েছিল মূর্তিমান উপদ্রবের। কাঁহাতর আর এই নিঃশব্দ অত্যাচার সহ্য করা যায়? শুভ্র বারবার বলেছিল, ইগনোর কর ইগনোর কর! কদ্দিন আর টেনাসিটি থাকবে, অ্যাঁ? ধরেনে না, অফিসের বাইরে একটা বিনি মাইনের চৌকিদার পেয়ে গেছিস!

শুভ্রর উপদেশ অগ্রাহ্য করে গটমট চলে গেল শরণ্যা, —তোমার মতলবটা কী বলো তো? তুমি কি আমায় কিছুতেই মুক্তি দেবে না?

অনিন্দ্য বুঝি আশা করেনি শরণ্যা এগিয়ে আসবে। থতমত খেয়ে টানটান। গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোটরে ঢোকা দুটো চোখ জ্বলছে যেন। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, —আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

—কতবার তোমায় বলব, তোমার কোনও কথা আমার শোনার ইচ্ছে নেই? সব শেষ হয়ে গেছে। ফিনিশড। বুঝেছ?

—কিন্তু আমি যে বলতে চাই।

—আমি শুনব না।

—কেন শুনবে না? কেন শুনবে না তুমি? অনিন্দ্যর স্বর হঠাৎই বদলে গেল। মুখ বিকৃত করে বলল, —বুঝেছি। খুব মস্তিতে আছ এখন, অ্যাঁ?

—কী-ই? শরণ্যার চোখে আগুন, —লজ্জা করল না নোংরা কথা বলতে?

—গায়ে লাগল বুঝি? অনিন্দ্যও হিসহিস করছে, —এতই যখন আমায় অপছন্দ, তখন ভালবাসার ন্যাকামোটা করেছিলে কেন?

—আমি ন্যাকামো করেছি? তোমার সঙ্গে?

—করোনি? বলোনি, অনি, আমি তোমার? তুমি আমার সব? দার্জিলিং-এর ম্যালে তোমায় একা রেখে চলে এসেছিলাম বলে কাঁদোনি তুমি?

পথচলতি লোকজন ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। তাদের টেরাবেঁকা দৃষ্টি যেন বিঁধছিল শরণ্যাকে। বুঝতে পারছিল না, অনিন্দ্য কি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে? নাকি পাগলের অভিনয় করছে? মন ভিজিয়ে খাঁচায় পুরে ফেলার এও কি এক কৌশল?

রুক্ষ থেকে রূঢ় হল শরণ্যা। চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, —রাস্তায় সিন্ ক্রিয়েট কোরো না। আমি যদি চেঁচিয়ে এখন লোক জড়ো করি, তোমার কী হবে আন্দাজ করতে পারো? ফের যদি তোমায় এই চৌহদ্দিতে দেখি, আমি পুলিশে রিপোর্ট করব।

—পুলিশ দেখাচ্ছ? পুলিশ? অনিন্দ্য যেন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। রাগে গরগর করছে, হাতের মুঠো পাকাচ্ছে, পা ঠুকছে ফুটপাথে, —আমিও দেখে নেব। আমিও দেখে নেব।

—যা খুশি করো। জাহান্নমে যাও।

বলেই ঘুরে উল্টো হাঁটা। শেষ কয়েক পা প্রায় দৌড়েই শুভ্রর কাছে। ঝট কর ঘুরে দেখল একবার। না, অনিন্দ্য আর নেই।

সেই থেকেই আর নেই। বিদেয় হয়েছে আপদটা। তবু যে কেন অফিস থেকে বেরিয়েই শরণ্যার চোখ দুটো একবার চারদিকে ঘুরবেই?

শরণ্যার ক্ষণিক অন্যমনস্কতা নজরে পড়েছে শুভ্রর। মার গল্প থামিয়ে টেরচা চোখে তাকাল, —কী রে, খুব হতাশ হলি মনে হচ্ছে?

—যাহ্। হাড় জুড়িয়েছে আমার।

—বেচারাকে মনটা জুড়োনর স্কোপটা দিলি না? বলে ফেললে অনিন্দ্যও মুক্তি পেত, তোরও রোজ রোজ চোখের ব্যায়াম হত না।

—ফাজিল কোথাকার। হেসে ফেলল শরণ্যা। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে বাসস্টপের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে বলল, —ওর বলার আর ছিলটা কী? হয় বলতো, আমি নিরপরাধ, আমায় তুমি ভুল বুঝো না! নয়তো, আমি ভুল করেছি, আমায় তুমি ক্ষমা করে দাও!

—তাই নয় শুনে নিতিস। কান তো ক্ষয়ে যেত না।

—শুনে কী লাভ? আমি তো ছেলেটাকে চিনে গেছি।

—মানুষকে কি আদৌ চেনা যায়?

—অনিন্দ্যকে যায়। একটা আদ্যন্ত ক্রুকেড ছেলে। সবসময়ে ব্রুড করছে, কারুর ওপর সন্তুষ্ট নয়, চাকরি টিঁকিয়ে রাখতে পারে না, অফিসে কথায় কথায় ঝগড়া বাধায়, মা বাবার সম্পর্কেও যা মুখে আসে তাই বলে... মিনিমাম ফিলিংটা পর্যন্ত নেই। ভাব তুই সিচুয়েশানটা! বাচ্চা হবে তুই চাস না, ঠিক আছে চাস না। কিন্তু সংসার করতে গেলে কিছু তো তোকে মেনে নিতেই হবে। আদার হাফেরও তে ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে একটা ব্যাপার আছে। উদ্ভট বায়না জুড়লে চলবে কেন? অনিন্দ্যর প্রবলেম, সে কিছু মানতেই শেখেনি। শরণ্যা মাথা ঝাঁকাল, —সব চেয়ে বড় কথা, সেদিন কী সাংঘাতিক অ্যাক্টিংটা করল! দিব্যি হাসিখুশি, দেখে মনে হয় কী নরমাল, অথচ ভেতরে ভেতরে প্ল্যান ভেঁজে চলেছে!

—কুল কুল। শুভ্র একটা সিগারেট ধরাল। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, —দেখ শরণ্যা, আমি বলছি না অনিন্দ্য মুখার্জি একটা ভাল মানুষ। আমি এও বলছি না, অনিন্দ্যকে তুই ক্ষমা করে দে। বোঝাই যায় সে অ্যাবনরমাল। একটু নয়, ভাল মতোই। কিন্তু সে তো সবসময়ে অ্যাবনরমাল থাকত না। থাকত কি? বল?

—কী বলতে চাইছিস? শরণ্যা ঝটিতি ঘুরেছে।

—এমন তো হতেই পারে, ওই দিন সে অ্যাক্টিং করেনি। ওটা তোর মনের ভুল।

—মানে?

—তুই তো নিজেই বলেছিস, অনিন্দ্য যদি কিছু করে এই ভয়ে তুই কাঁটা হয়ে থাকতিস। ঠিক কী না?

—বটেই তো। আমার প্রেগনেন্সিটা ও আদৌ মেনে নিতে পারেনি।

—কেন পারেনি?

—ওভার পোজেসিভ।

—রাইট। অন্তত তোর ব্যাপারে ও খুব বেশি সেন্সেটিভ ছিল। সে ইচ্ছে করে, ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান ভেঁজে তোর কোনও ক্ষতি করে দেবে...

—আমার ক্ষতি তো করতে চায়নি। ও বাচ্চাটাকে মারতে চেয়েছিল।

—তাতে তোরও তো বিপদ হতে পারত। সেটা জেনে বুঝে ও সাবানজল ছড়িয়ে রেখেছে, তোকে ফেলে দেবে বলে...

এ ধন্দটা তো শরণ্যার মনেও আছে। সেদিন শরণ্যা যখন আছাড় খেয়ে পড়েছে, অনিন্দ্য তো দৌড়ে এসেছিল, পাঁজাকোলা করে মেঝে থেকে তুলেছিল শরণ্যাকে। নার্সিংহোমে যাওয়ার পথেও সারাক্ষণ শরণ্যার হাত চেপে ধরে আছে। তবু সেদিন অনিন্দ্যর সেই অস্বাভাবিক রকমের স্বাভাবিক আচরণ, হঠাৎ বাচ্চাটার সম্পর্কে জানার কৌতূহল, তারপরই তোয়ালেটা রেখে আসতে বলা— এগুলো কী প্রমাণ করে? সব চেয়ে বড় কথা, অপরাধ যদি সে নাই করে থাকে, তবে পরদিন নবেন্দু যখন শরণ্যাকে নার্সিংহোম থেকে মানিকতলায় নিয়ে চলে এল, অনিন্দ্য একবারও আপত্তি করল না কেন? পরদিনই বা মানিকতলায় ছুটে যায়নি কেন? কেন চোরের মতো খালি ফোন করত?

তবু একটা সংশয় যেন থেকেই যায়। কীটের মতো কুটকুট কামড়ায়। যদি দুয়ে দুয়ে চার না হয়? মানুষ তো।

ওই কীটটাই কী ভালবাসা?

শরণ্যা জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। বুঝি ওই কীটটাকেই সরাচ্ছে মস্তিষ্ক থেকে। তেতো গলায় বলল, —ও সব পারে। ওর কোনও হিউম্যান ইমোশানই নেই। সেন্সই নেই। ওর ছিল শুধু কিছু অ্যানিম্যাল ইন্সটিংক্ট। ব্যস।

—তার জন্য তুই অনিন্দ্যকে পুরোপুরি দায়ী করতে পারিস না। শুভ্রকে তর্কে পেয়ে গেছে। হাত নেড়ে নেড়ে বলল, —বাবা মা হ্যাড ফেল্‌ড টু পারফর্ম দেয়ার ডিউটিজ। তাঁরা ছেলেকে সোশালাইজ করতে পারেননি। মে বি তাঁদের সময় ছিল না, মে বি তাঁদের সে বোধটাই ছিল না...

—মানতে পারলাম না। অনিন্দ্যর ছোট ভাইটা তাহলে অন্যরকম হল কী করে?

—খুব অন্যরকম হয়েছে কী? ডিমান্ড মেটেনি বলে সেও তো বাড়ি ছেড়ে ভাগলবা। দুজনের ডিগ্রির তফাত থাকতে পারে, তবে দুজনেই একই জাতের চিড়িয়া। বড় জন মিশতে পারে না বলে তার একরকম চেহারা, ছোটজন বাইরের পরিবেশে মেশে বলে তার আর একরকম চেহারা।

—কিন্তু ওই রকম একটা ফ্যামিলিতে পড়ে আমি সাফার করব কেন?

—তোকে তো পড়ে থাকতে বলিনি। শুভ্র হো হো করে হেসে উঠল, —তুই তো জেনেবুঝেই পড়েছিলি।

—বা রে, আমি চেষ্টা করেছিলাম। হল না।

—বাজে কথা বলিস না। তুই অনিন্দ্য মুখার্জির প্রেমেও পড়েছিলি।

এর চেয়ে বড় সত্যি যে আর নেই এ তো শরণ্যাও জানে। কিন্তু এখন সে মনেপ্রাণে অনিন্দ্যকে ঘৃণা করে, এটাও তো সত্যি। তবে প্রেম আর ঘৃণা, দুটোই যে সমান অন্ধ, এই সত্যিটুকুই শুধু শরণ্যা জানে না।

মুখ বেঁকিয়ে শরণ্যা বলল, —ভালবাসা, না ছাই। জাস্ট দেখে সিম্‌প্যাথি হত...

—ভুলে যা, ভুলে যা। সিমপ্যাথিটুকুও ভুলে যা। নইলে আরও সাফার করবি।

শরণ্যা ছোট্ট করে শ্বাস ফেলল। আলতো মাথা নেড়ে বলল, —হুঁ। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

—আর বেলতলায় যাবি?

—মাথা খারাপ!

—বেলগাছ যদি প্রমিশ করে তোর মাথায় বেল ফেলবে না, তাও না? বলে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা টোকা মেরে ফেলে দিল শুভ্র। শরণ্যার মাথায় ছোট্ট চাঁটি মেরে বলল, —যা, বাড়ি যা। আমাকেও যেতে দে। গিয়েই তো এখন মা আর ডাক্তারের চার চক্ষুর মিলন ঘটাতে হবে।

বাসে বসে শুভ্রর কথাগুলোই ভাবছিল শরণ্যা। ছেলেটা ফাজলামি ইয়ার্কি করে বটে, তবে সুন্দর যুক্তি দিয়ে কথাও সাজাতে পারে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ে কেন যে শুভ্রর সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা ছিল? কাছাকাছি না এলে কোনও মানুষকেই ঠিক ঠিক চেনা যা

না। শুভ্র বলছিল, মানুষকে নাকি আদৌ চেনা যায় না। সত্যিই কি তাই? শরণ্যার তো মনে হয় শুভ্রর মধ্যে একটা সংবেদনশীল হৃদয় আছে। তার বিপন্নতাটাকে শুভ্র অনুভব করতে পারে। শরণ্যার ধারণাটা কি ভুল? আলগা আলগা সহৃদয়তা দেখায় শুভ্র? হঠাৎ বেলতলার প্রসঙ্গটা তুলল কেন? নিছক ঠাট্টা? না ভেবেচিন্তেই বলল? ভুৎ, ঠাট্টাই।

মৃদু টোকাটা তবু সামান্য উদাস করে দিল শরণ্যাকে। তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে। দেখছে আলোময় শহর, প্রায়ান্ধকার কবরখানা, ট্রামগুমটি, রেলস্টেশন। আবার কিছুই যেন দেখছে না। যেন ঘসাকাচের ওপারে আবছা হয়ে যাচ্ছে সব। শরণ্যার চোখে কি বাষ্প জমছে? কেন যে থেকে থেকে কান্না পায়?

বাড়ি ফিরে শরণ্যা দেখল ফ্ল্যাট সরগরম। কাকা কাকিমা এসেছেন। সঙ্গে ঝিমলিও। জোর গুলতানি চলছে ড্রয়িংরুমে।

ঝিমলিকে দেখেই নবেন্দু বলে উঠলেন, —এই তো, বুবলি এসে গেছে। ...বুবলি, তোর কাকিমা একটা জব্বর হিট করেছে রে।

শরণ্যা চটি ছাড়তে ছাড়তে বিস্মিত মুখে বলল, —কাকে?

—দ্যাট লেডি। নিবেদিতা মুখার্জি।

—কাকিমা তাকে পেল কোথায়?

অঞ্জলি চোখ নাচিয়ে বললেন, —সে এক কাণ্ড। ...তুই অর্চনা বলে কাউকে চিনিস? ওই সেই সুহাসিনীর?

—অর্চনা মৈত্র? মানে অর্চনামাসি?

মহাশ্বেতা বলে উঠলেন —আর যাকে তাকে মাসি বলতে হবে না।

শরণ্যা মার দিকে একটু ভ্রূকুটি করল। তারপর অঞ্জলির দিকে ফিরে বলল, —তুমি অর্চনামাসিকে চেনো নাকি?

—কাল আলাপ হল। বড়দির নাতির অন্নপ্রাশন ছিল, সেখানে এসেছিল মহিলা। বড়দির বউ-এর পিসি না মাসি কী যেন হয়।

—ওমা, তাই নাকি?

—বাবাহ্, কী তার সাজ! বাচ্চার অন্নপ্রাশনে এসেছে হিরের সেট পরে! বড়লোকের গিন্নি বলে সবাই খুব তেল মারছিল। তিনি আবার নাকি অনুষ্ঠান বাড়িতে খান না কিছু! অত সুন্দর ভাপা ইলিশমাছ হয়েছিল... সবাই এত করে বলল, মুখেই তুলল না!

—তুমি কিন্তু কর্ডলাইনে চলে গেছ। দিব্যেন্দু পাশ থেকে বললেন, —আসল গপ্পোটা শোনাও বুবলিকে।

—হ্যাঁ। ...বড়দি আলাপ করিয়ে দিল আমার সঙ্গে। তখনই শুনি উনি নাকি সুহাসিনী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একজন হোমরা চোমরা। সুহাসিনী নামটা শুনেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নিবেদিতা মুখার্জিকে নিশ্চয়ই চেনেন? ...ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে আমি যা বলার সব বলে দিয়েছি।

—কী বলেছ?

—নিবেদিতা কী, নিবেদিতার ছেলেটি কী, সব। তোর সঙ্গে কে কী ব্যবহার করেছে সমস্ত খুলে বলেছি।

—কিন্তু মামণি তো আমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেননি!

—থাক, আর মামণি মামণি করে আদিখ্যেতা করতে হবে না। মহাশ্বেতা বললেন, —ওই মহিলা মামণি ডাকের যোগ্য নয়।

— তুমিই কিন্তু ওঁর বেশি ভক্ত ছিলে মা।

—ভণ্ড চিনতে পারিনি।

শরণ্যা কথাটা যেন পুরো মানতে পারল না। অনিন্দ্যর মা হিসেবে নিবেদিতার ওপর তার আর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু নিবেদিতার অন্য পরিচয়টাকে সে অস্বীকার করে কীভাবে? সমাজসেবা বা সুহাসিনীর কাজে নিবেদিতা তো সত্যিই আন্তরিক। সেখানে অন্তত তার কোনও ফাঁকি নেই।

শরণ্যা অবশ্য প্রতিবাদে গেল না। তার শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে মা বাবার স্নায়ু এখন সর্বদাই টানটান। ও বাড়ির কারুর সামান্যতম প্রশংসাও এখন নিষিদ্ধ। এমনকী নীলাচলেরও। তাও তো ভাগ্যিস অনিন্দ্যর ওই হানা দেওয়ার খবরটা কেউ জানে না। যদি একবার কানে যেত, নবেন্দু বোধহয় গিয়ে অনিন্দ্যর ঘাড়টাই মটকে দিতেন।

নবেন্দু নড়ে বসেছেন। বললেন, —যাক গে, হ্যাং দ্যাট লেডি। ...আমাদের যা কথা হচ্ছিল...

অন্য কথায় দিব্যেন্দু ভুলেই গিয়েছিলেন প্রায়। বললেন, —কী নিয়ে কথা হচ্ছিল বলো তো?

—লইয়ার নিয়ে। নবেন্দু মনে করিয়ে দিলেন, —তুই তাহলে কাল পরশুই গিয়ে তোর কে চেনা উকিল আছে তার সঙ্গে কথা বল্। ফ্যাক্টটা স্টেট্ কর। তারপর বল্, উই ওয়ান্ট ইমিডিয়েট রিলিফ ফ্রম দোজ বাগারস।

অন্নপূর্ণা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, —হ্যাঁ হ্যাঁ, কাটান ছেঁড়ান হয়ে যাক। আমরা মনে করব আমাদের বুবলির বিয়েই হয়নি। ধরে নেব, মাঝের কটা মাস মিথ্যে ছিল। দুঃস্বপ্ন।

মহাশ্বেতা দিব্যেন্দুকে জিজ্ঞেস করলেন, —বুবলিকেও কি যেতে হবে তোমার সঙ্গে?

—দেখি। প্রথমদিন তো একলাই কথা বলে আসি।

—ছেলে আর মা দুটোকেই কিন্তু কোর্টে নাস্তানাবুদ করতে হবে।

দিব্যেন্দু হেলান দিয়েছেন চেয়ারে। চশমা খুলে কাচ মুছছেন। ঈষৎ চিন্তিত মুখে বললেন, —কিন্তু দাদা, বুবলির কথাটাও তো আমাদের ভাবতে হবে। কোর্ট, কাঠগড়া, কাদা ছোড়াছুড়ি...

—ওরা কী কাদা ছুড়বে? আমরা ওদের মুখে পাঁক লেপে দেব।

—স্টিল... জানই তো, কোর্ট মানে সত্যি বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জায়গা নয়। কে কার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনল, সাক্ষীসাবুদ দাঁড় করিয়ে কতটুকু এস্ট্যাবলিশ করতে পারল, ব্যস। ওরাও কি এমনি এমনি ছেড়ে দেবে? নিজেদের ডিফেন্ড করতে বুবলির নামেও কত আজেবাজে কথা বলবে তার ঠিক কী! হয়তো চরিত্র তুলেই কিছু একটা বলে দিল। বানিয়ে বানিয়ে বলতে তো আর ট্যাক্স লাগে না।

—হুঁহ্, বললেই হল? প্রমাণ করতে হবে।

—করবে না প্রমাণ। পারবে না। কিন্তু বুবলির গায়ে নোংরাটা তো লাগল।

—হুম। এটা একটা ভাববার মতো কথা বটে। নবেন্দু একটু থিতোলেন। চোখের কোণ দিয়ে তাকালেন শরণ্যার দিকে, —কী রে বুবলি, তুই কী বলিস?

শরণ্যা মাথা নিচু করে ওড়নার খুঁট পাকাচ্ছিল। তাকে ঘিরে বাড়িতে এত তুলকালাম চলছে ভাবলেও তার অস্বস্তি হয়। অস্ফুটে বলল, —সুতোটা তো ছিঁড়ে ফেলাই ভাল। তবে যতটা পিসফুলি হয়।

দিব্যেন্দু বললেন, —আমি কি লইয়ারকে মিউচুয়াল সেপারেশানের কথা বলব?

পলকের জন্য অনিন্দ্যর কথা মনে পড়ল শরণ্যার। ফুঁসছে! দেখে নেব!

বলল, —ওরা কি মিউচুয়ালে রাজি হবে?

—আমাদের লইয়ার ওদের কনট্যাক্ট করুক। বাজিয়ে দেখুক। চিঠি পাঠাক। ছ'মাসের মধ্যে ব্যাপারটা তা হলে মিটে যায়।

—দেখ তবে। মামলা করার রাস্তা তো খোলা রইলই।

শরণ্যা উঠে পড়েছিল। ঘামে প্যাচপ্যাচ করছে শরীর, এবার স্নান করতে হবে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, —এসব কিছু করার আগে আমার কয়েকটা জিনিস কিন্তু ও বাড়ি থেকে আনিয়ে নেওয়া দরকার বাবা।

—কী বল্ তো? তোর জামাকাপড়?

—হ্যাঁ। সে তো আছেই। তাছাড়া... আমার প্রোজেক্টের সব কাগজপত্র যে ওখানে পড়ে। এদিকে স্যার এক সপ্তাহের মধ্যে গোটা কাজের সিনপ্সিস করে দিতে বলছেন।

নবেন্দু বললেন, —আমি যাব? গিয়ে নিয়ে আসব?

মহাশ্বেতা বললেন, —না না, তোমার গিয়ে কাজ নেই। যা মাথা গরম মানুষ! ওরা হয়তো ওখানে কিছু বলল, উত্তরে তুমি একটা বললে, শেষে হয়তো লাঠালাঠি লেগে যাবে। আর ওই খুনেটার সামনে তুমি তো মোটেই যাবে না।

দিব্যেন্দু বললেন, —বুবলি, তুই একটা কাজ কর। কী কী আনতে হবে তার একটা লিস্ট বানিয়ে দে। আমি আর ঝিমলি নয় গিয়ে এই রোববার...

ঝিমলি সোফায় বসে রিমোট হাতে টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল দেখছিল। ভলিয়্যুমটা একদম কমিয়ে দিয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, —হ্যাঁ হ্যাঁ চলো। সরেজমিনে সিচুয়েশনটা দেখে আসি।

অঞ্জলি বললেন, —ওখানে গেলে একবার মিউচুয়ালের কথাটাও পেড়ে দেখতে পারো। নিবেদিতা দেবীরও তো কেচ্ছার ভয় আছে, রাজি হয়ে যেতেও পারেন।

আলোচনা চলছে। শরণ্যা নিজের ঘরে এল। আশ্চর্য, এই মুহূর্তে হঠাৎ একটা মানুষের মুখই মনে পড়ছে তার। যার কথা কেউ তোলে না। যাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না কেউ। না নবেন্দু-মহাশ্বেতা, না নিবেদিতা-অনিন্দ্য।

আর্য। মুখার্জিবাড়ির গৃহকর্তা!

মানুষটা একদিন ফোন করেছিলেন শরণ্যাকে। একদিনই। অফিসে। বেশি কথা বলার তো অভ্যেস নেই, শুধু বলেছিলেন, —ভাল থেকো।

কেমন আছেন শ্বশুরমশাই? ওই চক্রব্যূহে?

তেরো

—দেখ, আজ বাপটা এসেছে!

চাপা স্বর, তবু শুনতে পেলেন আর্য। তরল সিসের মতো যেন প্রবেশ করল কানে। এই বয়সে পৌঁছে ইন্দ্রিয়গুলো ক্রমশ ভোঁতা হওয়ার কথা। তাঁর ক্ষেত্রে কেন যে তীক্ষ্ণ হচ্ছে দিন দিন?

ঘাড় না ঘুরিয়েও স্বরের উৎসটিকে চিনতে পেরেছেন আর্য। শরণ্যার বাবা।

আর্য গুটিয়ে গেলেন ভেতরে ভেতরে। আজ এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার তাঁর একটুও ইচ্ছে ছিল না, তবু নিবেদিতার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন কই! অনুরোধ, না নির্দেশ? নাকি আদেশ? যাই হোক না কেন, আর্য তো মুখের ওপর না বলে দিতে পারতেন। ইদানীং অল্পস্বল্প না বলার জোরও তো এসেছে তাঁর। তাও পারলেন না। সেই অদৃশ্য সুতোটায় আবার টান পড়ল যে। কখনও কখনও বিবেকও এত অসহায় হয়ে পড়ে!

নিবেদিতাও কি একই দংশনে ভুগছেন এখন? বাইরে প্রকাশ নেই, তবে আর্য পরিষ্কার টের পান সোমশংকরের মেয়ে ভাঙছে। কী ভীষণ বিধ্বস্ত যে দেখায় আজকাল নিবেদিতাকে! শোক, তাপ, দুঃখ, হতাশা সবই বুঝি সইতে পারে মানুষ, কিন্তু অহং-এ যদি ফাটল ধরে তা সহ্য করা বড় কঠিন। অস্তিত্বের ভিতটাই যে নড়ে যায়।

চেয়ার টেনে বসেছেন নবেন্দুরা। টেবিলের ওদিকটায়। বাবা কাকার মধ্যিখানে শরণ্যা। এপাশে আর্য অনিন্দ্য নিবেদিতা। মাঝে একখানা চেয়ার ফাঁকা ছিল, সেখানে এসে বসলেন শ্যামল রায়। অনিন্দ্যর পক্ষের লইয়ার। বিভাজন রেখাটা স্পষ্ট হয়ে গেল। আর্যর চোখ চলে গেল শরণ্যার দিকে। নতমুখে বসেছে মেয়েটা। কাঁপছে যেন একটু একটু। আপন হতে এসেছিল, দুম করে কেমন পর হয়ে গেল!

দিব্যেন্দু কথা শুরু করলেন, —সরি বরুণদা, দেরি হয়ে গেল।

টেবিলের ওপারে ঘুরনচেয়ারে বরুণ সান্যাল। শরণ্যার পক্ষ। কব্জি উলটে ঘড়ি দেখে বললেন, —না না, তোমরা রাইট টাইমেই এসেছ। ওঁরাই বরং একটু আর্লি...

শ্যামল হাসলেন, —আমাদের তো একটু আগে আগে আসতেই হয় দাদা। প্রতিপক্ষ বলে কথা। কোথায় জ্যামে ফেঁসেটেসে যাই...

—প্রতিপক্ষ আবার কী? আমরা তো সবাই আজ এক দলে। কথার প্যাঁচে বরুণও দড়। বিত্তের প্রলেপ মাখা সৌম্য মুখে তাঁর পেশাদার হাসি, —স্টার্ট করা যাক তাহলে?

কারওর মুখে শব্দ নেই। পাথরের মতো বসে আছেন নিবেদিতা। পাশে অনিন্দ্যর মুখও থমথমে। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্যই বুঝি চোখ ঘুরছে দেওয়ালে দেওয়ালে। আইনের মোটা মোটা বই ঠাসা ওয়াল ক্যাবিনেটে। হোয়াটনটে জমে থাকা ব্রিফের স্তূপে। দরজার মাথায় সাজানো সিংহবাহিনীর ছবিতে।

আশ্চর্য ছেলে! সেদিনও নিবেদিতার সঙ্গে শির ফুলিয়ে ঝগড়া করছিল, —কেন ভয় পাব, অ্যাঁ? কে বলেছে আমি সাবানজল ফেলেছিলাম? প্রমাণ করো!

ভাঙে তবু মচকায় না। অবিকল মায়ের ধারা পেয়েছে ছেলেটা। সুনন্দটা বুঝি পালিয়ে বাঁচল। একটু হলেও সুনন্দর মধ্যে আর্য কী রয়েছেন কোথাও? কে জানে!

টেবিলে ফাইল তৈরি। বরুণ রিডিংগ্লাস পরে নিলেন। গলা খাকারি দিয়ে বললেন, —আমার ড্রাফটটাই পড়ি আগে? নাকি আপনি আগে রিড আউট করবেন?

—আপনারটাই চলুক। ব্রিফকেস থেকে শ্যামলও ফাইল বার করেছেন। চোখ বুলোতে বুলোতে বললেন, —কোনও পয়েন্টে ডিফারেন্স হলে তখন শর্ট আউট করা যাবে।

ক্ষণিক নৈঃশব্দ্য।

নিবেদিতা সোজা হয়েছেন। নব্যেন্দুর চোয়াল শক্ত। অনিন্দ্য আঙুল মটকাচ্ছে। দিব্যেন্দুর ভুরুতে ভাঁজ। শরণ্যা কোলের ব্যাগটিকে দু' হাতে জাপটে ঝুঁকল।

আর্য চোখ বুজলেন। ধর্মক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব .....। উকিলের চেম্বারকে কি পুণ্যভূমি বলা যায়? যুযুধান দু' পক্ষই প্রস্তুত, কিন্তু তিনি কী মানসিক ভাবে কোন শিবিরে? তিনি কি এই মুহূর্তে শিখণ্ডী? শিখণ্ডীও তো যুদ্ধ করেছিল! তাহলে আজ এই কুরুক্ষেত্রে তাঁর কি ভূমিকা?

বরুণ পাঠ আরম্ভ করেছেন,— কোর্ট অফ দি সো অ্যান্ড সো। ম্যাট্রিমোনিয়াল স্যুট নাম্বার সো অ্যান্ড সো। পিটিশনার নাম্বার ওয়ান, শ্রীঅনিন্দ্য মুখার্জি, সান অফ শ্রীআর্য মুখার্জি, বাই ফেথ হিন্দু, রিসাইডিং অ্যাট সতেরোর তিন ফার্ন রোড, কলকাতা...। কী মিস্টার মুখার্জি, অ্যাড্রেসটা ঠিক আছে তো?

নিবেদিতাই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, —হুঁ।

—পিটিশনার নাম্বার টু, শ্রীমতী শরণ্যা মুখার্জি, ওয়াইফ অফ শ্রীঅনিন্দ্য মুখার্জি অ্যান্ড ডটার অফ সো অ্যান্ড সো, বাই ফেথ হিন্দু, রিসাইডিং অ্যাট সো অ্যান্ড সো। দিস ইজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশান অফ ডিভোর্স আন্ডার মিউচুয়াল কনসেন্ট, সেকশান তেরোর বি, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, অ্যামেন্ডেড উনিশশো ছিয়াত্তর। বরুণ সামান্য দম নিয়ে গলা তুললেন, —এগুলো মিয়ার ফরম্যালিটি। লিখতে হয়। কার সঙ্গে কার আপসে বিচ্ছেদ হচ্ছে, সেটাই জাস্ট...

আপসে বিচ্ছেদ! কথাটা কানে লাগল আর্যর। অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো শোনায় না?

শ্যামল বললেন, —আপনি ডাইরেক্ট পয়েন্টে চলে আসুন দাদা।

বরুণ বললেন, —হ্যাঁ। খসড়াটা মোটামুটি যা করেছি বলি। পিটিশনার নাম্বার ওয়ান আর পিটিশনার নাম্বার টু-র বিয়ে হয়েছিল গত বছর নভেম্বরের বাইশে। কারেক্ট?

—কারেক্ট।

—তারপর থেকে পিটিশনার নাম্বার টু পিটিশনার নাম্বার ওয়ানের বাড়িতে বাস করতেন। একত্রে দাম্পত্য জীবনযাপনের সূত্রে মার্চের মাঝামাঝি পিটিশনার নাম্বার টু প্রেগন্যান্ট হন। তারপর থেকেই দুজনের মানসিক অমিল শুরু হয়।...

—অবজেকশান। ওভাবে একটা পার্টিকিউলার টাইম ধরে মানসিক অমিলের কথা বলছেন কেন? শ্যামলের আপত্তি শুরু হল, —জেনারেল একটা কমেন্ট করে দিন।

—কী রকম?

—বলতে পারেন বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীতে মনের মিল হচ্ছিল না।

—ক'মাস বিয়ে হয়েছে মশাই, অ্যাঁ? অমিল হতেও তো সময় লাগে। অবশ্য পার্টিকিউলার কোনও রিজন না থাকলে...

নিবেদিতা চোখ সরু করে শুনছিলেন। হঠাৎ গুমগুমে স্বরে বলে উঠেছেন, —রিজন দেওয়ার কোনও কথা ছিল না। বলা হয়েছিল, স্রেফ মেন্টাল অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাব দেখালেই...

—তাহলেও একটা ইন্সিডেন্টের পর থেকেই তো...? কী নবেন্দুবাবু, আপনি কী বলেন?

নবেন্দু নয়, দিব্যেন্দুর জবাব, —দিন ঘুরিয়ে। মিস্টার রায় যেভাবে বলছেন।

সঙ্গে সঙ্গে টুক করে নবেন্দুর একটা তির, —হ্যাঁ, মিস্টার রায়ের ক্লায়েন্টের মিহি চামড়ায় যখন লাগছে...!

নিবেদিতা কটমট তাকালেন। তবে চোখ ঘুরিয়েও নিলেন।

মাথা নিচু করে খস খস পেন চালাচ্ছেন বরুণ। শ্যামলের ঠোঁটে আত্মপ্রসাদের হাসি। আর্য মনে মনে একটু আশ্বস্ত হলেন। যাক, প্রথম শর নিক্ষেপটা সামলে গেছে তাহলে।

অনিন্দ্য ফস করে উঠল, —মিস্টার সান্যাল, আপনি আগের পয়েন্টটা রিপিট করুন তো।

—কোনটা ভাই?

—ওই যে, প্রফেশানের ব্যাপারটা।

বরুণ খুঁজে খুঁজে পড়লেন ফের, —এইটা? দ্যাট দি পিটিশনার নাম্বার ওয়ান ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, প্রেজেন্টলি আনএমপ্লয়েড, হোয়াইল দি পিটিশনার নাম্বার টু ইজ আ প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন আ ননগভর্নমেন্ট অরগানাইজেশান...?

—ইয়েস। আনএমপ্লয়েড লেখার কী দরকারটা ছিল?

নবেন্দুর চোখ বরুণে, কিন্তু লক্ষ অনিন্দ্য, —চাকরি নেই বলেই লেখা হয়েছে। ভুল তো কিছু না।

নিবেদিতার দৃষ্টিও বরুণে, —এটা কী কথা? আমার ছেলের আজ চাকরি নেই, কালই সে কোথাও জয়েন করতে পারে।

শ্যামল আবার মক্কেলদের হয়ে আপত্তি জুড়লেন, —আমার মনে হয় ওটা না লিখলেও চলে দাদা। তার চেয়ে শুধু বাই প্রফেশান ইঞ্জিনিয়ার বলাই তো যথেষ্ট।

শরণ্যা ফস করে বলে উঠল, —হুঁহ্, বাই প্রফেশান ইঞ্জিনিয়ার! কোনও দিন চাকরি পাবে ও?

অনিন্দ্যর মুখ আজ নিখুঁত কামানো। তার ফর্সা গাল সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে গেছে, —এগুলো কিন্তু ডিরোগেটারি কমেন্ট হচ্ছে!

শরণ্যা আবার বলল, —হুহ্।

আর্য ফের তাকিয়ে ফেললেন শরণ্যার দিকে। ওই মেয়েটি নিশ্চুপ থাকলেই কী ভাল হত না এখন? অবশ্য যুদ্ধে নেমে কে'ই বা নীতি মানে!

দিব্যেন্দু হাতের ইশারায় শান্ত করেছেন শরণ্যাকে। ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি। ভাবটা এমন পক্ষিটা তো মেরেই দিলি, এবার চেপে যা! হাসির সরটুকু ঠোঁটে রেখেই বললেন,—বলছে যখন, মেনে নিন বরুণদা। বেকার তো, ইগোয় লাগছে।

—ও কে। ও কে। বাই প্রফেশানই করে দিলাম। বরুণ ঝুঁকলেন ফাইলে,—ওই লাইনগুলোও বদলে দিলাম সামান্য। শুনুন, কী লিখেছি... বিয়ের পর থেকেই শ্রীমতী শরণ্যা আর শ্রীমান অনিন্দ্যর মনের মিল হয়নি। দুজনেই অশান্তিতে থাকতেন। আই মিন মেন্টাল ডিস্টার্বেন্স। গত জুন মাসের উনিশ তারিখে শ্রীমতী শরণ্যার একটি গর্ভপাত ঘটে, তারপরই দুজনের মানসিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ রূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এবং শ্রীমতী শরণ্যা উনিশে জুন নার্সিংহোম থেকেই তাঁর পিত্রালয়ে ফিরে আসেন। উনিশে জুনের পর থেকে দুজনে আর একত্রে বাস করেন নি। ঠিক আছে তো?

—না। ঠিক নেই। আবার কেন ইন্সিডেন্ট মেনশান করছেন?

—বা রে, কিছু তো একটা বলতে হবে। প্রেগনেন্সি বলা যাবে না, মিসক্যারেজ বলা যাবে না...। দিব্যেন্দু পিন ফোটালেন,—বিয়েটা বলা যাবে তো?

নিবেদিতা যেন শুনেও শুনলেন না। রাগত স্বরে বললেন,—মিস্টার রায়, আপনি না বলেছিলেন ওরা কোনও ঘটনারই উল্লেখ করবেন না? বারবার কেন এক কথা উঠছে?

—মিসক্যারেজটা থাকবেই।

—তাহলে রইল আপনাদের মিউচুয়াল, আমরা উঠছি। কেসই হোক। চলুক। দেখব ওই—মেয়ে কীভাবে ডিভোর্স পায়।

—তাতে কি সুবিধে হবে? কোর্টে কিন্তু মা-ছেলের কাপড় খুলে নেব।

—কী ফিল্‌দি ল্যাঙ্গুয়েজ! এই ফ্যামিলিতে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম? ছি।... মিস্টার সান্যাল, আইদার আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে রেসট্রিক্ট করুন, নয় আমরা চললাম।

—আহাহা, উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন কেন? বসুন। বসুন। বরুণ ফিরেছেন দিব্যেন্দুর দিকে,—দেবু, শান্তিতে ড্রাফ্‌টটা ফাইনালাইজ করতে দাও। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে, সেপারেশানের দরখাস্তে মিসক্যারেজ থাকলে কী আর এমন সান্ত্বনা হবে? লিভ ইট।... কী মিসেস মুখার্জি, তাহলে আপনারা সন্তুষ্ট তো?

নিবেদিতা গোঁজ।

—ডেট কিন্তু আমায় একটা দিতেই হবে। এটা এসেনশিয়াল।

—দিন। ওই উনিশ একুশ যা ইচ্ছে রাখুন।

আর্যর ভারী অবাক লাগছিল নিবেদিতাকে দেখে। এত অপমানের পরও উঠি চলি বলে বসে রইল! মুখে যাই বলুক, মনে মনে কী ভীষণ ভাবে আপোষে মীমাংসাটা চাইছে। পাঁচজনের চোখে ছোট হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে ভুগছে। নইলে নিবেদিতার মতো মহিলা প্রতিপক্ষ উকিলের চেম্বারে আসতে রাজি হয়? সোমশংকরের জুনিয়াররা অনেকেই এখন নামী আইনজ্ঞ, অথচ তাঁদের কারুর কাছে যায়নি নিবেদিতা। উকিলও লাগিয়েছে এক অতি সাধারণ। প্রায় অচেনা। যত চুপিসাড়ে ব্যাপারটা সেরে ফেলা যায়।

মনে মনে হাসলেন আর্য। বিষণ্ণ হাসি। লোকের চোখে তাকে কেমন দেখাবে তার বাইরে এখনও কিছু ভাবতে শিখল না নিবেদিতা। মায়াও হয়। দম্ভকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে কত কী যে হারাল জানতেও পারল না।

ড্রাফ্‌ট বদল হয়েছে। নিবেদিতার কথা মতোই। একবার পড়ে শুনিয়েও দিলেন বরুণ। এসেছেন প্রায় শেষ ধাপে। বললেন,—এবার লাস্ট পয়েন্টটাও বলে নিই? শ্রীমতী শরণ্যা শ্রীমান অনিন্দ্যর কাছে কোনও মেইনটেনেন্স বা অ্যালিমনি দাবি করছেন না। ...কী দেবু, তাই তো বলেছিলে?

—আমাদের তরফ থেকে ঠিক আছে। আমাদের মেয়ে রোজগার করে। দিব্যেন্দুর গলা মাখনের ছুরি, —তবে শ্যামলবাবুকে জিজ্ঞেস করে নিন, ওঁর ক্লায়েন্ট আমাদের মেয়ের কাছ থেকে ভরণপোষণ চায় কিনা।

অনিন্দ্য চমকে তাকিয়েছে। একবার দিব্যেন্দুকে দেখল, একবার শরণ্যাকে। চোখ ফের লাল,—আমরা কি ফালতু কথা শুনব? না কাজটা শেষ হবে?

—বেশ বেশ। ড্রাফ্‌ট তাহলে ফাইনাল তো? টাইপে দিয়ে দিই?

যাক, নিশ্চিন্ত। আর্য হেলান দিলেন চেয়ারে। তাল ঠোকাঠুকি হলেও মোটামুটি থেমেছে যুদ্ধটা। এবার যে যার ঘরে ফিরলেই হয়।

তখনই প্রবল বিস্ফোরণটা ঘটল।

নবেন্দু বুঝি বদলগুলো এখনও হজম করতে পারছিলেন না। হঠাৎই ফুঁসে উঠেছেন,—দাঁড়ান দাঁড়ান। ওদের আগে ইন রাইটিং দিতে বলুন ওরা এই ড্রাফ্‌টে এগ্রি করছে। সই করার আগে আবার যেন কোনও ফ্যাকড়া না ওঠে।

—আহা, উনি তো মেনেই নিয়েছেন।

—আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে চেনেন না মিস্টার রায়। ওরা সব পারে। ওদের কোনও চোখের চামড়া নেই।

নিবেদিতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন নবেন্দুকে। বরুণকে বললেন,—আমাদের কাজ তাহলে শেষ? আমরা যেতে পারি? আপনি শ্যামলবাবুর কাছে ফাইনাল ড্রাফট পাঠিয়ে দেবেন?

—পালাচ্ছেন? কালা সাজার ভান করছেন?

নিবেদিতা নিরুত্তর।

—এত সহজে আমি আপনাদের ছাড়ছি না। নবেন্দুর আঙুল কাঁপছে ঠকঠক, —কেন আপনি আমার ভাই আর ভাইঝিকে ইনসাল্ট করলেন সেদিন? কেন?

—আমি? নিবেদিতা আকাশ থেকে পড়লেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, —আপনি কী বলছেন নিজেও জানেন না! আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—আমার মাথা খারাপ? সেদিন আপনারা চামারের মতো আচরণ করেননি? বুবলির ক'টা ফাইল আর জামাকাপড় আনতে গিয়েছিল...জানেন জানেন, ওই নীচ মহিলা তার রসিদ লিখিয়ে নিয়েছে! আর ওই বাঁদর ছেলে ব্যাগ খুলে সার্চ করছিল কী কী নিল ওরা! আমরা কি চুরি করতে গেছি? চোর?

—ভালর জন্যই তো করেছি। পরে তো ওই নিয়েও ডিসপিউট হতে পারত।

—হুঁহ্, ডিসপিউট! আমার মেয়ের সর্বস্ব পড়ে আছে ওখানে...

—আছে তো পড়ে খাট বিছানা। নিয়ে যাবেন। তখনও লিস্ট বানিয়ে সই করিয়ে নেব।

—শুধু খাট বিছানা নেই, আছে আরও অনেক কিছু। আলমারি ওয়াড্রব ড্রেসিংটেবিল বুককেস...

—নিয়ে যাবেন সাতদিনের মধ্যে। নইলে টান মেরে রাস্তায় ফেলে দেব।

—সাত দিন নয় মা, তিন দিন। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ঘর সাফ না

হলে আমি কিন্তু ওগুলো লাথি মেরে মেরে ভাঙব।

—ভাঙা ছাড়া আর কিছু শিখেছিস? শিক্ষা পেয়েছিস বাড়ি থেকে? পয়সা খরচ করে জীবনে কিনেছিস কিছু?

—বাবা, চুপ করো। ছোটলোকটার সঙ্গে কথা বোলো না।

—আপনাদের ওই রদ্দি মালগুলোর চেয়ে আমাদের অনেক বেশি দামি জিনিস আপনাদের গব্বায় আছে। বিয়েতে যে ভারী ভারী গয়নাগুলো দিয়েছি সেগুলো কোথায় শুনি? কার লকারে ঢুকে আছে ওগুলো?

—ওই গয়নায় আমার মেয়ে পেচ্ছাপ করে। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসব।

—দেবেন। গুনে গেঁথে দেবেন।

—আমাদেরও গুনে গুনে প্রত্যেকটি জিনিস ফেরত চাই। যা যা দিয়েছি। চাদর বালিশ জামা কাপড় শাল সোয়েটার...। আপনার ছেলে হাতে যে ঘড়িটা পড়ে আছে, ওটাও তো আমাদের দেওয়া। ওই আংটিটাও তো আমাদের। গায়ে শার্টটাও এই জামাইষষ্ঠীতে দিয়েছি।

সম্পর্ক ভাঙার এ কী বীভৎস চেহারা! আর্য স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিলেন। বাইরের দুটো লোক মুখ টিপে হাসছে, তাও কি কারুর খেয়াল নেই?

আর্য জীবনে বোধহয় এই প্রথম চিৎকার করে উঠলেন,—থামো, থামো। থামো এবার।

চোদ্দো

অর্চনার সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ হতেই দময়ন্তী নিচু গলায় বলল, —আমি কি কিছু বলতে পারি নিবেদিতাদি?

ডায়াসে পাশাপাশি পাঁচখানা চেয়ার। নিবেদিতা বসেছেন মধ্যমণি হয়ে। সুহাসিনীর বার্ষিক সাধারণসভা প্রায় সমাপ্তির মুখে, একটু আগে চুকে গেছে নির্বাচনপর্ব। এখনও নিবেদিতার বুকে টাইফুন, তবে বাইরে তিনি অচঞ্চল। মাথা নেড়ে বললেন, —হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলো।

একদম ধারের চেয়ারটি ছেড়ে সপ্রতিভভাবে উঠল দময়ন্তী। টুকরো হাসি উপহার দিল স্টেজে, উপবিষ্ট দীপালি আর সুপ্রিয়াকে। স্টেজের টেবিলে হাইব্রিড রজনীগন্ধার ঝাড়, মাইক্রোফোন অভিমুখে যাওয়ার সময়ে মহার্ঘ ক্রেপসিল্ক শাড়ির আঁচলের ছোঁয়ায় ফুলদানিটা উল্টে যাচ্ছিল, ধরে স্বস্থানে বসিয়ে দিয়েছে। আঁচল কোমরে পেঁচিয়ে গলা ঝাড়ল একটু। তারপর রিনরিনে গলায় বক্তৃতা শুরু করেছে, —আমার আগে আমাদের সুহাসিনীর সম্পাদিকা অর্চনাদি যা বলে গেলেন, তারপর আমার আর কিছুই বলার নেই। তবু নতুন কর্মসমিতি নির্বাচিত হওয়ার পর আপনাদের দুটো একটা কথা বলার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। আমরা সবাই মিলে সুহাসিনীতে মিলেছি কীসের জন্যে? গরীব দুঃখী অনাথা অবহেলিতা অত্যাচারিতা মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে চাই আমরা। তাদের কষ্টের বোঝা কিছুটা লাঘব করতে চাই। পূর্বতন কর্মসমিতি যেভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ করে গেছেন, তার কোনও তুলনা নেই। নতুন কর্মসমিতিও সেই নিষ্ঠার ধারাটিকে বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে আপনারা ধরিয়ে দেবেন এবং আশা করব আপনারা সকলেই আমাদের পাশে থাকবেন। আমাদের পাশে মানে সুহাসিনীর পাশে। সুহাসিনীতে আমরা নতুন রক্ত আনতে চাই। সুহাসিনীর কাজে আমরা আরও গতি আনতে চাই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুহাসিনীকে আমরা আরও বড় করতে চাই। আপনাদের সকলের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এই কাজ সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় আশার কথা, আমাদের সভানেত্রী, আমাদের সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয়া নিবেদিতাদি আমাদের মাথার ওপর আছেন। নিবেদিতাদি সুহাসিনীর প্রাণ। নিবেদিতাদি ছাড়া সুহাসিনী অচল। ইদানীং কিছু কিছু পারিবারিক সমস্যায় তিনি যথেষ্ট বিব্রত আছেন বটে, তবু তিনি প্রবলভাবেই আমাদের মধ্যে আছেন। তাঁর মতো করে অত্যাচারিতা মেয়েদের কথা আর কে ভাবতে পারবে? তাঁর মতো একজন সমাজসচেতন মহীয়সী মহিলার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা...

গায়ে যেন জলপিছুটি লাগছিল নিবেদিতার। কুটকুট করছে সর্বাঙ্গ, জ্বলে যাচ্ছে গা। তাঁকে নির্মমভাবে হারিয়ে দিয়েও তৃপ্তি হয়নি, এখনও চিমটি কাটা কথা বলে যাচ্ছে ওই মেয়ে! তাঁর পারিবারিক সমস্যা নিয়ে সহানুভূতি দেখাচ্ছে, অথচ ঘুরে ঘুরে ওই মেয়েই সর্বত্র রাষ্ট্র করে বেড়িয়েছে তাঁর পরিবারের কেচ্ছা! দুঃখী মেয়েদের জন্য নিবেদিতাদির চোখ দিয়ে টসটস জল পড়ে, আর ওদিকে বাড়িতে নিজের ছেলের বউকেই তিনি...! শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ করেই তাঁকে জব্দ করে ফেলল! পুরো প্যানেলটাই হেরে গেল নিবেদিতার! সংবিধান পালটাতে পারলে তাঁকেও হয়তো সুহাসিনী থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিত ওই মেয়ে। আর থেকেই বা তিনি এখন কী করবেন? দময়ন্তীরা তো ইচ্ছে মতন কাজ করবে, কত তিনি বাধা দেবেন?

এখনও দময়ন্তী থামেনি। তার স্বর উঠছে, নামছে। আবেগঘন গলায় বলল, —আমাদের বৃদ্ধাশ্রমের কাজ আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবই। আশা করছি দু' বছর পর কর্মসমিতির পরবর্তী নির্বাচনের ঢের আগেই আমরা বৃদ্ধাশ্রমের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারব। এ প্রসঙ্গে একটা খবর উল্লেখ না করে পারছি না। আপনারা হয়তো অনেকে জানেনও, তবু বলি, বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতাদি সম্প্রতি এক লাখ এক টাকা দান করেছেন। আসুন, আমরা করতালি দিয়ে নিবেদিতাদিকে সকলে অভিনন্দন জানাই...

ওহ্, নিবেদিতা কেন যে বধির হয়ে যাচ্ছেন না! হাততালি নয়, যেন কানের পরদায় উচ্চিংড়ে লাফাচ্ছে! সোনাদার পিছনে লেগে থেকে থেকে, কত ঝামেলা হুজ্জোত করে বাড়িটা বেচা হল, তার থেকে পুরো এক লাখ দিয়েও এখন ঠুঁটো হয়ে বসে থাকতে হবে নিবেদিতাকে?

মিটিং ভাঙল প্রায় চারটেয়। সাধারণ সদস্যরা উঠে পড়েছে চেয়ার ছেড়ে, ছোট ছোট জটলায় গুলতানি চলছে। এই ধরণের সভা অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হয়ে যায়, তাই পরিবেশটাই বেশ আনন্দঘন। টুং টাং হাসি নেচে বেড়াচ্ছে সুহাসিনীর হলে।

মঞ্চ থেকে নামার আগে নিবেদিতা সোমশংকরের ছবিটার দিকে তাকালেন। টাটকা জুঁই-এর গোড়ে মালা ঝুলছে। ফুলের বেষ্টনীতে বাবার হাসিমুখ। ঠাট্টার মতো লাগছিল হাসিটাকে। বাবাও কী নিবেদিতার পরাজয়ে খুশি?

সুহাসিনীর একতলার ঘরগুলো আজ ফাঁকা। বার্ষিক সাধারণসভা উপলক্ষে মেয়েদের আজ ছুটি। দোতলায় গানবাজনার রিহার্সাল চলছে, আওয়াজ ভেসে আসছিল। মহালয়ার দিন একটা জলসা মতন হবে। শারদোৎসব। মেয়েরাই করবে। সময় আর বেশি নেই। ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে নিবেদিতার মনে হল একবার ওপরে ঘুরে আসেন। মেয়েরা তাঁকে দেখলে উৎসাহ পাবে। কতক্ষণ আর দঙ্গলের মাঝে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন?

তবু খানিকক্ষণ থাকলেন নিবেদিতা। কে কী ভাবে! এমনিতেই তো প্রতিটি চোখ আজ কেমন অন্যরকম ঠেকছে! হয়তো মনের ভুল, হয়তো এখনও তাঁর শ্রদ্ধার আসনটা টলেনি, তবু একটা কাঁটা যেন ফুটছেই। নীরবে বেরিয়ে এলেন একসময়ে। পায়ে পায়ে হাঁটছেন। অন্য মনে। কখন যেন রান্নাঘরের দিকটায়।

রেখা দেখেই বেরিয়ে এসেছে, —কী গো নিবিদি, সব সাঙ্গ হল?

নিবেদিতা মনে মনে বললেন, সাঙ্গই বটে।

মুখে বললেন, —এত তাড়াতাড়ি কী? এখন কত গপ্পো হবে, আড্ডা হবে...

—আমার মাছের চপটা আজ কেমন হয়েছিল?

—খুব ভাল। খুব প্রশংসা হয়েছে। পুরি আলুরদমও চমৎকার।

—বেশি করে টোমাটো দিয়ে সোয়াদ এনেছি।

—হ্যাঁ, গো, দীপ্তি কোথায়? দেখছি না?

—এই তো ছিল।... বোধহয় রিহাস্যালের ওখানে গেছে।

—ওকে বলে দিও আলপনাটা আজ খুব সুন্দর হয়েছিল।

—তুমি তো সবই সুন্দর দেখো নিবিদি। তোমার কাছে তো সবই ভাল। সবাই ভাল। বলেই রেখা কানের কাছে মুখ এনেছে। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, —নিবিদি, এসব কী শুনছি গো?

—কী?

—সবাই বলাবলি করছে তুমি নাকি হেরে গেছ?

নিবেদিতা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন। এই প্রথম কেউ তাঁকে সরাসরি কথাটা বলল! তাও সখীরা নয়, সঙ্গীরা নয়, বলল কিনা এই রেখা! কৃত্রিমতার পালিশ নেই বলেই বুঝি সত্যিটা এভাবে উচ্চারণ করতে পারল।

জোর করে হাসলেন নিবেদিতা। বললেন, —দূর হার জিৎ আবার

কী? সবাই মিলে কাজ করি, একদল আসবে, একদল যাবে, এটাই তো নিয়ম। ওরা নতুন, ওরা অনেক ছোটাছুটি করে কাজ করতে পারবে, কিসে তোমাদের আরও ভাল হয় ভাববে...। তাছাড়া আমি তো আছিই।

—ও। তুমি আছ? কৃষ্ণা আমায় যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল।

—ভয় পেলে চলবে কেন? আমারও তো বয়স হচ্ছে, একসময়ে না একসময়ে বিশ্রাম তো নিতেই হবে।

—হ্যাঁ, আমাদের তো এবার ধীরে ধীরে যাওয়ার পালা। সময় হয়ে এল। রেখার মুখে ছায়া পড়ল। নিবেদিতাকে দেখতে দেখতে বলল, —সত্যি, তোমার চেহারাটা হঠাৎ খুব ভেঙে গেছে গো।

—মানছ? বুড়ো তাহলে হয়েছি?

—না গো নিবিদি, বুড়ো নয়, অন্যরকম। রেখা ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, —তোমার বউটা তাহলে আর ফিরল না?

—বনিবনা যখন হচ্ছে না, পৃথক হয়ে যাওয়াই তো ভাল। নিবেদিতাকে নিস্পৃহ দেখাল।

—মেয়েটা খাসা ছিল গো...

রেখার যেন আরও কিছু বলার ছিল, কিন্তু চুপ করে গেছে সহসা। নিবেদিতাও আর কথা বাড়ালেন না, মাথা নাড়তে নাড়তে সরে গেলেন। শরণ্যার ওপর রাগটা আবার ফিরে আসছিল। ওই মেয়েটার জন্যই তো আজ হারতে হল নিবেদিতাকে। অথচ ওই মেয়েকেই তিনি কিনা সুহাসিনীতে তাঁর উত্তরসূরী ভেবে রেখেছিলেন! একটু ট্যাক্টফুল হতে পারল না মেয়েটা? সামলে রাখতে পারল না খ্যাপা ছেলেটাকে? উলটে কী অসভ্য ব্যবহার! গয়নাগুলো ওই মিচকে কাকাটাকে দিয়ে ফেরত পাঠাল, সঙ্গে চিরকুট —ওজন মেপে দেখে নেবেন! আশীর্বাদের

সবাই বলাবলি করছে তুমি নাকি হেরে গেছ?

গিনিটাও পাঠালাম, বুঝে নেবেন! হাতের লেখাটা শরণ্যারই। নিবেদিতা চেনেন। আশ্চর্য, তাকেও শত্রু ঠাওরাল শরণ্যা? ছেলের যাতে বিপদ না হয় সেইটুকুই তো তিনি শুধু দেখেছেন! ছেলেকে ঘাড় ধরে মা হাজতে ভরলে তোর কি খুব পুলক হত? তুই নিজে মা হলে পারতিস? কত আশা নিয়ে তোকে ঘরের বউ করে এনেছিলাম, কী প্রতিদানটা দিলি তুই?

অর্চনা আর দময়ন্তী গল্প করতে করতে এদিকেই আসছে। নিবেদিতাকে দেখে হাঁটার গতি বেড়ে গেল যেন। সেক্রেটারি আর ট্রেজারারে মাখো মাখো জুটি তৈরি হয়েছে তো!

সামনে এসে দময়ন্তী আহ্লাদী সুরে বলল, —আপনাকেই খুঁজছিলাম নিবেদিতাদি।

—হঠাৎ?

—আপনার একটা অ্যাপ্রুভাল দরকার ছিল।

—কীসের?

—স্বাগতাদি আর কাকলিদিকে অ্যাডভাইসারি বডিতে নিয়ে নিলাম। আপনার কি অমত আছে?

কী বিচ্ছু মেয়ে! স্বাগতা কাকলি তাঁর প্যানেলে ছিল, দময়ন্তী এখন তাদেরও গিলতে চায়! এবং সিদ্ধান্তটাও নিয়েই ফেলেছে। নিবেদিতার এখন পাঁচন না খেয়ে উপায় কী!

তবু নিবেদিতা চোখ টেরচা করলেন, —ওদের সঙ্গে কথা হয়েছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁরা তো খুব রাজি। একটু দোনামোনা করছেন... আপনি কি বলেন না বলেন...

নিবেদিতা শ্বাস গোপন রেখে বললেন, —ওমা, ওরা রাজি থাকলে আমার কীসের আপত্তি?

—পাস?

— নিশ্চয়ই। সবাই দলাদলি ভুলে কাজ করবে এটাই তো কাম্য।

—বটেই তো। আমরা সবাই এক। আমরা সবাই সুহাসিনীর জন্য, বলুন?

—হুঁ।

অর্চনা পাশ থেকে বললেন, —কয়েকটা দরকারি সই-টই করার ছিল নিবেদিতাদি। আজ করবেন?

—আজ থাক। কাল হবে। আজ একটু বাড়িতে কাজ...

কিছুই ইচ্ছে করছে না। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। জীবনে এই প্রথম নিবেদিতার এক পলও তিষ্ঠোতে মন চাইছিল না সুহাসিনীতে।

গেটের ভেতরে গাড়ির লাট লেগে গেছে। সুহাসিনীর বেশিরভাগ সদস্যাই গাড়ির অধিকারিনী, ভেতরে জায়গা না পেয়ে অনেকেই এদিক ওদিক গলিতে রেখেছেন নিজস্ব যান। নিবেদিতা অবশ্য সকাল সকালই এসেছিলেন, তাঁর অ্যাম্বাসাডার অপেক্ষা করছে অন্দরেই।

নিবেদিতা গিয়ে দেখলেন সুরেন গাড়িতে ঘুমোচ্ছে। প্রমীলাকুলের কর্মকাণ্ডে সে কোনওদিনই তেমন উৎসাহী নয়। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠল। আড়মোড়া ভাঙছে।

সিটে বসে নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন, —খেয়েছ?

—বাইরে থেকে ভাত খেয়ে এসেছি।

—কেন, পুরি আলুরদম খেলে না?

—দুপুরে পোষায় না। অম্বল হয়। সুরেন স্টার্ট দিল, —সোজা বাড়ি? নিবেদিতা, —না। অন্য কোথাও চলো।... গঙ্গার ধারে।

যৎপরোনাস্তি অবাক হয়েছে সুরেন। ঘুরে একবার দেখে নিল মালকিনকে। গেটের বাইরে এসেই বলল, —তেল নিতে হবে কিন্তু।

—কালই তো ভরলাম তেল!

—তারপর তো কত জায়গায় গেলেন। নিউআলিপুর টালিগঞ্জ যাদবপুর...

ক'দিন ধরেই চরকি খাচ্ছেন নিবেদিতা। সদস্যদের বাড়ি বাড়ি। টেলিফোনের চেয়ে সামনে গিয়ে বোঝাতে সুবিধে হয় বেশি। কী লাভ হল?

অপ্রসন্ন স্বরে নিবেদিতা বললেন, —একদম নেই?

—শুধু গঙ্গার পাড়ে গেলে কুলিয়ে যেতে পারে।

—তাহলে চলো।

সুরেনের চোখ গাড়ির আয়নায়, —মারুতিটা কেনার কী হল মাসিমা?

নিবেদিতা জবাব দিলেন না।

—কিনলে কিন্তু ওই মারুতিটাই... সেদিন যেটা গ্যারেজে দেখলেন।

এবারও সাড়াশব্দ নেই।

—বুঝছেন তো কোনটা বলছি? ছাই রঙ... ডাক্তার নিজে চালাত...।

—তুমি চুপচাপ চালাবে? নিবেদিতা হঠাৎই ঝেঁঝে উঠেছেন, —খালি বকবক! খালি বকবক!

ধমক খেয়ে থমকেছে সুরেন। মুখে কুলুপ আঁটল, অবতল আয়নায় পড়তে চাইছে মালকিনের মুখ। নিবেদিতা হেলান দিয়েছেন সিটে। চোখ বুজছেন, চোখ খুলছেন। দৃষ্টি কখনও ঊর্ধ্বপানে, কখনও বা নেমে আসে মাটিতে।

শরৎ এসে গেল। বিকেলের নীল আকাশে সাদা সাদা ছোপ। সরে সরে যাচ্ছে সাদারা। দ্রুত। পরশু বিশ্বকর্মা পুজো, আকাশে ঘুড়ির মেলা। শহর জুড়ে বাঁশের খাঁচা। এবার পুজো আগে, সামনের সপ্তাহে মহালয়া, শুরু হয়ে গেছে বড় বড় প্যাণ্ডেল বাঁধার কাজও। বাতাসে ভাসছে হালকা ছুটির আমেজ। দোকানপাটে থিকথিকে ভিড়, উপচোন মানুষে থমকে থমকে যাচ্ছে যানবাহন।

জাজেসঘাটের পাশটিতে এসে গাড়ি দাঁড় করালেন নিবেদিতা। ছোটবেলায় এক একদিন বায়না চাপত, দুপুরে গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন সোমশংকর, কোর্ট ছুটি হওয়ার আগেই নিবেদিতা চলে আসতেন বাবার কাছে। এই ঘাটটা খুব পছন্দ ছিল সোমশংকরের, মেয়েকে নিয়ে এখানেই হাওয়া খেতে আসতেন ছুটির পর। দেখাতেন জাহাজ-নৌকো-স্টিমার বয়া, জোয়ার ভাটার আশ্চর্য লীলা।

সেই স্মৃতি কী টেনে আনল নিবেদিতাকে? হয়তো।

ঘাটে সিমেন্টের বেঞ্চি, বসলেন নিবেদিতা। লাল সূর্য ডুবছে, ওপারে বাড়িঘরের সিল্যুয়েট। হাওয়া বইছে, কখনও স্নিগ্ধ, কখনও হু হু। বাতাসের ঝাপটায় চুল উড়ছে নিবেদিতার। শেষে দময়ন্তীর কাছে হেরে গেলেন তিনি? সেই সেদিনের মেয়েটা? সুহাসিনীই যদি চলে যায়, তবে নিবেদিতার আর রইলটা কী? এখন থেকে দময়ন্তীদের প্রতিটি কাজে অসুবিধের সৃষ্টি করলে কেমন হয়? প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর তো ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা আছেই, প্রতি পদে দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল হয়ে দাঁড়াতে পারেন। অতিষ্ঠ করে তুলবেন দময়ন্তীদের?

গঙ্গার গেরুয়া জলে ভাঁটির টান। খড়কুটো কচুরিপানা নিয়ে স্রোত চলেছে সাগরের পানে। মাঝে মাঝে আটকে যায় ঘূর্ণিপাকে, আবার এগোয়। মাঝগঙ্গায় জল কাটছে লঞ্চ, ঢেউ এসে ঠেকছে পাড়ে। দুলছে।

এই তো জীবন। এই ঘূর্ণিপাক। এই স্রোতে ভেসে চলা। এই ঢেউ-এর ওঠাপড়া।

সূর্য অস্ত গেল। ক্ষণিকের জন্য লাল আভা লেগেছিল জলে, এখন জল মলিন ক্রমশ। রাগটাও যেন থিতোচ্ছে একটু একটু করে। রাগ, না ঈর্ষা? তাঁর অধিকারে ভাগ বসাচ্ছে বলেই কী তিনি দময়ন্তীকে সহ্য করতে পারছেন না? সুহাসিনী কব্জায় থাকবে না বলে তিনি সুহাসিনীর ক্ষতির চিন্তাও করতে পারলেন? দময়ন্তীরাও তো সুহাসিনীর ভালই চায়, তাদের মতো করে। নিবেদিতার তাতে আঁতে লাগে কেন? বাবা গড়েছিলেন বলেই কি সুহাসিনী তাঁর একলার? কেন তিনি সুহাসিনীর মেয়েগুলোর কথাও ভুলে গেলেন?

কোনটা তাঁর কাছে বড় ছিল তবে? সমাজসেবা, না ক্ষমতা? সুহাসিনী, না সুহাসিনীর দখলদারি? অসহায় মেয়েদের কল্যাণচিন্তা কি তবে শুধুই আত্মবিনোদন ছিল? নেশা? কেউ ছোটে রেসের মাঠে, কেউ মদে মাতাল হয়... সেরকমই কি? তলিয়ে দেখলে দময়ন্তীর কী দোষ পাওয়া যাবে? খারাপ আচরণ করেছে কখনও? নিবেদিতাকে অসম্মান করেছে? তাঁর পরিবারের কোনও ঘটনা চাউর হয়ে গেলে দময়ন্তীর তা গোপন রাখার কী দায়? তিনি নিজে দময়ন্তীর জায়গায় থাকলে কী করতেন? শরণ্যার ওপর কুপিত হওয়া তো আরও অর্থহীন। তিনি সুহাসিনীর একচ্ছত্র অধিপতি থাকবেন বলে শরণ্যাকেও একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হবে? তাঁর গরিমা বজায় রাখতে আদৌ গড়ে না ওঠা সম্পর্কটাকে বয়ে বেড়াবে শরণ্যা —দাবিটা কি অযৌক্তিক নয়?

এই নদীর সামনেই বুঝি নিজেকে দেখা যায়। চেনা যায়। এই নদীর সামনেই বুঝি স্বীকার করা যায়।

অন্ধকারে শব্দ শোনা যায় ক্ষীণ। স্রোতের শব্দ? কোথায় বাজছে? কানে, না হৃদয়ে? কীসের জন্য নিবেদিতা ছুটেছেন এতদিন? রেখা বলছিল, সময় হয়ে এল...। কী পড়ে থাকল পিছনে? সুহাসিনীতে একখানা ছবি, কিংবা পাথরের গায়ে একখানা নাম, ব্যস? একসময়ে মনে হত তিনি গড্ডলিকার মানুষ নন, বিশাল একটা কিছু নিয়ে আছেন তিনি। কী অসার ভাবনা! মানুষ যদি ভাবে সে মহৎ কিছু করছে, তাহলে কিছুই কি তার করা হয় আদৌ? এ তো শুধু আত্মতৃপ্তির খেলায় মাতা। মহত্ত্বের মালা গলায় পরে বুঁদ হয়ে থাকা।

বিনিময়ে জুটল কী?

নিবেদিতার বুকটা টনটন করে উঠল। সুনন্দ আর ফিরবে না। বন্ধুর বাড়ি ছেড়ে কোথায় যেন পেয়িংগেস্ট আছে এখন। একটা নাকি ছোটোমোটো চাকরিও জুটিয়েছে। নীলাচল যায় তার কাছে। একবারও নাকি নিবেদিতার কথা জিজ্ঞেসও করে না সুনন্দ। আর অনিন্দ্য ফাঁকা ঘরে বসে একা একা মদ খায়। একটি কথা বলে না মার সঙ্গে। নিবেদিতা ঘরে পা রাখলে খুনে চোখে তাকায়।

রেখা বলছিল, সময় হয়ে এল...!

যাওয়ার সময়ে কী নিয়ে যাবেন নিবেদিতা? কোন সুখটা? কোন তৃপ্তিটা? কোন দম্ভটা? কোন মহত্ত্বটা?

আর একটু ভাগ করে দেওয়া যেত না কি নিজেকে?

ঠুলি পরা চোখে একবগ্গা ছুটে নিবেদিতা এ কোথায় এসে পৌঁছোলেন? ফার্ন রোড় আর সুহাসিনীর মাঝে মেঘলা বুকে পেণ্ডুলামের মতো দুলে চলাই কি তবে তাঁর নিয়তি এখন?

চোখ খুলে তাকালেও কেউ কি আর পাশে এসে দাঁড়াবে?

নদীর জলে চিকচিক করছে আলো। ভাঙা চাঁদ কাঁপছে। প্রচণ্ড জোরে তুলে হর্ন বাজাল একটা ক্ষুদে জাহাজ।

রেখা বলছিল, সময় হয়ে এল...!

ফেরার পথে গোটা রাস্তাটাই চোখ বুজে রইলেন নিবেদিতা। বাড়ি ঢোকার মুখে নীচের ভাড়াটের সঙ্গে দেখা, কী যেন একটা সমস্যার কথা বললেন ভদ্রলোক, নিবেদিতা শুনতেও পেলেন না। রেলিঙ ধরে ধরে ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি ভাঙছেন।

ল্যান্ডিং-এ এসে থামলেন। ম্যাজেনাইন ফ্লোরের ঘরে সেই চিরপুরাতন ছবি।

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

চেয়ারে আর্য। টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। চতুর্দিকে বই-কাগজ কলম। টেবিলের কোনে সোনালি পানীয়। আর্য লিখে চলেছেন।

চৌকাঠ টপকে একবার কি ওই গুহায় ঢুকতে পারেন না নিবেদিতা?

আর্যর কলম থেমেছে আচমকাই। নিবেদিতার পায়ের শব্দ কি শুনলেন আর্য? ঘাড় ঘোরাচ্ছেন না কেন একবারও?

নিবেদিতা সরে এলেন। উঠছেন আবার। আরও শ্রান্ত পায়ে। সময়ের চাকা কি উলটো দিকে ঘোরানো যায়!

পনেরো

শরৎ ফুরিয়ে হেমন্ত এল। হেমন্ত ফুরিয়ে শীত। তারপর বসন্ত এল, চলেও গেল, দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও কয়েকটা ঋতু। পার হল আরও একটা ফাল্গুন, আরও একটা বৈশাখ।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ উল্টোচ্ছিল শরণ্যা। তৃতীয় পাতায় হঠাৎ ছবিটায় চোখ পড়ে গেল। সুহাসিনী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বৃদ্ধাশ্রম উদ্বোধন করছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী, পাশে সুহাসিনীর প্রেসিডেন্ট নিবেদিতা।

শরণ্যা ঝুঁকল ছবিটার ওপর। পিছনে আবছা ভাবে অর্চনামাসিকে দেখা যায় না? আর কে আছে? দময়ন্তীদি? বোঝা যাচ্ছে না পরিষ্কার। তবে মামণির ছবিটা খুব ঝকঝকে। মন্ত্রী ফিতে কাটছেন, পাশে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে মামণি। দারুণ একটা কাঞ্জিভরম পরেছেন তো! শাড়িটা কি নতুন? শরণ্যা দেখেছে আগে?

আপন মনে ভ্রূকুটি করল শরণ্যা। বিড়বিড় করে বলল,—এই, মামণি কী রে? আদিখ্যেতা হচ্ছে? বল্ নিবেদিতা মুখার্জি। উঁহু, এক্স শাশুড়ি। সত্যি, সম্পর্কেও এত এক্স ওয়াই জেড থাকে!

মহাশ্বেতা ঢুকেছেন ঘরে। অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি, ঘড়ির ব্যান্ড বাঁধছেন। ব্যস্ত মুখে বললেন,—এখনও বিছানায় গড়াচ্ছিস যে? বলেছিলি না, আজ ইউনিভার্সিটি যাবি?

—যাব। দেরি করে বেরোব।

—ঠাম্মার ফিজিওথেরাপির লোকটা আসবে সাড়ে দশটায়, ফ্রিজের ওপর টাকা রেখে গেলাম, মনে করে ভদ্রলোককে দিয়ে দিস।

—আয়াটা এসেছে?

—হ্যাঁ। খাওয়াচ্ছে ঠাম্মাকে।

—বাবা বেরিয়ে গেছে?

—অনেকক্ষণ। ফেরার পথে তো আবার ডাক্তারের কাছে যাবে।

এপ্রিল মাসে সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল অন্নপূর্ণার। মাঝারি। ডান দিকটা প্রায় পড়ে গিয়েছিল, দু মাসে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। অল্প অল্প হাঁটছেন অন্নপূর্ণা। অবশ্যই ধরে ধরে।

শরণ্যা দু হাত ছড়িয়ে বড়সড় একটা আড়মোড়া ভাঙল,—কাগজটা আজ দেখেছ?

—কী আছে?

—দেখো না। শরণ্যা পাতাটা বাড়িয়ে দিল,—ছবিটা দেখো।

দেখলেন মহাশ্বেতা। টুকরো খবরটাতেও পাখির চোখ বোলালেন। তারপর বিছানায় ফেলে দিয়েছেন কাগজটা,—হুঁহ্, যত সব ঢঙ। ছেলেরা কবে গলাধাক্কা দেয়, তাই নিজের একটা আস্তানা গড়ে রাখল!

—যাই বলো, ভদ্রমহিলার কিন্তু জিল আছে। অ্যাল্‌টিমেটলি করে দেখালেন তো।

মহাশ্বেতা মুখ বেঁকিয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন,—শুভ্রর মা ফোন করেছিলেন একটু আগে। তোর একটা ব্লাউজের মাপ চাইছিলেন। বিকেলে গেলে দিয়ে আসিস।

—আমার আজ ওদিকে যাওয়া হচ্ছে না। শুভ্র হয়তো এলেও আসতে পারে।

—শুভ্রর হাতেই দিয়ে দিস তাহলে। সঙ্গে তোর চুড়ির মাপও।

—উনি যে কেন আবার গয়না গড়াতে যাচ্ছেন! তুমি বারণ করতে পারলে না?

আহা, শাশুড়ির বুঝি ইচ্ছে হয় না?

শরণ্যা হেসে ফেলল,—তারপর যদি কেড়ে নিতে ইচ্ছে হয়, তখন?

ঠাট্টাটা মোটেই সহজ ভাবে নিতে পারলেন না মহাশ্বেতা। ভার গলায় বললেন,—অলুক্ষুণে কথা বোলো না বুবলি। একটা শুভ কাজ হতে চলেছে....

—শুভ কাজ অশুভ হতে কদ্দিন লাগে মা?

—আবার ফাজলামি? মনে রেখো, শুভ্রর মতো একটা ছেলে পেয়ে তুমি বর্তে যাচ্ছ।

—শুভ্র কিন্তু উল্টো কথা বলে মা। শরণ্যা তবু হিহি হাসছে,—আমার মতো একটা মেয়ে পেয়ে ওই উৎরে গেছে।

—বোকো না। ওর মতো ছেলে হয়?

—শুভ্রর ইউনিভার্সিটির ট্র্যাক রেকর্ড তো জানো না। ভেরি পুওর। মেয়েরা ওকে দেখলে জুতো হাতে ঘুরত।

এই ঠাট্টাতেও মহাশ্বেতা হাসতে পারলেন না,—দেখো, এভাবে ওর মার সামনে কখনও বোলো না। শাশুড়ির মনে ব্যথা দিতে নেই।

—বুঝলাম। এবার তুমি কাটো। অফিসে ঢ্যাঁড়া পড়ে যাবে।

— যাচ্ছি। মেয়ের ড্রেসিং টেবিলে নিজেকে একবার দেখে নিলেন মহাশ্বেতা। দেখছেন ড্রেসিংটেবিলটাকেও। ভুরু কুঁচকে বললেন,—এই বুবলি, এই চলটাটা কবে উঠল?

—ওঠাই তো ছিল। ওই বাড়ির থেকে নিয়ে আসার সময়েই তো....

—পালিশের সময়ে মনে করিয়ে দিস। বলেই মহাশ্বেতা গজগজ করছেন,—এই সব পুরনো ফার্নিচারগুলো আমার মোটেই নেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কেন যে শুভ্র জেদ ধরে আছে!

—নতুন নিতে বোধহয় নার্ভাস ফিল্ করছে।

—কেন?

—আবার যদি ফেরত টেরত দিতে হয়।

এবার আর ধমক নয়, মহাশ্বেতার চোখে আগুন। দাঁড়ালেন না আর, মেয়েকে দৃষ্টিতে ভস্ম করে বেরিয়ে যাচ্ছেন ঘর ছেড়ে। দরজায় গিয়ে গুমগুম স্বরে বললেন,—রঙ্গরসিকতা ত্যাগ করে এবার গাত্রোত্থান করো। শুয়ে শুয়ে আর দেয়ালা করতে হবে না।

শরণ্যা এবার আর হাসল না। মায়া হচ্ছিল মার জন্য। বেচারা, এখন সিঁদুরে মেঘের নাম শুনলেও ভয়।

অন্যমনস্ক মুখে শরণ্যা আবার কাগজটাকে টানল। ছোট্ট একটা ইন্টারভিউ আছে মামণির। থুড়ি, নিবেদিতা দেবীর। মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি কী করেছেন, আরও কী কী করতে চান.....। পড়তে পড়তে একটা বিকেল মনে পড়ে যাচ্ছিল শরণ্যার। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে খুড়তুতো দাদার সঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে ঝগড়া করছেন নিবেদিতা....। একই মানুষের কত রকম যে রঙ। দুটোই তো সত্যি। এই নিবেদিতাও। ওই নিবেদিতাও।

ভাবতে গিয়ে সামনে আর একটা ছবি। নির্জন দুপুরে একা ঘরে বসে এক নিঃসঙ্গ মানুষ। আপন খেয়ালে লিখছেন কী যেন, কাটছেন, লিখছেন.... গভীর তন্ময়তায় ডুবে আছেন নিজের ভেতরে।

আশ্চর্য, দুই ভিন্ন মেরুর জীব হয়েও দুটো মানুষ কী করে একই ছাদের নীচে কাটিয়ে দিতে পারে জীবনটা? নাকি অদৃশ্য বলরেখা আছে মাঝে, শরণ্যার চোখে পড়েনি?

ধুৎ, যত সব ফালতু ভাবনা। নিবেদিতা আর্যর আকর্ষণ বিকর্ষণ নিয়ে শরণ্যার আর কীসের মাথাব্যথা? পাস্ট ইজ পাস্ট।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মুখ টুখ ধুয়ে নিল শরণ্যা। রান্নাঘরে গিয়ে এক কাপ চা বানাল। কাপ হাতে অন্নপূর্ণার ঘরে। একগাল হেসে বলল,—কী গো, আজ কেমন?

অন্নপূর্ণা বিছানায় বসে। আয়া চুল বেঁধে দিচ্ছে। এক ধাক্কায় বেশ খানিকটা রোগা হয়ে গেছেন অন্নপূর্ণা, হাত মুখের চামড়া আরও কুঁচকে কুঁচকে গেছে।

নাতনির ডাকে ফিরে তাকিয়েছেন অন্নপূর্ণা। হাসতে গিয়ে গাল একদিকে বেঁকে গেল। ঈষৎ জড়ানো স্বরে বললেন,—ভাল আছি তো।

—কী বুঝছ? বিয়ের আগে ফিট হয়ে যাবে?

অন্নপূর্ণা কষ্ট করে ডান হাতটা তুললেন,—এই হাতেই ছোঁড়ার কান মুলতে পারব।

—মনে রেখো কথাটা। দিন কিন্তু আর বেশি নেই।

—জানি।

অন্নপূর্ণার জন্য এ ঘরে একটা ছোট কালার টিভি কিনে দিয়েছেন নবেন্দু। সারাদিনই চলে প্রায়, এখন বন্ধ। শরণ্যা চাপা গলায় আয়াকে জিজ্ঞেস করল,— টিভি অফ কেন?

—ইনিই বললেন। এখন একটা দুঃখের সিরিয়াল হয়, ওঁর ভাল লাগে না।

—ও।

ঠাম্মার গাল আলতো ছুঁয়ে বেরিয়ে এল শরণ্যা। পায়ে পায়ে নিজের ঘর। আলগা হাতে কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে ব্যাগে। কী ভেবে ব্যাগটা বদলে বড় ব্যাগ নিল একটা। পি-এস-বি আজ কয়েকটা রেফারেন্স দেবেন, আজই ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে বইগুলোর সন্ধান করতে হবে। চেতনার কাজ শেষ হয়ে গেছে গত সেপ্টেম্বরে, তার পর মাস তিনেক নিষ্কর্মা বসেছিল শরণ্যা, এ বছরের গোড়ায় জয়েন করেছে রিসার্চে। গবেষণায় আর তেমন স্পৃহা ছিল না তার, ভেবেছিল উঠে পড়ে চাকরির খোঁজে লাগবে, শুভ্রর জোরাজুরিতে শুরু করতে হল কাজটা। নিজে অবশ্য শুভ্র ঢুকেছে এক সংবাদপত্রের অফিসে। কাগজটা ইংরিজি, দিল্লি মুম্বাইতে নাম থাকলেও কলকাতায় নতুন, তারা এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে নিচ্ছিল, শুভ্র লড়াই করে জোগাড় করে ফেলল কাজটা। মাথায় পোকা আছে ছেলেটার। নিজে রিসার্চে যাবে না, কিন্তু শরণ্যাকে সেই ঠেলে ঠেলে.....

নাটকও করতে পারে কিছু। বিয়ের কথাটাও পাড়ল কেমন থিয়েটারি ঢঙে। প্যাংক্রিয়াসে অপারেশানের পর থেকেই শুভ্রর মা টুকটাক শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। গত জানুয়ারিতে মাকে নিয়ে পুরীতে হাওয়া বদল করতে গিয়েছিল শুভ্র, ফিরে শরণ্যার সঙ্গে দেখা হতেই প্রথম কথা,—খুব একটা সমস্যায় পড়ে গেলাম রে।

—কী হয়েছে?

—মা ভীষণ জেদ করছে, মার পছন্দ করা মেয়েকে এক্ষুণি বিয়ে করতে হবে। কী করি বল্ তো?

শুভ্রর সঙ্গে একটু একটু করে কবে যেন একটা মানসিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে শরণ্যার। সে যেন বড় বেশি নির্ভর করতে শুরু করেছিল শুভ্রর ওপর। কোনও পরিণতির কথা স্পষ্ট করে ভাবেনি তখনও, তবুও।

শুভ্রর কথায় জোর ধাক্কা খেয়েছিল শরণ্যা। তাও প্রাণপণে নিস্পৃহ থাকার চেষ্টা করে বলেছিল,—আমি কী বলব? তোর যা ইচ্ছে তাই করবি।

—প্রবলেম। শুভ্র মাথা চুলকোচ্ছে,—মুখ ফুটে মাকে না বলি কী করে? খুব আশা করে আছে....

—না করবিই বা কেন? রাজি হয়ে যা।

—বলছিস? তোর অমত নেই তো?

—আমার মত অমতের প্রশ্ন আসছে কোথ্থেকে?

—বা রে, তুই না মত দিলে বিয়েটা করব কী করে?

—ন্যাকামি করিস না। আমি হ্যাঁ বললে তবে তুই গিয়ে টোপর পরবি?

—অবশ্যই। বিয়েতে তো মিয়া বিবি দুজনকেই সম্মতি দিতে হয়।

—কীই-ই?

—আর কেন বোর করছ বস? হ্যাঁটা বলেই দাও না। মোগাম্বো ভি খুশ, হাম ভি খুশ।

—শুভ্র..... তুই.....!

—দ্যাখ্ খুকি, আমার কপালেও আর মেয়ে জোটার চান্স নেই, তোরও বরটা কেটে গেছে, থিয়োরিটিকালি এটাই আইডিয়াল ম্যাচ। আয়, আমরা ঘর বানাই।

সেই ঘর বাঁধার দিন এসে গেল। এবার অবশ্য ঘটাপটার প্রশ্ন নেই, সাদাসিধে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ, শুধু শুভ্রর মার ইচ্ছে অনুযায়ী শুভ্রদের বাড়িতে একটা বউভাত মতন হবে, এই যা। এতেই মহাশ্বেতা নবেন্দু দারুণ খুশি এবং উত্তেজিতও। তবে তাদের মুখে সেই উচ্ছ্বাসটা ফুটছে না যেন, অনিন্দ্যর সঙ্গে বিয়ের আগে যেমনটি দেখেছিল শরণ্যা। কোথাও বুঝি একটা চোরা অস্বস্তি কাজ করেই যায়। এবার সব ঠিকঠাক চলবে তো?

শরণ্যা ড্রেসিংটেবিলের সামনে এসে বসল। জট পড়েছে চুলে। চিরুনি চালিয়ে টেনে টেনে ছাড়াচ্ছে। কদিন ধরে চুল উঠছে খুব, রাতে শোওয়ার আগে মাথায় তেল লাগাতে হবে।

শরণ্যার মনে অবশ্য কোনও আশংকাই নেই। সে এখন নির্ভার প্রজাপতির মতো থাকে সারাটা দিন। মাঝের একটা বছরকে তার কেমন অলীক মনে হয়। সেই শুনশান দোতলা.... গ্রীষ্মের দুপুরে ছায়ারা লুকোচুরি খেলছে....ফিসফিস করছে বাতাস....! একসময়ে মনে হত বাড়িটা যেন গিলে খেতে আসছে, এখন বাড়িটাকে শুধুই একটা ছবি মনে হয়। ঝাপসা ঝাপসা। দূরে সরে গেলে দুঃস্বপ্নও কি মায়াবী হয়ে ওঠে?

অনিন্দ্যর সঙ্গেও একদিন দেখা হয়েছিল শরণ্যার। ডিভোর্সের ডিক্রি পাওয়ার মাস তিনেক পরে।

তখনও শরণ্যা চেতনাতেই আছে। প্রোজেক্টের জন্য কয়েকটা রিপোর্ট কিনতে গিয়েছিল হাইকোর্ট পাড়ায়। ভারত সরকারের বুক ডিপো থেকে।

দোকানটা থেকে বেরিয়ে মিনিবাস স্ট্যান্ডের দিকে হাঁটছিল। হঠাৎই বুকটা ছলাৎ। অনিন্দ্য! উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে। একেবারে মুখোমুখি হয়ে দুজনেই বুঝি পলকের জন্য থামল। ক্ষণিক ভাষা ফুটল দুজনের চোখে, হারিয়েও গেল। আবার যে যার পথে।

কিন্তু একটু গিয়েই কী যে হল শরণ্যার! কে যেন ঘুরিয়ে দিল ঘাড়খানাকে। স্তম্ভিত শরণ্যা দেখল অনিন্দ্যও ঘুরে তাকিয়েছে। দাঁড়িয়ে আছে স্থির।

কেন যে সেদিন ঘুরেছিল শরণ্যা?

শুভ্রকে আজও বলতে পারেনি সেদিনের কথাটা। কেন পারেনি?

শরণ্যার প্রহেলিকার মতো লাগে।

সেই কীট কি তবে রয়েই গেছে? অত বিষের পরেও? বুকের কোন কুঠুরিতে বাসা বেঁধে আছে সে? শুভ্র কি তার অস্তিত্ব টের পাবে কোনও দিন?

শরণ্যা কাঁপা কাঁপা শ্বাস ফেলল। নিজেকেও চেনা যে কী কঠিন!

অঙ্কন : সমীর সরকার

This Book Downloaded From
http://Doridro.com